বেসিক ইলেকট্রনিক্স সহ

ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টেলিভিশন সার্ভিসিং

গৌতম মজুমদার ঃ অমিত বিশ্বাস

বেসিক ইলেকট্রনিক্স সহ

ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট টেলিভিশন সার্ভিসিং

গৌতম মজুমদার, বি. এস. সি., ইলেকট্রনিক্স ডিপ্লোমা
অধ্যক্ষ, অরো কমার্শিয়াল সেণ্টার (প্র্যাকটিকাল টিভি ট্রেনিং স্কুল)
প্রাক্তন ইনস্ট্রাকটর, মহাবোধি এমপ্লয়মেণ্ট ট্রেনিং সেণ্টার, প্রাক্তন অবৈতনিক প্রিন্সিপাল, মহাবোধি ওয়েলফেয়ার ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট,
অমিত বিশ্বাস, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার
অবৈতনিক ইনস্ট্রাকটর, অরো কমার্শিয়াল সেণ্টার

মনোরমা প্রকাশনী
১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

BASIC ELECTRONICS SAHO BLACK & WHITE TELEVISION SERVICING
By MAJUMDER & BISWAS

☐ প্রথম প্রকাশ রথযাত্রা, ১৩৯৬

☐ প্রকাশক ঃ
অর্পিতা রাহা
মনোরমা প্রকাশনী
১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

☐ মুদ্রনে ঃ
সত্যনারায়ণ মণ্ডল
রামকৃষ্ণ সারদা প্রিণ্টার্স
৩৪, শ্যামপুকুর স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

☐ কালার অফসেট প্রিণ্টিং
প্রেসাজেণ্টস্ প্রাইভেট লিমিটেড
২ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

☐ ব্লক নির্মাণে ঃ শিবালী প্রসেস

☐ প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অঙ্কনে ঃ দেবাশীষ সামন্ত

☐ কালার স্থিরচিত্র ঃ প্রবীর বিশ্বাস

প্রাপ্তিস্থান
শৈব্যা গ্রন্থন বিভাগ, ৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-৭৩
বিশ্বাস বুক স্টল, ৮৮ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৯
শকুন্তলা রেডিও সেণ্টার, ৬ চাঁদনী চক স্ট্রীট, কলিকাতা—৭২
নবরঙ, ১৯৯ চাঁদনী চক স্ট্রীট
লালওয়ানী, ৬/৩, ম্যাডান স্ট্রীট কলিকাতা—১৩
অরো কমার্শিয়াল সেণ্টার, ১১৮/২, বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট
চৌধুরী ইলেকট্রনিক্স, রঘুনাথপুর, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর

মূল্য—বোর্ড বাঁধাই ৪০ টাকা
সাধারণ বাঁধাই ৩৮ টাকা

উৎসর্গ

যাঁদের প্রেরণা ও আশীর্বাদ ছাড়া এই বই লেখা আমাদের পক্ষে
সম্ভব হতো না, আমাদের শ্রদ্ধেয় পিতৃদেব
শ্রীভবরঞ্জন মজুমদার
৺যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
কে শ্রদ্ধার সঙ্গে—

প্রকাশকের বক্তব্য

টেলিভিশন জগতে বাংলা বইয়ের সত্যিই অভাব আছে। ইলেকট্রনিক্স জগতের সাথে হঠাৎ করে জড়িয়ে পড়ার পর, বিভিন্ন শ্রেণীগত ও শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রদের মধ্যে বেসিক ইলেকট্রনিক্স সহ টেলিভিশন সার্ভিসিং-এর সহজ ভাষায় লেখা বাংলা বই না পাওয়ার যে ব্যাকুলতা, যে আকাঙ্খা, তা' আমাকে বাংলায় এই ধরনের বই প্রকাশ করার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তারই ফলশ্রুতি হলো আমার প্রকাশিত প্রথম বই কালার টেলিভিশন সার্ভিসিং।

বর্তমান বইয়ের লেখকদ্বয়ের সাথে পরিচয় দীর্ঘদিনের। ইলেকট্রনিক্সের প্রতি তাদের অনুরাগ আর অধ্যাবসায় আমাকে বার বার চমৎকৃত করেছে। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা টেলিভিশনের শিক্ষার কাজে যুক্ত। থিওরেটিক্যাল জ্ঞানের সাথে সাথে প্র্যাকটিক্যালি, হাতে-কলমে টেলিভিশন শিক্ষা দেওয়ার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে নিরলস চেষ্টায় তাঁরা এই বইয়ের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

আমার এই বই প্রকাশের জন্য শৈব্যা গ্রন্থন বিভাগের শ্রীদুলালচন্দ্র বল আর শ্রীঅশোক রায় চৌধুরী, তাঁদের মূল্যবান সময় বাঁচিয়ে আমাকে যেভাবে সাহায্য করেছেন তার জন্য আমি তাঁদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ রইলাম। তাদের সাহায্য ছাড়া এই বই প্রকাশ করা হয়তো সম্ভব হতো না।

এই বই প্রকাশের সময় আমার স্বর্গীয় পিতামহ ৺পার্শ্বনাথ রাহা'র কথা মনে পড়ছে। তাঁর আশীর্বাদ ও অনুপ্রেরণা আমাকে প্রকাশনার জগতে ঢোকার ক্ষেত্রে প্রভূত সাহায্য করেছে।

পরিশেষে জানাই, বই প্রকাশের ক্ষেত্রে নিছক ব্যবসায়িক মানসিকতা কখনই মাথায় রাখিনি। একটা ভালো ইলেকট্রনিক্সের বই প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সবসময় মনে রেখেছি শিক্ষার্থীদের কথা—যাঁরা এই বই পড়বেন। তাই, এই বই যদি শিক্ষার্থীদের কাছে সমাদৃত হয়, তারা যদি উপকৃত হ'ন—সেটাই হবে আমার প্রকাশিত এই বইয়ের সঠিক মূল্যায়ন।

অর্পিতা রাহা

জুলাই, ১৯৮৯
মনোরমা প্রকাশনী

লেখকের নিবেদন

এখন পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় গণমাধ্যম হলো টেলিভিশন। ভারতেও টেলিভিশনের জনপ্রিয়তা উর্দ্ধমুখী। ইলেকট্রনিক্স শিল্প তাই প্রধানতঃ গড়ে উঠেছে টেলিভিশনকে কেন্দ্র করে। দীর্ঘদিন যাবৎ রঙিন সম্প্রসারণ সত্বেও আজও কিন্তু ভারতে বিক্রিত দশটা টেলিভিশন সেটের মধ্যে সাতটাই ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট সেট। ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট টেলিভিশনের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ হলো মধ্যবিত্তদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যেই এর মূল্য বাঁধা। বর্তমানে পোর্টেবল টেলিভিশনও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

দীর্ঘদিন যুক্ত আছি ইলেকট্রনিক্স জগতে। বিশেষ করে টেলিভিশনের সাথে পরিচয় আরো গভীর। টেলিভিশনের ক্লাস নিতে গিয়ে, থিওরেটিকাল এবং প্র্যাকটিকাল—উভয় ক্ষেত্রেই ছাত্রদের মধ্যে একটা ভালো বাংলা বইয়ের শূন্যতা অনুভব করতাম। টেলিভিশনের ওপর ইংরেজী বই প্রচুর। কিন্তু যারা একটু অল্পশিক্ষিত এবং বাঙালী—মাতৃভাষার মাধ্যমে বেসিক ইলেকট্রনিক্স আর বিভিন্ন সেটের ফল্ট ও সার্ভিসিং এর একটা বইয়ের কথা তারা প্রায়ই বলতো। অনেকের অভিযোগ ছিল, ইংরেজী বইগুলো থেকে প্রয়োজনীয় অংশগুলো জানার জন্য প্রচুর বেশী পড়তে হয়। অনেক ছাত্র-বন্ধুদের এই ধরণের অভিযোগ আর অনুপ্রেরণাই শেষ অবধি আমাদের এই বই লিখতে উৎসাহিত করেছে।

এই বই লিখতে গিয়ে যে ভাবে ছাত্র-বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি তা' ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাদের উৎসাহ আর সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে আমাদের পক্ষে কখনই এই বই প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। তাদের প্রত্যেকের কাছেই আমাদের কিছু ঋণ রয়ে গেলো, যা শোধ করা যায় না।

শিল্পীবন্ধু দেবাশীষ সামন্ত তার নানান ব্যস্ততার মধ্যে, যে সুন্দর প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছে, তার জন্যও আমরা কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ প্রকাশকের কাছেও। ইলেকট্রনিক্সের প্রতি তার অনুরাগ,, অকৃত্রিম ভালোবাসা আর লেখকদের প্রতি আস্থা—প্রতি-মুহূর্তে এটাই প্রমাণ করেছে যে নিছক ব্যবসা করতে তিনি প্রকাশনার জগতে আসেননি।

সবশেষে জানাই, এই বইয়ের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক্সের বিশাল দরজায় পৌঁছোতে চেয়েছি। টেলিভিশনের জগতও অনেক বড়, জানার বিষয় তাই অসীম। আমরা চেষ্টা করেছি তাই প্রয়োজনীয় বেসিক জ্ঞান অর্জন করে টেলিভিশন শিক্ষার্থীরা তবেই যেন বিভিন্ন রিসিভার সেটের ফল্ট ও সার্ভিসিং-এ প্রবেশ করে। ছাত্রদের কাছে এই বই সমাদৃত হলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক।

অরো কমার্শিয়াল সেণ্টার
(প্র্যাকটিক্যাল টি ভি ট্রেনিং সেণ্টার)
১১৮/২, বি, বি, গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২

গৌতম মজুমদার
অমিত বিশ্বাস

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অক্ষয়কুমার শীল
শুভেন্দু নন্দী
সুবিমল বিশ্বাস
বিমলেন্দু চৌধুরী
বিশ্বজিত সমাদ্দার
কালীকৃষ্ণ মণ্ডল
মধুসূদন ঘোষ
সুশান্ত চ্যাটার্জী
চিত্তরঞ্জন ভৌমিক
পিনাকপানি ভট্টাচার্য্য
পার্থ রাহা
প্রতিমা মজুমদার
সোনা ঘোষ
ভুদেব মজুমদার
দুলাল চন্দ্র বল (শৈব্যা)
অশোক রায় চৌধুরী
শিবপদ মান্না
শিবতোষ দত্ত

সূচীপত্র

১

ইলেকট্রিসিটি'র প্রাথমিক জ্ঞান

কারিগরী শাখার প্রত্যেকটি বিভাগই অন্তঃ সম্পর্কযুক্ত। তড়িৎবিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, বাস্তুবিজ্ঞান—প্রত্যেকেই যেন সহোদর ভাই। কিন্তু, তড়িৎবিজ্ঞান (Electrical) আর ইলেকট্রনিক্স এর সম্পর্ক আরো গভীর। এ যেন সেইরকম যমজ ভাই, যাদের দেহ এক শুধু মাথাটা আলাদা। তড়িৎবিজ্ঞানের জ্ঞানটুকু সম্বল করেই তো এগিয়েছে ইলেকট্রনিক্স। তাই এই দু'টো বিভাগকে আলাদা করে দেখাটা শুধুই স্বপ্নবিলাস। যেহেতু এই বইয়ে ইলেকট্রনিক্সের একটা ছোট্ট দিক—টেলিভিশন বা টিভি নিয়েই আলোচনা করা হবে, তাই সবার আগে তড়িৎ বা ইলেকট্রিসিটির সঙ্গে একটু প্রাথমিক আলাপ সেরে ফেলা যাক।

আমরা কারেন্ট, ভোল্ট, অ্যামপিয়ারের মতো ভারী ভারী শব্দ প্রায়ই শুনি। কিন্তু এগুলো আসলে কী? এ ব্যাপারে উদাহরণ দিয়ে বোঝালে এই প্রশ্নগুলো কিছুটা সহজ হবে। জলপ্রবাহ আর তড়িৎপ্রবাহের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। একটা বড় জলের পাত্র আর একটা ছোট জলের পাত্রতে জল নিয়ে যদি একটা নলের মাধ্যমে সেই দু'টো পাত্রকে যুক্ত করে দেওয়া হয়, তাহলে কী বড় পাত্র থেকে ছোট পাত্রে জল প্রবাহিত হবে? এর সহজ উত্তর হলো, যদি ছোট পাত্রের জলের তল, বড় পাত্রের জলের তলের থেকে উঁচুতে থাকে, তাহলে ছোট পাত্র থেকে বড় পাত্রে জল প্রবাহিত হবে। আবার বড় পাত্রের জলের তল, ছোট পাত্র থেকে উঁচুতে থাকলে বড় পাত্র থেকে ছোট পাত্রে জল যাবে। তাহলে কোন পাত্রে কত পরিমাণ জল আছে সেটা বড় কথা নয়, জলের তল-পার্থক্যই জলকে প্রবাহিত করার একমাত্র শর্ত। দু'টো পাত্রের তল সমান হয়ে গেলেই, জলপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়।

তড়িৎপ্রবাহর ক্ষেত্রেও, তড়িৎগ্রস্থ কণাগুলো পরিবাহী পদার্থের মধ্য দিয়ে, বেশী বিভব (Potential) থেকে কম বিভবের দিকে ছুটে চলে। জলের ক্ষেত্রে যেমন তল-পার্থক্যকে বজায় না রাখতে পারলে জলপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে, তড়িতের ক্ষেত্রেও এই বিভবপার্থক্য বজায় রাখতে না পারলে তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে। তাই বিভিন্ন উপায়ে (ডায়নামো বা ব্যাটারী) আমরা পজেটিভ মেরু আর নেগেটিভ মেরুর মধ্যে বিভবপার্থক্য বজায় রাখি। তাহলে বলা যায়, বিভবপার্থক্য না থাকলে কখনই তড়িৎ প্রবাহিত হবে না বা তড়িৎগ্রস্থ কণাগুলো চলাচল করবে না। বিভবপার্থক্য থাকলেই তড়িৎগ্রস্থ কণাগুলো, কোনো নির্দিষ্ট দিকে, কোনো কারণে ছুটে চলে। যাকে বলা হয় তড়িৎপ্রবাহ বা কারেন্ট। কিন্তু কেন কণাগুলো ছুটে চলে? আসলে, একটা বল (Force), তড়িৎগ্রস্থ কণাগুলোকে পরিবাহী পদার্থের মধ্য দিয়ে, নির্দিষ্ট দিকে ছুটে যেতে বাধ্য করে। এই বলের নাম তড়িৎ-চালক বল (Electro-motive force)।

এইবার, যে নল দিয়ে জল প্রবাহিত হচ্ছে, সেখানে প্রতি সেকেণ্ডে কী পরিমাণ জল যাচ্ছে সেটাই জলপ্রবাহ-মাত্রা। ঠিক সেরকম, কোন পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে যে পরিমাণ তড়িৎপ্রবাহ বা আরো সঠিকভাবে তড়িৎগ্রস্থ কণা যাচ্ছে সেটাই তড়িৎপ্রবাহ মাত্রা। এক সেকেণ্ডে এক কুলম্ব পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহিত হলে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা হবে এক অ্যামপিয়ার।

আবার, জলপ্রবাহকারী নলটিকে সরু নিলে জলপ্রবাহ কম হবে, মোটা নিলে বেশী হবে। এটাকে তো এভাবেও বলা যায় যে সরু নলের প্রবাহকে বাধা দেবার ক্ষমতা, মোটা নলের চেয়ে বেশী। তড়িৎপ্রবাহের ক্ষেত্রেও এই

রকম হয়। এটাকেই রোধ বা রেজিস্টেন্স (Resistance) বলে। রোধ নির্ভর করে কোন পরিবাহীর (ধরা যাক, তামার তার) দৈর্ঘ্য, প্রস্থচ্ছেদ ও উপাদানের উপর।

তড়িৎপ্রবাহ মাত্রার একক হলো অ্যাম্পিয়ার (Ampere), বিভব প্রভেদের একক হলো ভোল্ট (Volt) এবং রোধের একক হলো ওহম্ (Ohm)।

একটা ছোট অথচ প্রয়োজনীয় সম্পর্ক ঃ

তড়িৎপ্রবাহ, বিভব প্রভেদ বা ভোল্টেজ এবং রোধের মধ্যে একটা সুন্দর সম্পর্ক আছে। সেটা হলো ঃ

ভোল্টেজ (V) = তড়িৎপ্রবাহ (I) × রোধ (R)

এখন কোন যন্ত্রাংশ বা পার্টসের অথবা কোনো সার্কিটের ভোল্টেজ এবং রোধ যদি আমরা জানতে পারি তাহলে সেই পার্টস বা সার্কিটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎমাত্রা আমরা সহজেই বা'র করে ফেলতে পারবো। বস্তুতঃ, তিনটের যে কোনো দু'টো মান জানলেই তৃতীয়টা বা'র করা খুবই সহজ।

এইবার একটু জটিলতায় যাচ্ছি। কোনো নির্দিষ্টদিকে ইলেকট্রনের প্রবাহকেই তড়িৎপ্রবাহ বলা হয়। ইলেকট্রন শব্দটা একটু নতুন নতুন লাগছে। আসলে ঐ তড়িৎগ্রস্থ কণাগুলোর নামই ইলেকট্রন। এ ব্যাপারে আমরা পরে আলোচনা করবো। এখন শুধু একটু ঘুরিয়ে আবার বলি, একটি পরিবাহী পদার্থর মধ্যে দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ তখনই সম্ভব, যখন সেই পদার্থের ইলেকট্রন কণাগুলো একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে চলাচল করবে।

তড়িৎপ্রবাহ বা কারেন্ট দুই প্রকারের ঃ

সমমুখী তড়িৎ প্রবাহ বা ডাইরেক্ট কারেন্ট (D.C.) এবং পরিবর্তী তড়িৎপ্রবাহ বা অলটারনেটিং কারেন্ট (A.C.)

ডাইরেক্ট কারেন্ট(D.C.) = ডি সির ক্ষেত্রে, তড়িৎপ্রবাহ সবসময় একমুখী অর্থাৎ ইলেকট্রনপ্রবাহ সবসময় ঋণাত্মক বা নেগেটিভ দিক থেকে ধনাত্মক বা পজেটিভ দিকে প্রবাহিত হয়। তাই একমুখী এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ তড়িৎপ্রবাহকে ডি সি বলে। সময় সাপেক্ষে ডি সি তড়িৎপ্রবাহ তরঙ্গর লেখচিত্র (Graph) আঁকলে তাই দেখা যায় সেটি সর্বদা সরলরেখায় চলে। চিত্র ১.১ ক ও ১.১ খ দেখলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে।
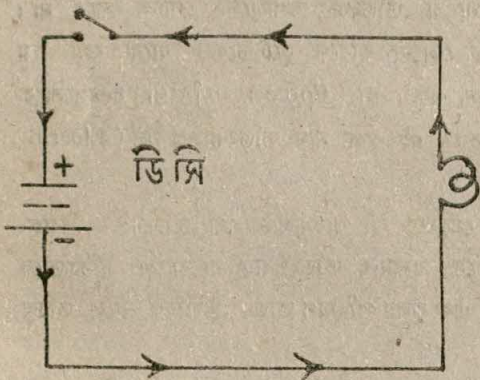
চিত্র ১.১ ক
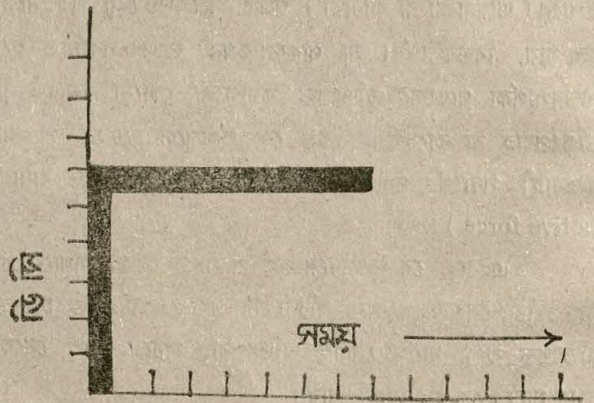
চিত্র ১.১ খ

অল্টারনেটিং কারেন্ট(A.C.)=এ সির ক্ষেত্রে, বিভব প্রভেদের মেরুদ্বয় সকসময় পরিবর্তনশীল হয়। পজেটিভ থেকে নেগেটিভ, আবার নেগেটিভ থেকে পজেটিভ—এভাবেই পরিবর্তিত হয়। যার ফলে তড়িৎপ্রবাহও পরিবর্তিত হয়। তাই, এ সির ক্ষেত্রে লেখচিত্রটি চিত্র ১.২ এর মতো হয়।
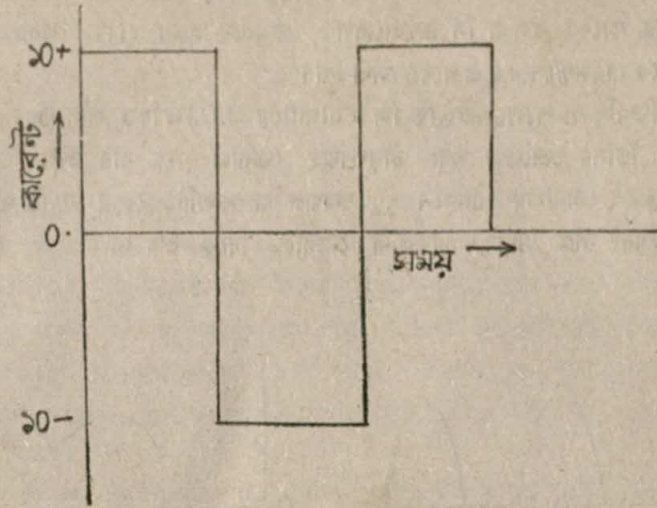
চিত্র ১.২

এ সির পূর্ণতরঙ্গ বা এ সি সাইকল (A.C. Cycle)—এ সি তরঙ্গর তড়িৎপ্রবাহ পজেটিভ এবং নেগেটিভ
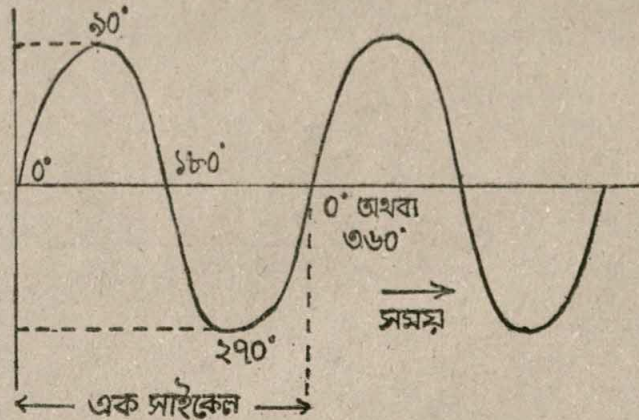
চিত্র ১.৩

মান অনুযায়ী যখন একটি পূর্ণতরঙ্গ লেখচিত্র সম্পূর্ণ করে, তাকে বলে একটি সাইকল্। আরো সহজ কথায় বললে,

তড়িৎপ্রবাহ শূন্য থেকে পজেটিভ দিকে বাড়তে বাড়তে চূড়ান্ত বিন্দু (90°)তে পৌঁছে আবার কমে শূন্যতে (180°) নেমে এসে নেগেটিভ দিকে চূড়ান্ত বিন্দু (270°)তে পৌঁছে আবার শূন্যতে (360° বা 0°) নেমে আসাকে পূর্ণ সাইকল্ বলা হয়। চিত্র ১.৩ দেখলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

এ সি তরঙ্গর স্পন্দন সংখ্যা বা এ সি ফ্রিকোয়েন্সি (A. C. frequency) = এক সেকেণ্ডে যতগুলো এ সি সাইকল্ সৃষ্টি হয়, তাকেই বলে এ সি ফ্রিকোয়েন্সি। এর একক হলো হার্ৎস [Hertz] অথবা সাইকল্ প্রতি সেকেণ্ড (c. p. s.) এটাকে সাইকল্/সেকেণ্ড এভাবেও লেখা হয়।

স্পন্দনশীল ডি সি বা পাল্সেটিং ডি সি (Pulsatiug D.C.) = দিক পরিবর্তন না করলেও অর্থাৎ একই দিকে প্রবাহিত হলেও ডিসির ভোল্টেজ এবং তড়িৎপ্রবাহ ওঠানামা করে, যার ফলে ডি সির ক্ষেত্রেও একটা তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই ওঠানামার পরিবর্তন শুধু ধনাত্মক বা পজেটিভ মেরুর মধ্যেই থাকে তাই এর লেখচিত্র ঢেউ খেলানো কিন্তু তা কখনই নীচে অর্থাৎ ধনাত্মক বা নেগেটিভ দিকে যায় না।

চিত্র ১.৪

২
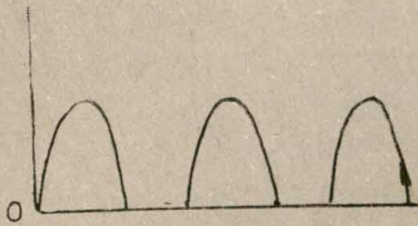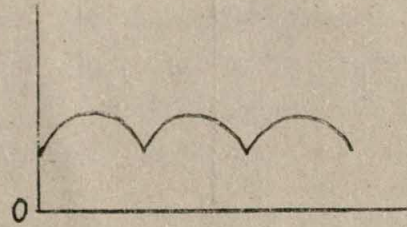
পদার্থের পারমাণবিক গঠন ও তড়িৎ সঞ্চালন

এবার একটু একটু করে ইলেকট্রনিক্সের মজাদার জগতের সঙ্গে পরিচয় পর্বের আগে, ইলেকট্রনিক্সের জন্মদাতা ইলেকট্রনের সঙ্গেও অপরিচিতের ব্যবধানটুকু ঘুচিয়ে ফেলা যাক।

পদার্থের পারমাণবিক গঠন এবং তার সাহায্যে তড়িৎ সঞ্চালন কীভাবে সম্ভব হলো—এ সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধ্যানধারণা থাকলে আগামী দিনে কাজ করতে বেশ সুবিধা হয়, উৎসাহও বাড়ে। সর্বোপরি নিজেকে অন্ধবিশ্বাসীর জায়গা থেকে অনেকটা যুক্তিবাদীর দিকে, এগিয়ে দেওয়া যায়।

প্রথমে জানা ছিলো, পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণার নাম অণু। তারপর দেখা গেল অণুকেও ভাঙ্গা যায়, তখন বলা হলো পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা পরমাণু। এবার আবার পরমাণুকেও ভেঙ্গে ফেলা হলো। অণুর মধ্যে পেয়েছিলাম পরমাণু আর পরমাণুর মধ্যে পেলাম তিনটে কণা—ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন। এবার নতুন করে ব্যাখ্যা করা হলো যে, পদার্থের সর্বগুণ সম্পন্ন ক্ষুদ্রতম কণা অণু আর পরমাণু হলো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ক্ষুদ্রতম কণা। বেশ, এটা না হয় হলো, কিন্তু পরমাণুকে ভাঙার পর কী হলো? ভাঙার কাজ চলতেই থাকলো। কিন্তু এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই তড়িৎবিজ্ঞানের পুরোনো ধ্যানধারণাগুলো ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেলো। 'ইলেকট্রনিক্স শিল্প'র ভাবনা-চিন্তা নতুন করে শুরু হলো।

বিজ্ঞানীরা দেখলেন, পরমাণু গঠিত তিনটে কণা—পজেটিভ তড়িৎগ্রস্থ প্রোটন, নেগেটিভ তড়িৎগ্রস্থ ইলেকট্রন এবং নিস্তড়িত নিউট্রন দিয়ে। পরমাণুতে প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান থাকে এবং এদের তড়িৎ বহন মাত্রা সমান ও বিপরীত। সেইজন্যই পরমাণুতে সাম্যতা বিরাজমান। বিভিন্ন পদার্থের পারমাণবিক গঠন বিভিন্ন হয় এই ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রনের সংখ্যার তারতম্যের জন্য। চিত্র 2.1 দেখলে পরমাণুর গঠন সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মায়।
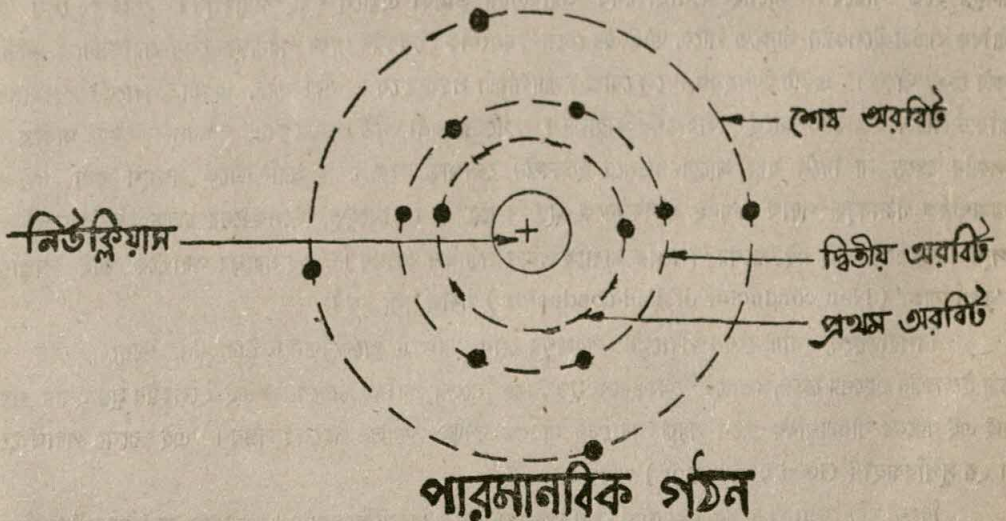
চিত্র ২.১

পরমাণুর গঠনের সঙ্গে সৌরজগতের বেশ মিল আছে। সূর্যের মতো, পরমাণুর কেন্দ্রে আছে নিউক্লিয়াস, যেখানে নিউট্রন আর প্রোটনের বাস। এই নিউক্লিয়াসকে ঘিরে সর্বাধিক সাতটা আবর্ত বলয় বা অরবিট আছে। যার

মধ্যে সংখ্যা অনুযায়ী ইলেকট্রন থাকে। প্রতিটি অরবিটেই ইলেকট্রনের সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে। এভাবেই পরমাণুতে সর্বাধিক সপ্তম অরবিট অবধি ইলেকট্রন তার সংখ্যা অনুযায়ী ছড়িয়ে পড়তে পারে। তবে, সবসময়ই শেষ অরবিটে আটটির বেশী ইলেকট্রন কখনো থাকতে পারে না। এখন দেখা গেছে যে, এই অরবিটগুলোর মধ্যেকার ইলেকট্রনগুলো আলাদা আলাদা ক্ষমতা বা এনার্জি সম্পন্ন থাকে। নিউক্লিয়াসের কাছের অরবিট থেকে দূরবর্তী অরবিটটির মধ্যে ক্রমান্বয়ে এনার্জি বৃদ্ধি ঘটে। এখন যদি নিউক্লিয়াসের সবচেয়ে কাছের অরবিটের ইলেকট্রনে কিছু এনার্জি যুক্ত করা যায় তাহলে সে সেই এনার্জিকে পরবর্তী অরবিটের ইলেকট্রনের দিকে ঠেলে দেবে। এইভাবে ক্রমশঃ যদি আরো এনার্জি যুক্ত করা হয়, তাহলে সেই এনার্জি শেষ অবধি পৌঁছোবে শেষ অরবিটের ইলেকট্রনে। [এখানে উল্লেখ করা দরকার, পদার্থের পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের সংখ্যার উপর নির্ভর করে সে কতগুলো অরবিট জুড়ে থাকবে। কোনো কোনো পদার্থের প্রথম অরবিটটিই শেষ অরবিট হিসাবে গণ্য হয় (যেমন হাইড্রোজেন পরমাণু, যার ইলেকট্রন সংখ্যা মাত্র একটি) আবার কোনটির চতুর্থ অরবিটটি শেষ অরবিট হিসাবে গণ্য হয় (যেমন জাইরেনিয়াম, যার ইলেকট্রন সংখ্যা বত্রিশটি)] এখন যদি আরো এনার্জি যুক্ত করা হয়, তাহলে শেষ অরবিট থেকে ইলেকট্রন তার পারমাণবিক বন্ধন ছিঁড়ে মুক্ত হয়ে যাবে। এই মুক্ত ইলেকট্রনের সঠিক ব্যবহারের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ইলেকট্রনিক্সের প্রাণ ভোমরা। তাই পারমাণবিক গঠনের শেষ ঘর অর্থাৎ পদার্থ অনুযায়ী তার শেষ অরবিটটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যাকে ভ্যালেন্স সেল বা ভ্যালেন্স কক্ষও বলা হয়।

একটা প্রশ্ন মনে জাগতেই পারে যে, মুক্ত করার কাজে ইলেকট্রনকেই কেন ব্যবহার করা হয়? পজেটিভ তড়িৎগ্রস্থ প্রোটন কী দোষ করলো? আসলে প্রোটন ক্ষুদ্র হলেও বেশ ভারী, তাছাড়াও প্রোটন বসে আছে নিউক্লিয়াসের মধ্যে। সেখান থেকে তাকে সরানো বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার! কিন্তু ইলেকট্রন, প্রোটনের চেয়ে আকারে বড় হলেও, ওজনে খুবই হালকা এবং থাকেও বিভিন্ন অরবিটে, বিচ্ছিন্নভাবে। তাই ইলেকট্রনকে মুক্ত করা সহজেই সম্ভব।

আবার পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরে যাই। পদার্থের রাসায়নিক স্থায়িত্বর উপর নির্ভর করে, সে কতটা পারমাণবিক বন্ধনমুক্ত হতে পারবে। আগেই বলেছি, শেষ অরবিটটির ভূমিকা এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু শেষ অরবিটে সর্বাধিক আটটা ইলেকট্রন থাকতে পারে, তাই এর চেয়ে কমসংখ্যক ইলেকট্রন থাকা পরমাণুর, শেষ অরবিটটাকে ভর্তি করার একটা চেষ্টা থাকে। একটা উদাহরণ দিলে বোধহয় ব্যাপারটা সহজ হবে। ধরা যাক, একটা পদার্থের পরমাণুর শেষ অরবিটে পাঁচটা ইলেকট্রন আছে অর্থাৎ শেষ অরবিটটা অর্ধেকের বেশী ভর্তি। এক্ষেত্রে, পরমাণুটার চেষ্টা থাকবে পাঁচটা ইলেকট্রন ছেড়ে না দিয়ে বরং আরো তিনটে ইলেকট্রন জোগাড় করে শেষ অরবিটটাকে সম্পূর্ণ করা, এই ধরনের পারমাণবিক গঠনসমৃদ্ধ পদার্থ কখনই ইলেকট্রনকে মুক্ত করবে না। যেহেতু, ইলেকট্রনের চলাচলের উপর তড়িৎপ্রবাহ সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, তাই এই ধরণের পদার্থের মাধ্যমে তড়িৎ সঞ্চালন অসম্ভব। এই ধরনের পদার্থকে তাই 'অপরিবাহী' বা 'কুপরিবাহী' (Non-conductor or Bad-conductor) পদার্থ বলা হয়।

বিপরীতক্রমে, যদি কোন পদার্থের পরমাণুর শেষ অরবিটে থাকে তিনটে ইলেকট্রন, তাহলে সেই পরমাণু পাঁচটা ইলেকট্রন গ্রহণের চেয়ে, তিনটে ইলেকট্রনকে মুক্ত করে নিজের স্থায়িত্ব চাইবে। এই ইলেকট্রন মুক্ত হবার প্রবণতার জন্যই এই ধরনের পারমাণবিক গঠন সমৃদ্ধ পদার্থের মাধ্যমে তড়িৎ সঞ্চালন সহজেই সম্ভব। এই ধরনের পদার্থগুলোকে বলা হয় সুপরিবাহী (Good conductor) পদার্থ।

কিন্তু, যদি কোন পদার্থের পরমাণুর শেষ অরবিটে থাকে চারটে ইলেকট্রন? তাহলে সেই পদার্থ সুপরিবাহীও নয়, আবার কুপরিবাহীও নয়। এই ধরনের পদার্থকেই বলা হয় অর্ধ-পরিবাহী বা সেমি কণ্ডাক্টার (Semi conductor)। 'সেমি কণ্ডাক্টার' এর বহুল ব্যবহার আছে। কীভাবে সেমি কণ্ডাক্টারকে ব্যবহার করা হয়—তা' পরবর্তী ক্ষেত্রে আলোচনা করা যাবে।

৩

বেসিক ইলেকট্রনিক্স

ইলেকট্রনিক্স এ প্রচুরভাবে ব্যবহৃত হয় যে যন্ত্রাংশ বা পার্টসগুলো, সেগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করার আগে যদি তার কার্যপ্রণালী সামান্য জেনে নেওয়া যায়, তাহলে সার্কিটে তার ব্যবহার কেন করা হয়েছে—সেটা জানতে সাহায্য করে।

রেজিস্টর (Registor) ঃ

প্রথম অধ্যায়ে এই তড়িৎপ্রবাহ বা ব্যাপক অর্থে ইলেকট্রন প্রবাহর আলোচনা প্রসঙ্গে 'রোধ' এর কথা এসেছে। ইলেকট্রনিক্সে মাঝে মাঝেই আমাদের তড়িৎপ্রবাহকে বা ইলেকট্রন প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। 'রেজিস্টর' এর মাধ্যমে

চিত্র_৩.১
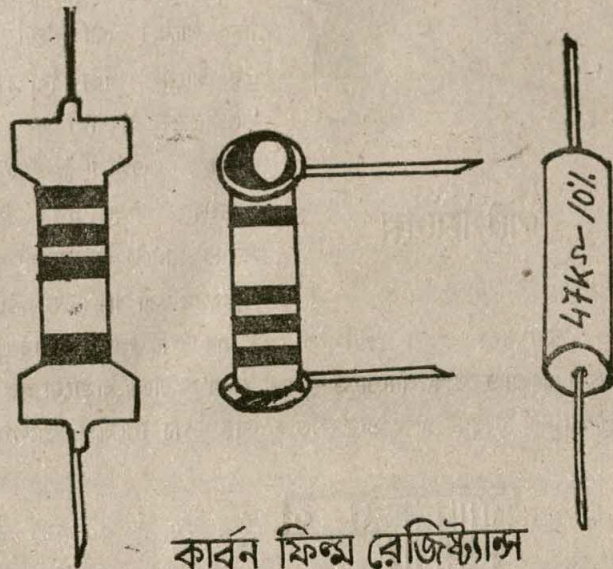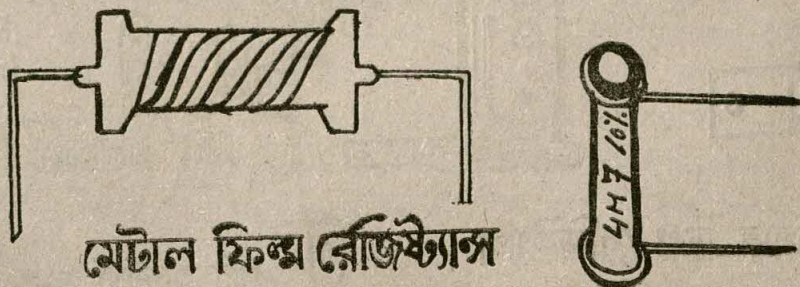
বাধা দিয়ে আমরা ইলেকট্রন প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকি। আরো সহজ কথায় রেজিস্টরকে তড়িৎপ্রবাহ পথে লাগালে সে তড়িৎপ্রবাহমাত্রা কমিয়ে, পথের অপর প্রান্তে আমাদের প্রয়োজনীয় তড়িৎপ্রবাহ পেতে সাহায্য করে। এখন 'রেজিস্টর' এর মান এর উপর নির্ভর করে, সে কতটা তড়িৎকে তার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে দেবে।

'রেজিস্টর' দু ধরণের—স্থির (Fixed) এবং পরিবর্তনশীল (Variable)। এই দু'ধরনের রেজিস্টরই দু'ভাবে বানানো হয়। এক, কার্বনের **প্রলেপ লাগিয়ে**, যাকে বলা হয় কার্বন ফিল্ম (Carbon Film) ; দুই, তার জড়িয়ে, যাকে বলে **'ওয়ার উণ্ড'** (Wire Wound)।

কার্বন ফিল্ম **রেজিস্টর**—ছোট্ট সেরামিক টিউবের গায়ে কার্বনকে জমিয়ে, দু'পাশের ধাতব পাত থেকে দু'টো তার বা'র করে, এক ধরনের ক্ষুদ্রাকার স্থির রেজিস্টর বানানো হয়। স্থির রেজিস্টরের মান সর্বদা স্থির থাকে। এর দু'প্রান্তে মিটার লাগিয়ে বা এর গায়ে আঁকা বিভিন্ন রঙের বলয়গুলো 'রঙ-সারণী' অনুযায়ী সমন্বয় করে এর মান বা'র করা হয়। এগুলো $\frac{1}{8}$ ওয়াট থেকে 2 ওয়াট অবধি তড়িৎশক্তি সম্পন্ন হয়। পরিবর্তনশীল রেজিস্টরের মানকে ইচ্ছানুযায়ী বা প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করা যায়। 'ভলিউম কন্ট্রোল' 'প্রি-সেট' আসলে পরিবর্তনশীল রেজিস্টর। সাধারণতঃ একটা 'প্লাস্টিক বেস' এর উপর পাতলা কার্বন চাদর জমিয়ে এটা তৈরি হয়। একটা 'ওয়াইপার' দণ্ডকে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ঘুরিয়ে 'রোধ' কমানো বাড়ানো হয়।
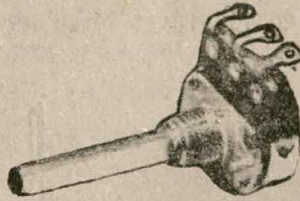
চিত্র ৩.২

ওয়ার উণ্ড **রেজিস্টর**—সেরামিক টিউবের গায়ে তার জড়িয়ে, তার উপর সিমেন্টের প্রলেপ লাগিয়ে এই ধরণের
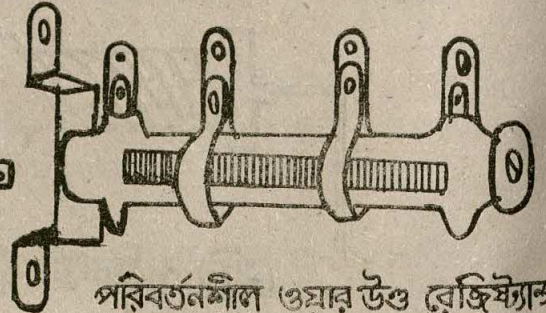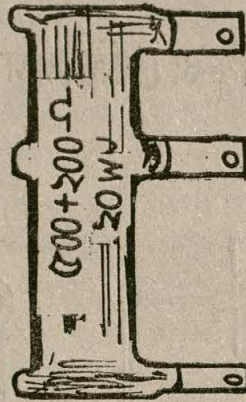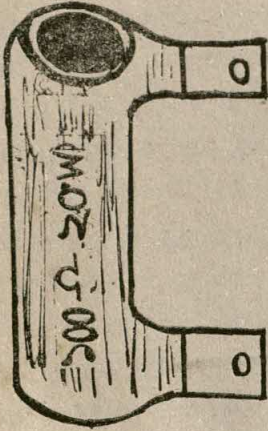
চিত্র ৩.৩

[বিভিন্ন 'রেজিস্টর' এর ছবি]

রেজিস্টর বানানো হয়। সিমেন্টের প্রলেপের ফলে রেজিস্টরটা গরম হয়ে যায় না। এগুলো $\frac{1}{2}$ ওয়াট থেকে 200 ওয়াট অবধি তড়িৎশক্তি সম্পন্ন হয় এবং আকারেও বড় হয়। এর মান রেজিস্টরের গায়ে লেখা থাকে। এই রেজিস্টরের মানও স্থির এবং পরিবর্তনশীল—দু'ধরনেরই হয়।

রেজিস্টর এর সাংকেতিক নাম = R

রেজিস্টর এর সাংকেতিক চিহ্ন =

স্থির পরিবর্তনশীল
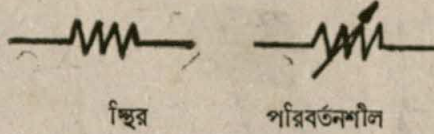
ব্যবহারিক একক (Unit) = ওহম (Ohm), যাকে Ω এভাবেও লেখা হয়।

প্রয়োজন অনুযায়ী এর মান বৃদ্ধি বা কমের জন্য আরো কিছু এককও ব্যবহার করা হয়। সেগুলো হলো,

মিলি ওহম = 0.001 ওহম

কিলো ওহম = (KΩ) = 1000 ওহম

মেগা ওহম (MΩ) = 1000 KΩ = 10,000,00 ওহম।

বাজারে কিন্তু সব মানের রেজিস্টর কিনতে পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে কিছু 'স্ট্যাণ্ডার্ড' রেজিস্টর পাওয়া যায়, প্রয়োজন অনুযায়ী হিসেব করে বেশী বা কম মান সেটে লাগাতে হয়। বাজারে যে স্টাণ্ডার্ড পাওয়া যায় তা'হল : 1, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68. 82, 100। এর গুণিতকের রেজিস্টরই স্ট্যাণ্ডার্ড হিসেবে ধরা হয়।

ক্যাপাসিটর (Capacitor)

ক্যাপাসিটর এর কাজ ডি সিকে সম্পূর্ণ বাধা দেওয়া কিন্তু এ সি সিগন্যালকে নিজের ভেতর দিয়ে চলাচল করতে দেওয়া। বেশী হারে এ সি সিগন্যালকে চলাচল করতে দেওয়ার জন্য ক্যাপাসিটরের মান কমাতে হয়।

বস্তুতঃ, ক্যাপাসিটর গঠিত দু'টো ধাতব পাতের মাঝখানে বায়ুশূন্য (Airgap) রেখে অথবা সেখানে কিছুটা কুপরিবাহী পদার্থ দ্বারা পৃথক করে। এই কুপরিবাহী পদার্থগুলো সাধারণতঃ হয় কাগজ, সেরামিক, মাইকা, প্যারাফিন, মোম লাগানো কাগজ, পোর্সেলিন, কাঁচ ইত্যাদি। ব্যবহৃত কুপরিবাহী পদার্থের ওপরই নির্ভর করে ক্যাপাসিটরের নাম। যেমন পেপার ক্যাপাসিটর, মাইকা ক্যাপাসিটর ইত্যাদি।

ক্যাপাসিটরও দু'ধরনের—স্থির এবং পরিবর্তনশীল। স্থির ক্যাপাসিটরের দু'টো প্রান্ত থাকে এবং মান স্থির। স্থির ক্যাপাসিটরকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়—ইলেকট্রোলাইটিক (Electrolytic) এবং নন্-ইলেকট্রোলাইটিক (Non-electrolytic)। নন্-ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটরের কোনো নির্দিষ্ট মেরু বা পোলারিটি নেই, কিন্তু ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটরের লেগ একটা নেগেটিভ এবং অপরটা পজেটিভ নির্দিষ্ট করা থাকে। সাধারণতঃ নেগেটিভ দিকটা ক্যাপাসিটরের খোল থেকে এবং পজেটিভ দিকটা ক্যাপসিটরের ভেতর থেকে বে'র হয় এবং পজেটিভ দিকটা খুব পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা থাকে। ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটরকে নির্দিষ্ট দিক অনুযায়ী লাগাতে হয়।

পরিবর্তনশীল ক্যাপাসিটরে, ধাতব পাতের প্রয়োজনীয় অংশটাকে একটা চাবি বা নব্ (Knob) এর সাহায্যে পরিবর্তন করে, ক্যাপাসিটরের মান কমানো-বাড়ানো হয়। কখনো কখনো নব-এর বদলে 'স্ক্রু' ও থাকে।

সার্কিটে, ক্যাপাসিটরের কাজ তরঙ্গ গঠন (Wave Shaping) এবং যুক্তকরণ বা কাপলিং (Coupling) করা কিন্তু ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটরের কাজ ফিল্টার করা।

মনে রাখা দরকার, ক্যাপাসিটরের মান নির্ভর করে, তার গঠনে ব্যবহৃত দু'টো ধাতব পাতের দূরত্ব এবং পাত দু'টোর সমতলিক ক্ষেত্র (Surface area)-র উপর। ধাতব পাতের দূরত্ব বাড়লে ক্যাপাসিটরের মান কমে যায় এবং সমতলিক ক্ষেত্র বাড়লে ক্যাপাসিটরের মান বেড়ে যায়। ধাতব পাত দু'টো সাধারণতঃ অ্যালুমিনিয়ামের হয়।
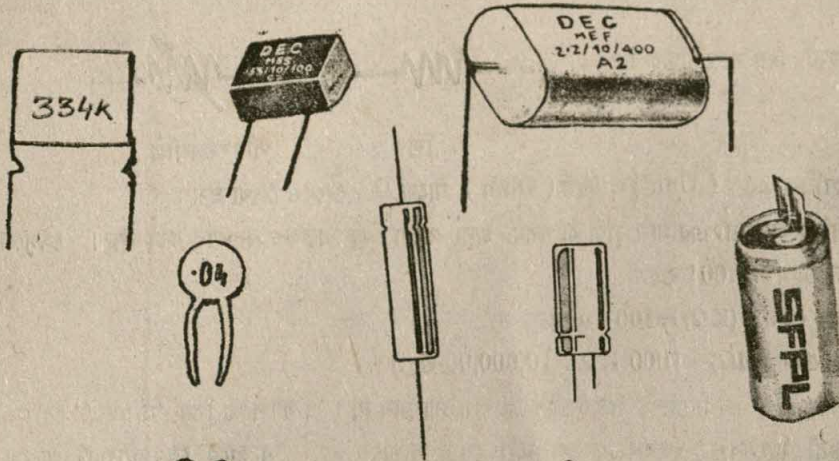
বিভিন্ন ক্যাপাসিটরের চিত্র

চিত্র ৩.৪ ওপরে (১) ডিস্ক ক্যাপাসিটর (২) পেপার ক্যাপাসিটর (৩) পেপার ক্যাপাসিটর
নিচে (৪) ডিস্ক ক্যাপাসিটর (৫) ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর (৬) ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর
(৭) ক্যান টাইপ ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর

ক্যাপাসিটরের সাংকেতিক নাম = C

ক্যাপাসিটরের সাংকেতিক চিহ্ন =

নন্-ইলেকট্রোলাইটিক ইলেকট্রোলাইটিক

ক্যাপাসিটরের একক = ফ্যারাড (Farad)

ব্যবহারিক একক = মাইক্রোফ্যারাড (Mf), পিকোফ্যারাড বা মাইক্রোমাইক্রোফ্যারাড (Pf or MMf) এবং কিলো পিকোফ্যারাড (KPf)

এক ফ্যারাড এর দশ লক্ষ ভাগ হলো মাইক্রোফ্যারাড এবং মাইক্রোফ্যারাড এর দশ লক্ষ ভাগ হলো পিকো-ফ্যারাড।

সাধারণতঃ ক্যাপাসিটরের মান ওর গায়ে লেখা থাকে। এছাড়াও যতটা অবধি ক্যাপাসিটর সহ্য করতে পারবে সেই ভোল্টেজ হারও লেখা থাকে। যেমন, '68 Mfd, 600V বলতে বোঝায় এর মান 0·68 মাইক্রোফ্যারাড এবং 600

ভোল্ট অবধি এটা কাজ করতে পারবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, পেপার বা মাইকা ক্যাপাসিটরের গায়ে রঙ সারণী দিয়েও মান চিহ্নিত করা থাকে।

এবার, বোঝার সুবিধার জন্য আরো কিছু মান-এর সূত্র দেওয়া হলো।

ইউনিট ফ্যারাড (Unit farad) ঃ

1 ফ্যারাড = 1000,000 মাইক্রোফ্যারাড (Mf) = 10^6 Mf

1 মাইক্রোফ্যারাড = 1000 নেনোফ্যারাড (Nf)

1 নেনোফ্যারাড = 1000 পিকোফ্যারাড (Pf)

মনে রাখতে হবে, এ সিতে ক্যাপাসিটরের বাধা খুবই কম। তবু যে সামান্য বাধা দেয় তা'কে ক্যাপাসিটিভ রিঅ্যাক্টান্স (Capacitive Reactance) বলে। এর একক ওহম (Ohm)।

রঙ সারণী বা কালার কোড (Colour Code) ঃ

রেজিস্টর এবং ক্যাপাসিটর এর গায়ে আঁকা বিভিন্ন রঙ-এর বলয় দেখে মান নির্ণয়ের জন্য একটা 'আন্তর্জাতিক কালার কোড' নির্দিষ্ট করা আছে। খুব ক্ষুদ্রাকার রেজিস্টর আর ক্যাপাসিটরের গায়ে, মান লেখার অসুবিধার কথা চিন্তা করে, এক নজরেই মান বা'র করার এই সহজ আন্তর্জাতিক উপায় বা'র করা হয়েছে। নীচে মানসংখ্যাসহ এই কালার কোড দেওয়া হলো ঃ

কালো (Black)—0
বাদামী (Brown)—1
লাল (Red)—2
কমলা (Orange)—3
হলুদ (Yellow)—4
সবুজ (Green)—5
নীল (Blue)—6
বেগুনী (Violet)—7
ধূসর (Grey)—8
সাদা (White)—9

এছাড়াও আরো দু'টো রঙ টলারেন্স (Tolarance) অর্থাৎ বেশী বা কম—উভয়দিকেই ঐ নির্দেশিত শতাংশ অবধি সে সহ্য করতে পারবে—এই হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

নীচে টলারেন্স কালার এবং শতাংশ মান দেওয়া হলো ঃ

সোনালি (Golden)—5%
রুপোলি (Silver)—10%
কোনো রঙ দেওয়া না থাকলে—20%

কালার কোড তো পাওয়া গেলো, কিন্তু এটা পড়ার ভাষাটা বুঝতে না পারলে, পরপর সাজানো রঙগুলো মূল্যহীন মনে হবে। একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝালে ব্যাপারটা সহজ হবে। একটা রেজিস্টরে তিনটে বা চারটে

কালার থাকে। চারটের ক্ষেত্রে, ধরা যাক রঙগুলো হলো যথাক্রমে হলুদ, বেগুনী, বাদামী আর রুপোলি। এর মধ্যে প্রথম তিনটে রঙের বলয় একটু ঘন ঘন, কিন্তু চতুর্থটা একটু ফাঁক দিয়ে। মান এর জন্য প্রথম তিনটে রঙের বলয়ই দরকার। চতুর্থটা হলো টলারেন্স কালার। যদি তিনটে রঙ থাকে, তাহলে তিনটেই হলো মান এর জন্য নির্দিষ্ট বলয়। এক্ষেত্রে, প্রথম রঙের বলয়টা হলো হলুদ অর্থাৎ 4, দ্বিতীয়টা হলো বেগুনী অর্থাৎ 7 এবং তৃতীয়টা হলো বাদামী অর্থাৎ 1 একটু দূরত্বের চতুর্থ অর্থাৎ টলারেন্স কালার হলো রুপোলি অর্থাৎ 10% টলারেন্স। এখন, প্রথম এবং দ্বিতীয় রঙ অনুযায়ী হলো 47 এবং তৃতীয় রঙ এর অনুযায়ী নির্ধারিত হবে শূন্য সংখ্যা। এক্ষেত্রে, যেহেতু রঙটা বাদামী তাই সম্পূর্ণ মানটা হবে 470Ω এবং 10% টলারেন্স অর্থাৎ 470Ω এর থেকে বেশী বা কমের ক্ষেত্রেও এই রেজিস্টরটা ব্যবহার করা যাবে কিন্তু সেটা কখনই 4·7Ω-এর বেশী বা কম (অর্থাৎ 474.7Ω থেকে 465·3Ω অবধি) হবে না। এখন, তৃতীয় বলয়টা যদি কমলা হতো, তাহলে রেজিস্টরটার মান হতো 47000Ω বা 47kΩ।

আরো একটা উদাহরণ দেখলেই, পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ধরা যাক, রেজিস্টরটার তিনটেই রঙ আছে এবং সেগুলো হলো লাল, লাল আর কালো। রঙ সারণী অনুযায়ী তাহলে হওয়া উচিত 2, 2 এবং শূন্য কিন্তু শেষ রঙটা কালো থাকলে, শূন্যর বদলে ঘরটা খালি ধরতে হবে। তাহলে রেজিস্টরটার মান হলো 22Ω এবং টলারেন্সের ঘরে কোন রঙ না থাকার জন্য টলারেন্স হলো 20% অর্থাৎ 22Ω এর থেকে 4·4Ω বেশী বা কমের ক্ষেত্রেও (অর্থাৎ 26.4Ω থেকে 17.6Ω অবধি) এই রেজিস্টরকে ব্যবহার করা যাবে সহজেই।

কখনো কখনো পার্টসের গায়ে তিনটে রঙ আর একটা ডট্ বা বিন্দু দিয়েও মান নির্দেশ করা থাকে। এক্ষেত্রে পার্টসটার গায়ের মূল রঙ হবে প্রথম সংখ্যা, বাঁদিকের রঙটা হবে দ্বিতীয় সংখ্যা, 'ডট্' বা বিন্দুর রঙটা হবে শূন্যর সংখ্যা এবং ডানদিকের রঙটা হবে টলারেন্স। এখানেও একটা উদাহরণ দেখা যাক। ধরা যাক, রেজিস্টরের গায়ের মূল রঙটা লাল, বাঁদিকের রঙটা কালো, ডট্ এর রঙ নীল এবং ডানদিকের রঙটা সোনালি। তাহলে আগের মতোই, 'কালার কোড' সূত্রানুযায়ী, রেজিস্টরটার মান হবে, 2, 0 এবং 6, যেহেতু তৃতীয় রঙটা শূন্যর সংখ্যা তাই সঠিক মান হলো, 20000000Ω বা 20 মেগা ওহম বা 20 MΩ টলারেন্স 5%।

এবার শেষ রঙ, যার অনুযায়ী শূন্য সংখ্যা স্থির হয়, সেই রঙ অনুযায়ী সহজে রেজিস্টরটার মান নির্ণয়ের একটা সহজসূত্র দেওয়া হলো ঃ

রেজিস্টরের শেষ রঙ	রেজিস্টরের মানের একক (উদাহরণ)
কালো	ওহম (10Ω)
বাদামী	ওহমের দশ গুণিতক (100Ω)
লাল	কিলো ওহমের এক দশমিক (2·2kΩ)
কমলা	কিলো ওহম (22 kΩ)
হলুদ	কিলো ওহমের দশগুণিতক (220 kΩ)
সবুজ	মেগা ওহমের এক দশমিক (2.2 MΩ)
নীল	মেগা ওহম (22 MΩ)
বেগুনী	মেগা ওহমের দশগুণিতক (220 MΩ)

রেজিস্টর এর মান বা'র করার জন্য 'কালার কোড' মুখস্থ থাকলে আশা করি আর কোনো অসুবিধা হবে না।

ইনডাকটার অফ, চোক বা কয়েল (Inductor of Choke or Coil) :

সাধারণতঃ অপরিবাহী পদার্থর উপরে তামার তার জড়িয়ে ইনডাকটার অফ চোক বা কয়েল তৈরি হয়। অপরিবাহী পদার্থটা কোর (Core) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে 'কোর' ছাড়াও কয়েল হয়। এর কাজ হলো বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সির এ সি'র এক সার্কিট থেকে অন্য সার্কিটে অনুপ্রবেশ আটকানো। স্বভাবতঃই কয়েল বা ইনডাকটারের প্রধান কাজ তাই এ সি'কে সম্পূর্ণ বাধা দেওয়া এবং ডি সি'কে নিজের মধ্যে দিয়ে চলাচল করতে দেওয়া।
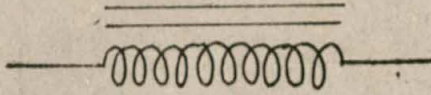
ইনডাকটরের সাংকেতিক চিহ্ন

চিত্র ৩.৫ ইনডাকটাররের সাংকেতিক চিহ্ন ও ছবি

কয়েলের সাংকেতিক নাম—L

কয়েলের সাংকেতিক চিহ্ন =

কয়েলের একক = হেনরি (Henry)

ব্যবহারিক একক = মিলি হেনরি (mH) এবং মাইক্রো হেনরি (MH)।

কয়েল কিনতে গেলে এককের উল্লেখ করতে হয়।

ট্র্যান্সফরমার (Transformer) :

একটা ইনডাকটার বা কয়েলের মধ্যে এ সি পাঠালে, সে এ সি'কে সম্পূর্ণ বাধা দেয় সেটা একটু আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু এই বাধা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েলের চারপাশে তৈরি হয় একটা চৌম্বক ক্ষেত্র বা 'ম্যাগনেটিক ফিল্ড' (Magnetic field)। এ সি'র ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ালে এই চৌম্বক ক্ষেত্রও বেড়ে যায়। এখন এই চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে অন্য একটা কয়েল রাখলে, এ সি আবেশিত হয়ে সেই কয়েলের মধ্যেও চলে যায়। ইলেকট্রনিক্সে এই আবেশিত এ সিকেও ব্যবহার করা হয়। এই দু'টো কয়েলসমৃদ্ধ পার্টসটার নাম ট্র্যান্সফরমার।

ট্র্যান্সফরমারের প্রথম কয়েলটা, যেখানে প্রাথমিকভাবে এ সি দেওয়া হয়েছে, তাকে বলে 'প্রাইমারী কয়েল' এবং যেখান থেকে আবেশিত এ সি নেওয়া হচ্ছে সেটাকে বলে 'সেকেণ্ডারী কয়েল'। এই প্রাইমারী কয়েলের তুলনায় সেকেণ্ডারী কয়েলের তারের পাকের উপর নির্ভর করে আমরা কতটা আবেশিত এ সি পাবো। এমন কি প্রাইমারীর চেয়ে সেকেণ্ডারী কয়েলের পাকসংখ্যা বাড়িয়ে আমরা প্রাথমিকভাবে দেওয়া এ সি'র চেয়েও বেশী এ সি পেতে

পারি। এই ধরনের ট্র্যান্সফরমারকে বলে 'স্টেপ আপ' (Step-up) ট্র্যান্সফরমার। স্বাভাবিকভাবেই সেকেণ্ডারীতে তারের পাকসংখ্যা কমিয়ে আমরা অনেক কম এ সিও পেতে পারি। একে বলে 'স্টেপ-ডাউন' (Step down) ট্র্যান্সফরমার।

এবার তাহলে সহজ কথায় বলতে পারি যে, ট্র্যান্সফরমারের কাজ, সার্কিটে বহমান এ সি'র ভোল্টেজকে প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট এবং স্থির মাত্রায় বাড়ানো অথবা কমানো। কিন্তু, এক ধরনের ট্র্যান্সফরমার আছে যার প্রাইমারী এবং সেকেণ্ডারী তারের পাকসংখ্যা সমান অর্থাৎ এখানে এসি ভোল্টেজের কোনো পরিবর্তন হয় না। এই ট্র্যান্সফরমারের কাজ দু'টো সার্কিটকে আলাদা করা। একে বলা হয় আইসোলেশন ট্র্যান্সফরমার (Isolation Transformer)।
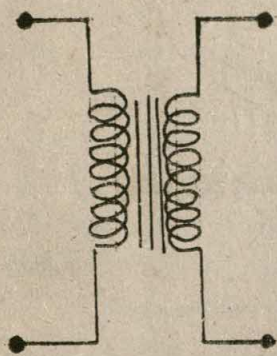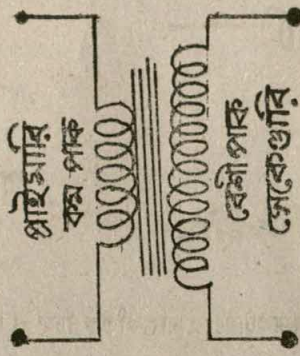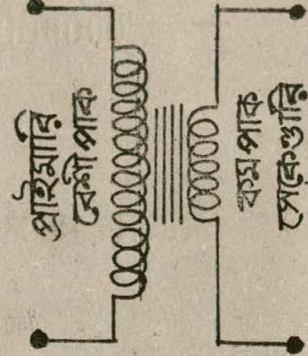
চিত্র ৩.৬

পরিবর্তনশীল ট্র্যান্সফরমার—এতোক্ষণ যে ট্র্যান্সফরমার নিয়ে আলোচনা করা হলো, তাদের 'আউটপুট ভোল্টেজ' (যে ভোল্টেজ সেকেণ্ডারী কয়েল থেকে বেরোচ্ছে) স্থির ছিল। কিন্তু, এছাড়াও একধরনের পরিবর্তনশীল ট্র্যান্সফরমার আছে। এই ট্র্যান্সফরমারের মধ্যে 'ফেরিট কোর' (Ferrite core) কে এগিয়ে পিছিয়ে চৌম্বক বল রেখার (Magnetic flux-lines) পরিবর্তন করা যায়, যার ফলে আউটপুট ভোল্টেজও পরিবর্তিত হয়। 'ফেরিট' হলো শক্ত, কালো এবং চৌম্বক শক্তি ধারণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত পদার্থ—যা এক্ষেত্রে 'কোর' হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বাজারে ট্র্যান্সফরমার কিনতে গেলে, ইনপুট/আউটপুট অনুপাত এবং ভোল্টেজ উল্লেখ করতে হয়।

সাধারণতঃ প্রাইমারী এবং সেকেণ্ডারী কয়েল উপর থেকে আলাদাভাবে চেনা মুশকিল। তবে একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ষ্টেপ ডাউনের ক্ষেত্রে প্রাইমারীর চেয়ে সেকেণ্ডারীর তার সরু হয় এবং ষ্টেপ আপে ঠিক উল্টো অর্থাৎ সেকেণ্ডারীর চেয়ে প্রাইমারীর তার সরু হয়।

ট্র্যান্সফরমারের সাংকেতিক নাম = TR

ট্র্যান্সফরমারের সাংকেতিক চিহ্ন =

ষ্টেপ আপ
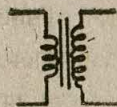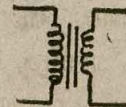
ষ্টেপ ডাউন

ভোল্টেজ ও তারের পাকের অনুপাত ঃ

আগেই বলা হয়েছে, প্রাইমারী এবং সেকেণ্ডারী কয়েলের তারের পাক সংখ্যার উপরই আউটপুট ভোল্টেজ নির্ভর করে। এদের একটা অনুপাত আছে। যদি Np এবং Ns যথাক্রমে প্রাইমারী এবং সেকেণ্ডারী কয়েলের তারের পাক সংখ্যা হয় এবং Ep ও Es যথাক্রমে প্রাইমারী এবং সেকেণ্ডারী কয়েলের ভোল্টেজ হয় (প্রাইমারীতে ইনপুট এবং সেকেণ্ডারীতে আউটপুট ভোল্টেজ পাওয়া যায়) তাহলে এদের এই সমীকরণের মাধ্যমে বোঝানো যায় ঃ—

$$\frac{Es}{Ep}=\frac{Ns}{Np}$$

এই সমীকরণের মাধ্যমে, আমরা যে কোনো তিনটে জানা থাকলে সহজেই চতুর্থটা বা'র করতে পারি।

পাওয়ার ট্র্যান্সফরমার (Power Transformer)

এই ট্র্যান্সফরমার ইলেকট্রনিক্সের বিভিন্ন ক্ষেত্রে (যেমন টিভিতে) 'পাওয়ার সাপ্লাই'য়ের কাজে ব্যবহার করা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সার্কিটে বিভিন্ন ধরনের ভোল্টেজ দরকার হয়। প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা ট্র্যান্সফরমার ব্যবহার না করে, একটা প্রাইমারী কয়েল থেকেই অনেকগুলো সেকেণ্ডারী কয়েলের সাহায্যে আলাদা আলাদা ভোল্টেজ পাওয়া যায়।

স্বাভাবিকভাবে প্রাইমারী কয়েলের ইনপুট ভোল্টেজ এবং বিভিন্ন সেকেণ্ডারী কয়েলের আউটপুট ভোল্টেজের যোগফল সমান হওয়া উচিত। বাস্তবে, আউটপুট ভোল্টেজের থেকে ইনপুট ভোল্টেজ 5 থেকে 10 শতাংশ বেশী থাকে কারণ ট্র্যান্সফরমারের মধ্যেই কিছু তড়িৎশক্তির ক্ষয় হয়ে যায়।
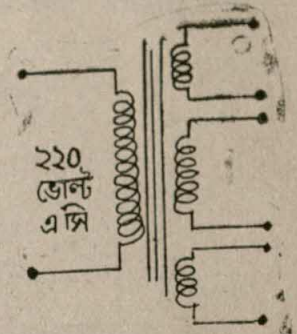
পাওয়ার ট্র্যান্সফর্মার
চিত্র ৩.৭

ইমপিডেন্স ম্যাচিং (Impedance Matching)

ইমপিডেন্স ম্যাচিং বলার আগে, ইমপিডেন্স কা'কে বলে সেটা জানা দরকার। তড়িৎপ্রবাহকে রেজিস্টর দিয়ে বাধা দিলে তাকে বলা হয় রোধ বা রেজিস্টেন্স (Resistance)। এসি প্রবাহকে কয়েল বা ক্যাপাসিটর দিয়ে বাধা দিলে তাকে বলা হয় রিএ্যাক্টান্স (Reactance) এবং একটা সার্কিটের মাধ্যমে যে বাধাগুলো দেওয়া হয় তাদের যোগফলকে বলা হয় ইমপিডেন্স (Impedence)।

এইবার, যখন তড়িৎশক্তিকে, ট্র্যান্সফরমারের মাধ্যমে তড়িৎ উৎস থেকে সার্কিটে, পরিবর্তিত অবস্থায় 'লোড' (Load) এ দেওয়া হয়, তখন লোডের সামগ্রিক ইমপিডেন্স এবং তড়িৎ উৎসের ইমপিডেন্সের মধ্যে একটা ভারসাম্য বা ম্যাচিং থাকলে, সম্পূর্ণ তড়িৎ ক্ষমতাকে ব্যবহার করা যায়। এই ম্যাচিং এ বৈষম্য থাকলে, তড়িৎ ক্ষমতার মাত্র একটা অংশ ব্যবহৃত হয়, বাকীটা আবার উৎসে ফিরে যায় এবং তড়িৎশক্তির অপচয় হয়। তাই তড়িৎশক্তিকে সর্বোচ্চ আবেশিত হওয়াবার জন্য, প্রাইমারী কয়েলের ইমপিডেন্সের সাথে তড়িৎউৎস'র ইমপিডেন্সের ম্যাচিং হওয়া এবং সেকেণ্ডারী কয়েলের ইমপিডেন্সের সাথে লোডের ইমপিডেন্সের ম্যাচিং হওয়া জরুরী।

অটো ট্র্যান্সফরমার (Auto Transformer)

অটো ট্রান্সফরমার, এতোক্ষণ ধরে আলোচিত ট্রান্সফরমারের প্রাথমিক ধারণাটাকেই বদলে দেয়। এতোক্ষণ প্রাইমারী বা সেকেণ্ডারী কয়েল হিসেবে আলাদা করে ন্যূনতম দু'টো কয়েল নিয়ে গড়ে ওঠা ট্রান্সফরমারের বদলে অটো ট্রান্সফরমারে থাকে একটাই কয়েল। সেই কয়েলটাকেই প্রাইমারী এবং সেকেণ্ডারী হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

যদি কয়েলের সম্পূর্ণ পাককে প্রাইমারী হিসেবে ব্যবহার করে, কয়েলের একটা অংশকে সেকেণ্ডারী হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাহলে সেটাকে 'স্টেপ-ডাউন অটো ট্রান্সফরমার' বলে, বিপরীতক্রমে, সম্পূর্ণ অংশকে সেকেণ্ডারী এবং কয়েলের একটা অংশকে প্রাইমারী হিসেবে ব্যবহার করলে 'স্টেপ-আপ অটো ট্রান্সফরমার' বলে। ছবি দেখলেই ব্যাপারটা আর কঠিন মনে হবে না।

স্টেপ-ডাউন অটো ট্র্যান্সফর্মার স্টেপ আপ অটো ট্র্যান্সফর্মার
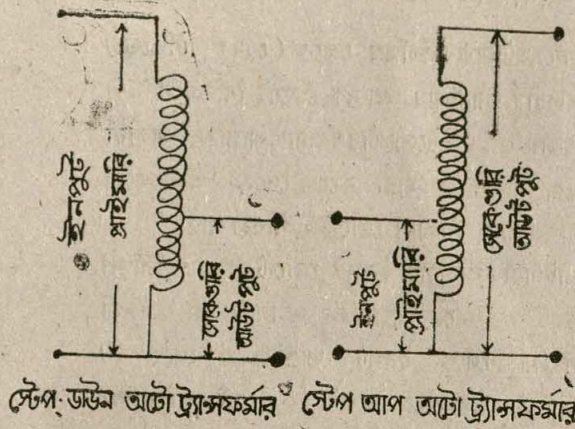
চিত্র ৩.৮

অটো ট্রান্সফরমারে, ভোল্টেজ ও তারের পাক সংখ্যার অনুপাত আগের সেই সমীকরণ $\frac{Es}{Ep} = \frac{Ns}{Np}$ অনুসারে হয়। অটো ট্রান্সফরমারে, সেকেণ্ডারী ভোল্টেজ বা আউটপুট ভোল্টেজ, লোডে দিলে মোটামুটিভাবে সমান মাত্রায় পাওয়া যায় কিন্তু এর মধ্যে প্রাইমারী সার্কিট এবং সেকেণ্ডারী সার্কিটকে আলাদা করে ফেলা সম্ভব নয় যেহেতু এটা ডিসিকে আটকাতে বা ব্লক করতে পারে না।

টিভির ক্ষেত্রে, EHT (Extra High Tension) বা LOT (Line Output Transformer) হিসেবে যে পার্টস ব্যবহার করা হয়, সেটা আসলে একটা অটো ট্রান্সফরমার।

স্পিকার (Speaker)

মনোরঞ্জক ইলেকট্রনিক সামগ্রীতে, বিশেষ করে রেডিও, টেলিভিশন, টেপরেকর্ডারে শব্দের ভূমিকা বিশাল। বিদ্যুৎশক্তি দিয়ে শব্দশক্তি পেতে গেলে, যে পার্টসটা ব্যবহার করতেই হয়, তার নাম স্পিকার।

এটা একটা চোঙাকৃতি (Conical) ধাতব অংশ দিয়ে তৈরী, যার মধ্যে একটা স্থায়ী চুম্বককে জড়িয়ে থাকে

একটা কাগজের ফর্মার উপর জড়ানো কয়েল, যাকে বলা যয় 'ভয়েস কয়েল' বা 'স্পীচ্ কয়েল।' এই পুরো ব্যাপারটা যুক্ত থাকে একটা কাগজের ডায়াফ্রামের সাথে, যাকে কোন (Cone) বলে। কয়েলের দু'টো প্রান্তই হলো স্পিকারের পয়েন্ট, সার্কিট থেকে নির্দিষ্ট দু'টো তার এসে সেখানে যুক্ত হয়।

এই স্পিকারই বিদ্যুৎ তরঙ্গকে, শব্দ তরঙ্গে পরিবর্তিত করে। শব্দ সৃষ্টি করার মতো নির্দিষ্ট বিদ্যুৎ তরঙ্গ, প্রথমে এসে কয়েলের মধ্যে দিয়ে যায় এবং স্থায়ী চুম্বকের কারণে কয়েলটার মধ্যে কম্পনের সৃষ্টি হয়। এর ফলে কাগজের ডায়াফ্রামটাও সামনে-পেছনে (To and fro motion) কাঁপতে থাকে। ডায়াফ্রামের এই কম্পনের ফলে, চার পাশের বায়ুমণ্ডলে কম্পনের সৃষ্টি হয়—সেটাই হলো শব্দ তরঙ্গ।
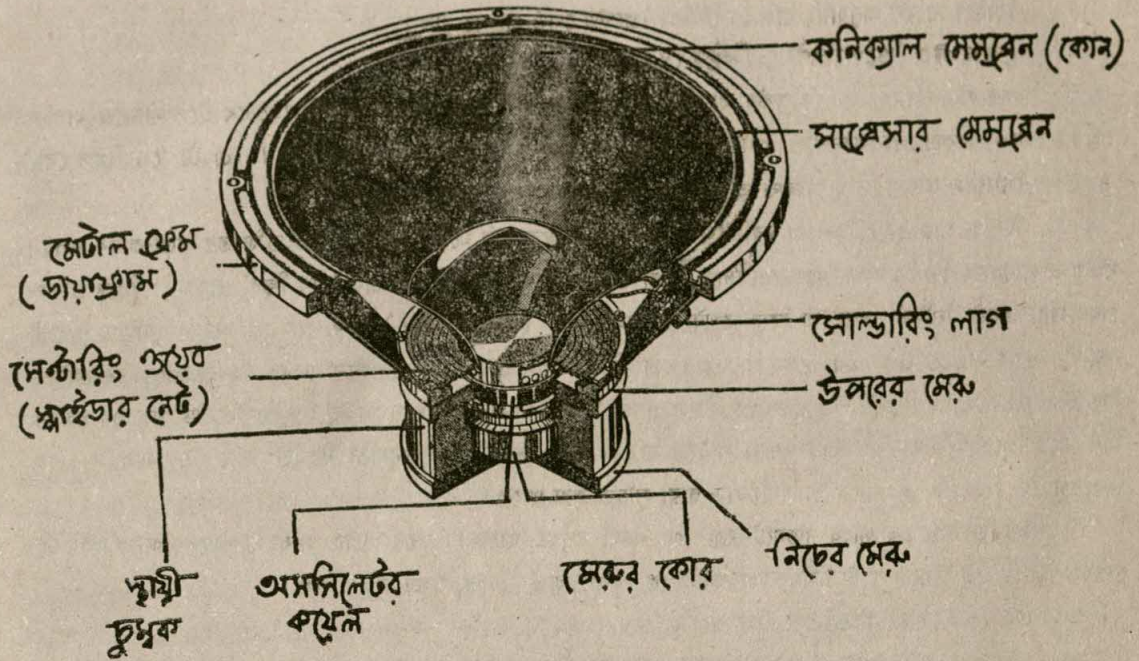
চিত্র ৩'৯

স্পিকারের গায়েই নির্দিষ্ট করে লেখা থাকে, সেটা কত ক্ষমতাসম্পন্ন (Wattage) এবং স্পিকারটা কতটা বাধা (Impedence) দিতে পারবে। স্পিকার কিনতে গেলে এই দু'টোর উল্লেখ করতে হয়।

সাংকেতিক নাম = L. S. বা Sp.

সাংকেতিক চিহ্ন =

প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড (Printed Circuit Board or P.C.B.)

একটা সার্কিটে নানা ধরনের অনেকগুলো পার্টস লাগে। কিন্তু ডায়াগ্রাম অনুযায়ী, সেই পার্টসগুলোকে একের পর এক লাগিয়ে গেলে, সেটা হয়ে উঠবে একটা পার্টস আর তারের জটিল জঙ্গল। পার্টসগুলোকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে লাগানোর জন্য দরকার প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড বা পিসিবি (P.C.B.)।

ক্রিস্ট্যাল তার তৃতীয় অরবিট থেকে একটা ইলেকট্রনকে ঠেলে দেবে চতুর্থ বা শেষ বাইরের অরবিটটাকে পূর্ণ করার জন্য (জারমেনিয়ামের ইলেকট্রনগুলো চারটে অরবিট জুড়ে থাকে, তাই চতুর্থ বাইরের অরবিটটাই তার শেষ অরবিট), এই শূণ্যস্থান তো পূর্ণ হলো, কিন্তু, তৃতীয় অরবিটে হয়ে গেলো একটা শূণ্যস্থান, যাকে ইলেকট্রনিক্স পরিভাষায় বলা হয় হোল (Hole) বা গর্ত। এইবার, দ্বিতীয় অরবিট থেকে একটা ইলেকট্রন উঠে এসে সেই হোলকে পূর্ণ করে। কিন্তু, এই শূণ্যতাকে কী কোনোদিন সম্পূর্ণ করা সম্ভব ? তাই এভাবেই ইলেকট্রন যেদিকে দৌড়োয়, শূণ্যস্থান বা হোল দৌড়োয় তার বিপরীত দিকে এবং এটা চক্রাকারে চলতে থাকে। যেহেতু ইলেকট্রন হারিয়েই এই হোল এর সৃষ্টি তাই এই কৃস্ট্যাল পজেটিভ তড়িৎবাহী হয়ে যায়। ঐ হোলগুলোই মুক্ত পজেটিভ কণার মতো ব্যবহার করে এবং তড়িৎ বহন করে। এই ধরনের পরমাণুতে একটা ইলেকট্রনের অভাব সব সময় থেকেই যায়, তাই এরা সব সময় বাইরের থেকে একটা ইলেকট্রন কীভাবে গ্রহণ করা যায়, তার চেষ্টা চালিয়ে যায়। এই ধরনের পজেটিভ তড়িৎবাহী সেমিকনডাকৃটারকে বলা হয় পি-টাইপ (P-Type) সেমিকনডাকৃটার। একে গ্রহিতা বা এ্যাকসেপ্‌টর (Acceptor) ও বলা হয়।

মোটামুটিভাবে বোঝা যায়, সেমিকনডাকৃটারে ইলেকট্রনের কাজ তড়িৎ বহন করা এবং তা' অবশ্যই ইলেকট্রনের চলাচলের জন্যই সম্ভব হয়। এখন যদি এই ইলেকট্রন চলাচলকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাহলে ফলপ্রসু তড়িৎপ্রবাহও নিয়ন্ত্রিত হবে। এভাবেই, ইলেকট্রন চলাচলের ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে সার্কিটে, ইনপুট তড়িপ্রংবাহ থেকে অনেক বেশী 'আউট পুট' তড়িৎ পাওয়া যায় যাকে বলা হয় এ্যামপ্লিফিকেশন (Amplification)। এ ব্যাপারে পরে আলোচনা করবো।

অর্ধ-পরিবাহী ডায়োড (Semi conductor diode)

ডায়োড হলো একটা পি-টাইপ ক্রিস্ট্যাল এবং একটা এন-টাইপ ক্রিস্ট্যালের সংযোজনে তৈরী সেমিকনডাকৃটার পার্টস। এই সংযোজনের ফলে তৈরী হয় একটা পি-এন জাংশান। বস্তুতঃ পি-টাইপ ক্রিস্ট্যালের হোল এবং এন-

চিত্র ৪.১
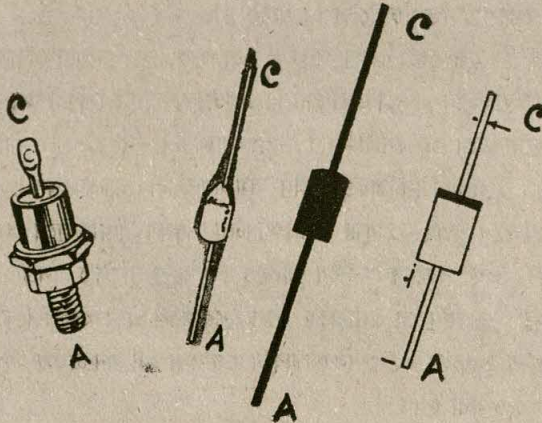
টাইপ ক্রিস্ট্যালের ইলেকট্রন যুক্ত হয়ে তাদের মিলিত জাংশানে একটা নিউট্র্যাল ব্যারিকেড এর প্রলেপ তৈরী করে, যা নিরপেক্ষ (Depletion) ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়।

এখন এই নিরপেক্ষ ক্ষেত্রটাকে সরিয়ে দিতে পারলেই ডায়োডকে কার্যকরী করা যায়। ডায়োডের ফরওয়ার্ড বায়াসের ক্ষেত্রে এই নিরপেক্ষ ক্ষেত্রটাকে সরিয়ে ফেলা সম্ভব হয়। এ ব্যাপারে পরে আলোচনা করছি। তার আগে বরং ডায়োডের গঠন তন্ত্র এবং কার্য্যকারিতা জেনে নেওয়া যাক।

ডায়োডের পি-অংশটাকে অ্যানোড (a) এবং এন-অংশটাকে ক্যাথোড (c) বলা হয়। (চিত্র নং ৪.১ দেখো)

ডায়োড তৈরীর ক্ষেত্রে, জারমেনিয়াম এবং সিলিকনের বহুল ব্যবহার হয় তবে স্থায়ী চরিত্রের কারণে সিলিকনই জারমেনিয়ামের চেয়ে বেশী জনপ্রিয়।

ডায়োডের কাজ তড়িৎপ্রবাহকে একমুখী করা, অর্থাৎ পি থেকে এন অংশে তড়িৎপ্রবাহ যেতে পারবে কিন্তু এন থেকে পি তে কখনই যেতে পারবে না। এই কারণেই ডায়োড ব্যবহার করে আমরা এসি কে সহজেই ডিসি-তে পরিবর্তিত করে ফেলতে পারি। একটা সার্কিটে বহমান অনেকগুলো সিগন্যাল থেকে সঠিক সিগন্যালটাকে আলাদা করে বা'র করে নেওয়ার জন্যও ডায়োডের ব্যবহার করা হয়—যাকে বলে ডিমডিউলেশন (Demodulation)

সাধারণতঃ খুব ছোট ডায়োডের পজেটিভ দিক, একটা লাল দাগের বলয় বা বিন্দু দিয়ে চিহ্নিত করা থাকে। স্বচ্ছ এবং, অস্বচ্ছ—বাজারে পাওয়া যায় এমন দু'ধরনের ডায়োডেই পজেটিভ, এই বিন্দু বা বলয় দিয়ে চিহ্নিত করা থাকে। কালো এবং অস্বচ্ছ ডায়োডের ক্ষেত্রে রূপোলী রঙের বলয়ও ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও লেখা থাকে দু'টো অক্ষর আর দু'টো সংখ্যা (যেমন OA 79)। এ ব্যাপারে ও একটু পরেই আলোচনা করছি।

ডায়োডের সাংকেতিক নাম = D

ডায়োডের সাংকেতিক চিহ্ন = চিত্র ৪.৪-এ দেওয়া আছে।

ফরওয়ার্ড বায়াস (Forward bias)

অর্দ্ধ-পরিবাহী ডায়োড বলতে একটা পি-টাইপ এবং একটা এন-টাইপ ক্রিষ্ট্যালের সংযোজন বোঝায়। এখন ডায়োডের পি-টাইপ ক্রিষ্ট্যাল থেকে বেরিয়ে আসা 'লেগ'-এ যদি ব্যাটারীর পজেটিভ এবং এন টাইপ ক্রিষ্ট্যাল থেকে বেরিয়ে আসা 'লেগ'-এ যদি ব্যাটারীর নেগেটিভ লাগানো যায়, তাহলে তাকে বলে 'ফরওয়ার্ড' বায়াস' অবস্থা, এক্ষেত্রে, ব্যাটারীর পজেটিভ টার্মিনাল, পি-টাইপ ক্রিষ্ট্যালের হোলগুলোকে জাংশানের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। ঠিক
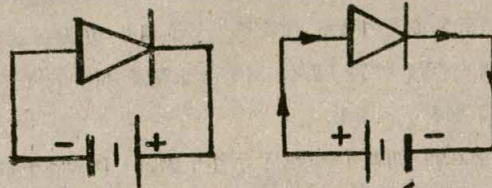
চিত্র ৪.২

একইভাবে ব্যাটারীর নেগেটিভ টার্মিনাল, এন-টাইপ ক্রিষ্ট্যালের ইলেকট্রনগুলোকে জাংশানের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়।

এখন, জাংশানের দিকে হোল এবং ইলেকট্রনের এই ধারাবাহিক প্রবাহর ফলে, ডায়োডের মধ্যে দিয়ে প্রচুর পরিমাণে তড়িৎ প্রবাহিত হয়। এক কথায় বলা যায় যে, ফরওয়ার্ড বায়াস অবস্থায়, ডায়োড তড়িৎপ্রবাহে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

রিভার্স বায়াস (Reverse bias)

পি-এন জাংশন ডায়োডের পি-টাইপ ক্রিস্ট্যালে, ব্যাটারীর নেগেটিভ এবং এন-টাইপ ক্রিস্ট্যালে ব্যাটারীর পজেটিভ টার্মিনাল লাগালে তা'কে 'রিভার্স বায়াস' অবস্থা বলে। এক্ষেত্রে ব্যাটারীর নেগেটিভ টার্মিনাল, পি-টাইপ ক্রিস্ট্যালের হোলগুলোকে আকর্ষন করবে এবং ব্যাটারীর পজেটিভ টার্মিনাল, এন-টাইপ ক্রিস্ট্যালের ইলেকট্রনগুলোকে আকর্ষণ করবে। এখন, এই দুই আকর্ষণ বলই, ইলেকট্রন এবং হোলের মধ্যেকার আকর্ষণ বলের বিপরীতমুখী, যার ফলে হোলগুলো এবং ইলেকট্রনগুলোর কোনো চলাচলই সম্ভবপর হবে না এবং স্বাভাবিক কারণেই এর ফলে, এর মধ্যে দিয়ে কোনো তড়িৎপ্রবাহিত হবে না।

দেখা যায়, সেমিকনডাকটার ডায়োড ফরওয়ার্ড বায়াসে সক্রিয় ভূমিকা নিলেও রিভার্স বায়াসে কোনো ভূমিকাই পালন করে না। সে কারণে এই ডায়োডকে রেকটিফায়ার (Rectifier) বা ডিটেকটর (Detector) হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

ট্র্যানজিস্টর (Transistor)

সিগন্যাল তড়িৎপ্রবাহকে সম্প্রসারিত (Amplify) করার কাজে অতীতে ব্যবহৃত হতো ভালভ্। এর ফলে যে কোনো ইলেকট্রনিক সামগ্রীর চেহারাটাই হতো ঢাউস। সহজেই বহনযোগ্য ইলেকট্রনিক সামগ্রী তখন স্বপ্নবিলাস মাত্র! কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে ছিলেন না। তাঁরাও চাইছিলেন এমন কোনো সহজ পার্টস, যার ফলে এই গোটা ব্যাপারটাকে আমূল বদলে দেওয়া যায়। বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরীতে, জন বার্ডিন, উইলিয়াম শক্‌লে আর ডবলু, এইচ, ব্রিট্রেন—এই তিন বিজ্ঞানীও চেষ্টা চালাচ্ছিলেন এমন একটা ছোট পার্টস বানাতে, যা ভালভের পরিবর্তে ব্যবহার করা যাবে। ১৯৪৮ সালে তাঁরা প্রথম সেই ছোট্ট পার্টসের ব্যবহার করে সুফল পেলেন, যা ভালভের স্থান গ্রহন করতে পারে। সেই যুগান্তকারী পার্টসটির নাম তাঁরা দিলেন 'ট্র্যান্সফার রেজিস্টর'। পরে, এই দুই নামের সম্মেলনে, সেই পার্টসটার নামকরণ হলো "ট্র্যানজিস্টর"।

একটা নির্দিষ্ট টাইপের সেমিকনডাকটারের পাতলা পাতকে, দু'টো অন্য টাইপের সেমিকনডাকটারের মোটা পাত দিয়ে চেপে, তিনটে সেমিকনডাকটারের পাতের থেকে তিনটে লেগ বা'র করে ট্র্যানজিস্টর তৈরী হয়। ব্যাপারটা ঠিক দু'টো পাঁউরুটির মধ্যে মাখনের প্রলেপের সঙ্গে তুলনীয়।

এখন, এন-টাইপ সেমিকনডাকটারের পাতলা পাতকে, দু'পাশ থেকে পি-টাইপ সেমিকনডাকটারের মোটা পাত দিয়ে চেপে ধরে যে ট্র্যানজিস্টর বানানো হয় তা'কে বলে পি-এন-পি টাইপ ট্র্যানজিস্টর। আবার বিপরীতক্রমে, পি-টাইপ সেমিকনডাকটারের পাতলা পাতকে এন-টাইপ সেমিকনডাকটারের মোটা পাত দিয়ে দু'পাশ থেকে চেপে ধরলে তৈরী হয় এন-পি-এন টাইপ ট্র্যানজিস্টর।

ট্র্যানজিস্টরের মধ্যে যে পাতলা পাত থাকে, তার থেকে বেরোনো লেগটাকে বলা হয় বেস (Base)। বাইরের দু'টো মোটা পাত থেকে যে দু'টো লেগ বেরোয় তার একটাকে বলে এমিটার (Emitter) অন্যটাকে বলে কালেকটর

(Collector)। ট্রানজিস্টরে এই তিনটে লেগই আগে থেকেই নির্দিষ্ট করা থাকে এবং চেনার জন্য চিহ্নিত করা থাকে। ট্রানজিস্টর দেখতে নানা রকম হয় তাই তাদের লেগগুলো চেনার উপায়ও নানারকম হয়। নীচে বিভিন্ন চেহারার ট্রানজিস্টরের ছবির সাহায্যে লেগগুলোর অবস্থান দেখানো হলো।
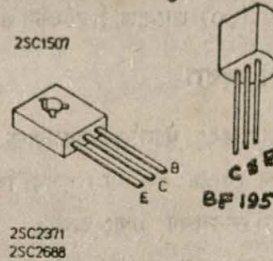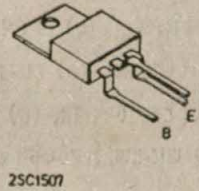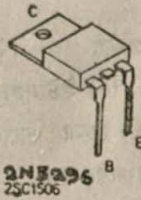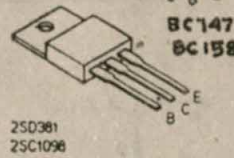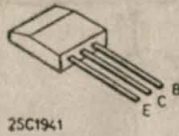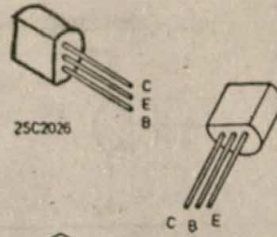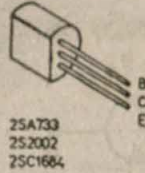
চিত্র ৪.৩

ভালভের চেয়ে অনেক ছোট হলেও, ভালভের তুলনায় ট্রানজিস্টরের যান্ত্রিক আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা অনেক বেশী এবং এর তড়িৎশক্তি ব্যয়ের হারও অনেক কম। একটু সাবধানতা অবলম্বন করলেই ট্রানজিস্টরে দীর্ঘ দিনের স্থায়িত্ব দেওয়া সম্ভব। তবে, ভালভের সাথে তাপের সম্পর্ক বেশ ভালো কিন্তু ট্রানজিস্টরের সাথে তাপের সম্পর্ক মোটেই ভালো নয়। ট্রানজিস্টর চলাকালীন যে তাপ উৎপন্ন হয়, সেটা চারপাশে ছড়িয়ে দিতে পারলে, ট্রানজিস্টর নিজের পূর্ণ শক্তির ব্যবহার সঠিকভাবে করতে পারে। যেহেতু বায়ু তাপের খুব ভালো পরিবাহী নয় তাই এক ধরনের

ভালো তাপ পরিবাহী (Good conductor of heat) পদার্থের খোলে, ট্র্যানজিস্টরটাকে ঢুকিয়ে দিয়ে বেশ ভালো ফল পাওয়া যায়। এই ধরনের তাপ পরিবাহী পদার্থ ব্যবহারের ব্যবস্থাকে বলা হয় হিট সিঙ্ক (Heat sink)।

ট্র্যানজিস্টরের সাংকেতিক নাম = T

ট্র্যানজিস্টরের সাংকেতিক চিহ্ন = চিত্র ৪.৪ এ দেওয়া আছে

বিভিন্ন সেমিকনডাকটর পার্টস এর সাংকেতিক চিহ্ন
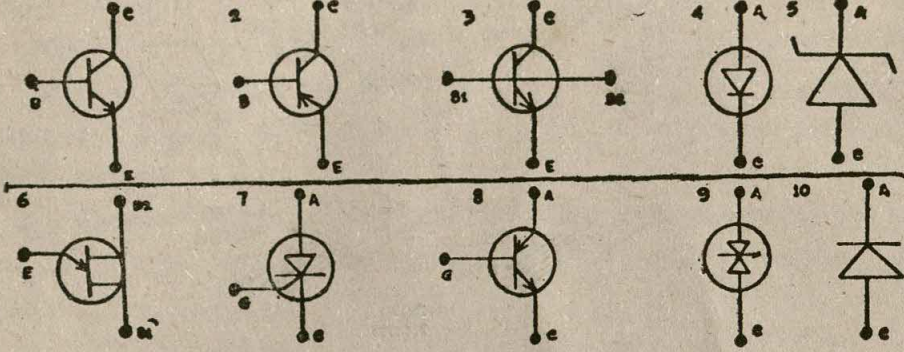
চিত্র ৪.৪ (১) N.P.N. ট্র্যানজিস্টর, (২) P.N.P. ট্র্যানজিস্টর, (৩) N.P.N. ট্র্যানজিস্টর দু'টো বেস যুক্ত, (৪) টানেল ডায়োড, (৫) জেনার ডায়োড, (৬) ইউনিজাংশান ট্র্যানজিস্টর, (৭) সিলিকন কনট্রোলড্ রেকটিফায়ার, (৮) ট্রায়াক, (৯) জেনার ডায়োডের অনুরূপ, (১০) ডায়োড, ডিটেকটর ও রেকটিফায়ারের জন্য

সেমিকনডাকটার টাইপ সংখ্যা

আমরা দেখি, বিভিন্ন ডায়োড এবং ট্র্যানজিস্টরের গায়ে কিছু অক্ষর আর সংখ্যা লেখা থাকে। কিন্তু খেয়াল খুশী মতো একটা কিছু বসিয়ে তো দেওয়া হয় না। সব কিছুরই একটা ধারাবাহিকতা অবশ্যই থাকে। ভারতে বিস্তৃতভাবে সেমিকনডাকটারের গায়ে যে সংখ্যা এবং অক্ষরের ব্যবহার করা হয় তা আসলে ইউরোপিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড সিস্টেম। এক্ষেত্রে, সেমিকনডাকটারের গায়ে সব সময় পাঁচটা শব্দ লেখা থাকে। হয় দু'টো অক্ষর এবং তিনটে সংখ্যা (যেমন BC 148) অথবা তিনটে অক্ষর এবং দু'টো সংখ্যা (যেমন BCY 72)

প্রথম অক্ষরটা মোটামুটি ভাবে, কী পদার্থ দিয়ে সেমিকনডাকটারটা তৈরী—তার হদিশ দেয়। নীচে প্রথম অক্ষরের একটা তালিকা দেওয়া হলো।

A = জারমেনিয়াম (Germenium)

B = সিলিকন (Silicon)

C = গ্যালিয়াম আরসেনাইড (Gallium arsenide)

O = সেমিকনডাকটার (Semiconductor)

R = মিশ্র ফোটো-পরিবাহী পদার্থ (Compound Photo conductive material)

দ্বিতীয় অক্ষরটা বুঝিয়ে দেয় এই সেমিকনডাকটার পার্টসটা সার্কিটের কোন্ ক্ষেত্রে বা স্টেজে ব্যবহার করা হয়। এরও একটা তালিকা দেওয়া হলো।

A = সিগন্যাল ডায়োড [Signal diode (non Power)]

B = পরিবর্তনশীল ক্যাপাসিটর ডায়োড [Variable Capacitor diode]

C = ট্র্যানজিস্টর (এ, এফ) [Transistor A.F]

D = ট্র্যানজিস্টর (এ, এফ টাইপ) [Transistor (A. F. Type)]

E = টানেল ডায়োড [Tunnel diode]

F = ট্র্যানজিস্টর (আর, এফ, টাইপ) [Transistor (R. F. Type non power)]

G = মাল্টি ডিভাইস [Multi device]

L = ট্র্যানজিস্টর (এইচ এফ টাইপ) [Transistor (H. F. Type Power)]

M = হল মডিউলেটর [Hall Modulator]

P = বিকীরণ সুগ্রাহী ডিভাইস (ফোটো ট্র্যানজিস্টর) [Radiation Sensetive Device]

S = সুইচিং ট্র্যানজিস্টর [Switching Transistor (Power)]

Y = রেকটিফায়ার ডায়োড [Rectifier diode (Power)]

Z = জেনার ডায়োড [Zenner diode]

এটা মনে রাখা জরুরী যে, দু'টো অক্ষর এবং তিনটে সংখ্যা যুক্ত সেমিকনডাকটার পার্টসগুলো (যেমন BC 148) মনোরঞ্জন সামগ্রী যেমন রেডিও, টেপ রেকর্ডার, টিভি ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই সীমাবদ্ধ থাকে 100 থেকে 999 এর মধ্যে।

তিনটে অক্ষর আর দু'টো সংখ্যা যুক্ত সেমিকনডাকটার পার্টসগুলো (যেমন BCY 72) ব্যবহৃত হয় বড় বড় শিল্পে এবং ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ইলেকট্রনিকস যন্ত্র যেমন কম্পিউটার ইত্যাদিতে।

সিলিকন নিয়ন্ত্রিত রেকটিফায়ার (Silicon Controlled Rectifier)

1956 সালে সেই বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরীতেই আবিষ্কৃত হলো সিলিকন নিয়ন্ত্রিত রেকটিফায়ার বা এস সি আর (SCR)। এটাও একটা সেমিকনডাকটার পার্টস। বর্তমানে, 'পাওয়ার সাপ্লাই' এর ক্ষেত্রে এটা একটা অপরিহার্য পার্টস। এস সি আর তিন মেগাওয়াট অবধি বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

এস সি আর এর তিনটে পা বা লেগ। অ্যানোড, ক্যাথোড এবং গেট। তড়িৎপ্রবাহ অ্যানোড থেকে ক্যাথোডের দিকে প্রবাহিত হয়, মাঝখানে থাকে গেট। এখানে এই গেটের ভূমিকা কিন্তু বাস্তবের 'গেট' এর মতোই। 'গেট'টাকে হয় আমরা সম্পূর্ণ খুলতে পারি, নয়তো সম্পূর্ণ বন্ধ করতে পারি কিন্তু অল্প একটু ফাঁক করা যায় না। যখন গেট'টা খোলা হয়, তড়িৎপ্রবাহ সহজেই অ্যানোড থেকে ক্যাথোডে যেতে পারে বা একটু ঘুরিয়ে বললে, গেট'টা খোলা থাকলে অ্যানোড আর ক্যাথোডের মাঝে 'বাধা' প্রায় শূন্য। এক্ষেত্রে, এস সি আর এর ব্যবহার শুধুই একটা পরিবাহী তারের মতো। আবার যখন গেটটা বন্ধ তখন কোনো তড়িৎপ্রবাহই অ্যানোড থেকে ক্যাথোডে যেতে পারে না। তখন সার্কিটটার ব্যবহার তড়িৎবিহীন বা শর্ট সার্কিটের মতো।

এখন, এই গেট খোলার মন্ত্রটা কী ? ঠিক 'চিচিং ফাঁক' এর মতোই, ছোট্ট একটা তড়িৎ পালস্ বা সহজ বাংলায় এক ঝলক তড়িৎকে গেটে পৌঁছে দেওয়াই হলো গেট খোলার চাবিকাঠি। খুব অল্প পরিমাণ, এমন কি এক মিলি অ্যামপিয়ার (1 mA) তড়িৎ যদি 'গেট' এ পাঠানো যায়, তাহলেই দরজা খুলে যায় এবং অ্যানোড থেকে ক্যাথোডে তড়িৎপ্রবাহ চলতে থাকে। দশ এ্যামপিয়ার তড়িৎপ্রবাহকে, প্রবাহিত করার জন্য, 'গেট' খোলার পক্ষে এক মিলি অ্যামপিয়ার তড়িৎই যথেষ্ট, এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, একবার গেটটা খুলে গেলে, ঐ এক মিলি অ্যামপিয়ার তড়িৎকে সরিয়ে নিলেও গেটটা খোলাই থাকে। গেটটাকে বন্ধ করার জন্য ঐ তড়িৎপ্রবাহ-মাত্রাকে প্রায় শূন্যতে নামিয়ে আনা ছাড়া অন্য কোনো রাস্তা নেই। এরপর আবার যদি গেটটাকে খুলতে হয় তাহলে আবার গেট-এ দিতে হবে এক ঝলক তড়িৎ !
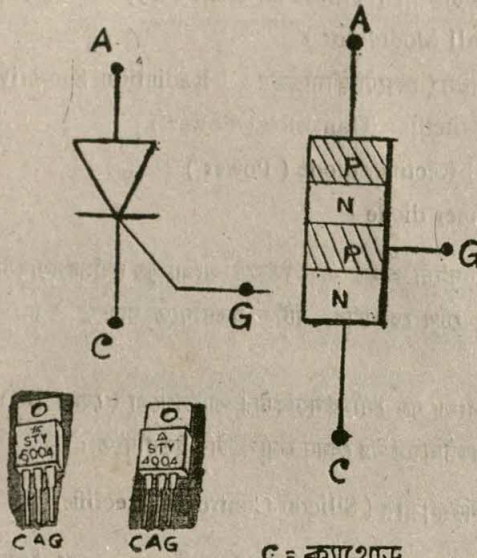
চিত্র ৪.৫

এস সি আর ইলেকট্রনিক জগতে, তার এই অল্প তড়িৎমাত্রায় নিয়ন্ত্রিত গুণের জন্য সমাদৃত হয়েছে। নিরবিচ্ছিন্ন তড়িৎপ্রবাহ বহনের ক্ষেত্রে এর ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। টিভিতে যে এস সি আর ব্যবহার করা হয় তা' দেখতে অনেকটা ট্রানজিস্টরের মতো। সামনে থেকে দেখলে বাঁদিক থেকে ক্যাথোড, অ্যানোড ও গেট পরপর থাকে।

এস সি আর থাইরিস্টর (Thyristor) শ্রেণীভুক্ত, এই শ্রেণীরই অন্য প্রধান পার্টস হলো ট্রায়াক, ডায়াক, ইউনিজাংশান ট্রানজিস্টর (UJT)।

এস সি আর এর সাংকেতিক নাম = SCR

এস সি আর এর সাংকেতিক চিহ্ন = চিত্র ৪.৪ এ দেওয়া আছে।

থার্মিষ্টর (Thermistor)

এটা একটা নিরাপত্তামূলক পার্টস। বিভিন্ন পার্টসের মধ্যে দিয়ে তড়িৎপ্রবাহিত হওয়ার সময় বিভিন্ন কারণে উত্তাপের সৃষ্টি হয়। সার্কিটের উত্তাপ হঠাৎ বৃদ্ধির ফলে, গরম হয়ে গিয়ে যাতে বিভিন্ন সংবেদনশীল পার্টস খারাপ না হয়ে যায়, সেই কারণে থার্মিষ্টর ব্যবহার করা হয়। থার্মিষ্টর সার্কিটের সেখানেই ব্যবহার করা হয়, যেখানে হঠাৎ উত্তাপ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সাধারণ অবস্থায় থার্মিষ্টর খুব অল্প মানের 'রেজিষ্টর' এর মতো ব্যবহার করে কিন্তু যখন গরম হয়ে যায়, তখন এর রোধক মান বেড়ে যায় এবং তার ফলে তড়িৎপ্রবাহমাত্রা কমে যায়, যার ফলস্বরূপ উত্তাপও কমে যায়।

থার্মিষ্টার দু'ধরনের—নেগেটিভ টেম্পারেচর কোএফিসিয়েন্ট (NTC) এবং পজেটিভ টেম্পারেচর কোএফিসিয়েন্ট (PTC)।

টিভিতে থার্মিষ্টরের ভূমিকা খুবই মুখ্য। থার্মিষ্টর তৈরী হয় সেমিকনডাকটার বা অর্ধ পরিবাহী পদার্থর ধাতব অক্সাইড থেকে। প্রায় সমস্ত পদার্থেই, তাপমাত্রার বৃদ্ধির সাথে সাথে রোধও বেড়ে যায়। সেটা হলো পিটিসি (PTC)। রোধ তৈরীর সময় এমন পদার্থ ব্যবহার করা হয় যার পিটিসি খুবই কম।

এটা জানা খুবই প্রয়োজনীয় যে, থার্মিষ্টর উত্তপ্ত হয় দু'ভাবে। বাইরের উৎস থেকে (যেমন অন্য কোন উত্তপ্ত অংশের সাথে যুক্ত হয়ে গেলে) এবং/অথবা তার ভেতর দিয়ে তড়িৎপ্রবাহিত হলে। এখন, থার্মিষ্টর কতটা গরম হবে সেটা নির্ভর করে থার্মিষ্টরের আয়তন (Size) এবং তড়িৎপ্রবাহর বিস্তৃতি (Magnitude) র উপর। টিভি সেটে ব্যবহৃত থার্মিষ্টর অপেক্ষাকৃত বড় হয় এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, তড়িৎশক্তির অল্প ওঠা নামা বা অপব্যয় একে খুব কমই প্রভাবিত করে।

থার্মিষ্টর বিভিন্ন সাইজে এবং নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বিভিন্ন 'রোধক মান' এ পাওয়া যায় যেমন 25° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় অল্প ওহম থেকে কয়েক হাজার ওহম এর থার্মিষ্টর বাজারে পাওয়া যায়।

মনে রাখা দরকার, থার্মিষ্টরের পরিবর্তনের সময় একই ধরনের এবং সঠিক পূর্বেকার মান এর থার্মিষ্টরই লাগাতে হয়।

থার্মিষ্টরের সাংকেতিক নাম = TH.

থার্মিষ্টরের সাংকেতিক চিহ্ন =

'এন টি সি'র চিত্র

চিত্র ৪.৩

৫
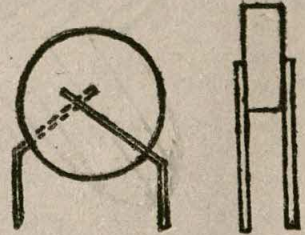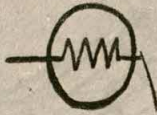
তরঙ্গ বিস্তার

বিভিন্ন তরঙ্গ মাধ্যমকে নিয়েই কিন্তু আমাদের প্রাথমিক এগিয়ে চলা। দূর স্টেশন থেকে প্রচারিত হচ্ছে অনুষ্ঠান এবং তা' সম্প্রসারিত হচ্ছে; আমরা ঘরে বসে সেই অনুষ্ঠান দেখছি, শুনছি। এ ব্যাপারে 'সিগন্যাল' কথাটাও আমাদের কাছে খুবই পরিচিত শব্দ। এর আগে ট্রেন ভ্রমনের সময় আমরা শব্দটা পেতাম। এখন কিন্তু টিভির দৌলতে সবাই বলে "সিগন্যাল ঠিকমতো আসছেনা" বা এই ধরনের নানান কথা। কিন্তু এই কথাগুলোর অর্থ কী? কীভাবেই বা দূরদর্শন কেন্দ্রে বা আকাশবানী ভবনের থেকে আমাদের ঘরে ঘরে শব্দ, ছবি এসে পৌঁছোয়?

এসব কথা জানতে গেলে প্রথমেই জানতে হবে এই বিস্তার (Propagation) শব্দটি। যে যন্ত্রের সাহায্যে দূর স্টেশন থেকে অনুষ্ঠান প্রসারিত হয় সেটাকে বলে ট্রান্সমিটার আর আমাদের ঘরে যে যন্ত্রের সাহায্যে (অর্থাৎ টিভি বা রেডিও সেট) আমরা অনুষ্ঠান শুনি বা দেখি সেটাকে বলে রিসিভার। এই 'বিস্তার' এর অর্থ হলো, ট্রান্সমিটার থেকে বৈদ্যুতিক তড়িৎ-প্রবাহকে, তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গে (Electromagnetic wave) পরিবর্তিত করে বায়ু মাধ্যমের সাহায্যে রিসিভারে পৌঁছে দেওয়া। যখন কোনো সুপরিবাহী পদার্থের মধ্যে দিয়ে তড়িৎপ্রবাহিত হয় তখন কিছুটা তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ বা রেডিও তরঙ্গ, বায়ুমণ্ডলে সৃষ্টি হয়। এই তরঙ্গগুলো অবিচ্ছেদ্য তড়িৎ ও চৌম্বক বলের সম্মিলিত লুপের দ্বারা তৈরী হয়। ৫.১ নং ছবিটা দেখলে ব্যাপারটা কিছুটা পরিস্কার হবে।
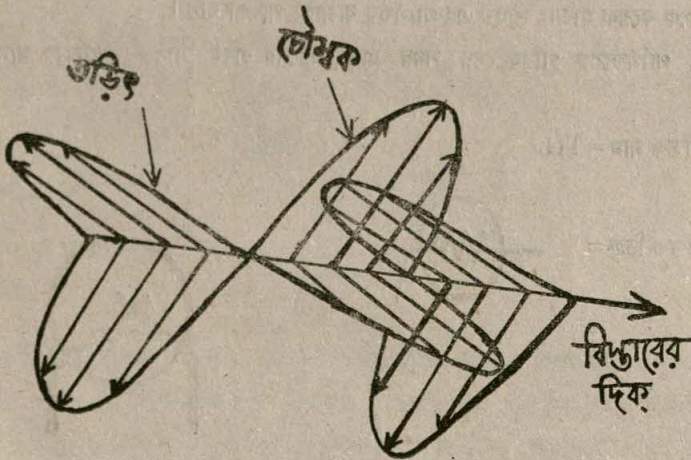
চিত্র ৫.১

এই তড়িৎ ও চুম্বকের লুপগুলো একে অন্যের সাথে সমকোণে থাকে এবং এই তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গগুলো বায়ুমণ্ডলে একটা নির্দিষ্ট ধ্রুবক গতিতে চলাফেরা করে, যা ঠিক আলোক গতির সমান অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে 3,00,000

কিলোমিটার ! মনে রাখতে হবে, এই গতিতে পৌঁছোলে যে কোনো বস্তুই কিন্তু অদৃশ্য হয়ে যায় এবং এই গতিতে সূর্যে পৌঁছোতে লাগে প্রায় আট মিনিট।

তবে বায়ুমণ্ডলে এই গতিতে চলাফেরা করার ফলে, এই তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের একটা বড় অংশ নষ্ট হয়ে যায়। ইংরেজীতে যাকে বলে অ্যাটেনিউয়েশন (Attenuation)। এর আক্ষরিক বাংলা হলো কৃশ বা পাতলা হয়ে যাওয়া। এখন বায়ুমণ্ডলে তরঙ্গ তৈরীর ক্ষেত্রে যেটা বিশেষভাবে মাথায় রাখা হয় সেটা হলো ফ্রিকোয়েন্সি (Frequency) এই ফ্রিকোয়েন্সির অর্থ হলো প্রতি সেকেণ্ডে বায়ুমণ্ডলে কতগুলো তরঙ্গ সৃষ্টি করা হচ্ছে। অল্প ফ্রিকোয়েন্সির তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের ক্ষয় বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার হার অনেক বেশী। যার ফলে দূরবর্তী স্থানে কোনো অনুষ্ঠানকে বায়ুমাধ্যমে পাঠানোর জন্য উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি (প্রতি সেকেণ্ডে ২০,০০০ তরঙ্গর বেশী) ব্যবহার করা হয়। এগুলোকে সাধারণতঃ বলে রেডিও তরঙ্গ (Radio wave)।

রেড়িও তরঙ্গের মধ্যে নিম্নলিখিত গুণগুলো পাওয়া যায়।

(1) এই তরঙ্গ বায়ুমাধ্যমে চলাচলের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট এবং এর গতি 3,00,000 কিলোমিটার/প্রতি সেকেণ্ডে।

(2) অনেক দূরবর্তী স্থানে পৌঁছোনোর জন্য এর ক্ষয় বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরিমান সবচেয়ে কম।

(3) এই তরঙ্গকে শব্দবাহক হিসেবে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ এই তরঙ্গ শ্রবণ ফ্রিকোয়েন্সি (Audio frequency) বহন করে নিয়ে যায়।

রেডিও তরঙ্গের এই গুণাবলীর জন্যই, তার (Wire) ছাড়াই 'অডিও সিগন্যাল' কে এক জায়গা থেকে দূরবর্তী অন্য জায়গায় সহজেই পাঠানো যায়। তরঙ্গের একক হিসেবে ব্যবহৃত হয় হার্ৎজ (Hz)।

তরঙ্গ এবং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল।

এই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে রয়েছে বিভিন্ন গ্যাসের স্তর এবং তা' পৃথিবীতল থেকে প্রায় আটশো কিলোমিটার অবধি ওপর দিকে ছড়ানো। পৃথিবীর মধ্যাকর্ষনের টানে এই স্তরগুলো স্থিতাবস্থায় আছে আর এই স্তরগুলোর জন্যই পৃথিবীর আবহাওয়া, জলবায়ু আমাদের কাছে সহনীয়। ভূপৃষ্ঠ থেকে ওপরের দিকে প্রথম ষোলো কিলো-মিটারের মধ্যেই আছে বেশীর ভাগ গ্যাসস্তর। এই অংশটাকে বলা হয় ট্রোপোস্ফেয়ার (Troposphere)। এরপর ধীরে ধীরে উঠে গেছে স্ট্রাটোস্ফেয়ার (Stratosphere)—যা পঞ্চাশ কিলোমিটার অবধি বিস্তৃত, আয়নোস্ফেয়ার (Ionosphere)—যা ছ'শো কিলোমিটার অবধি বিস্তৃত, এক্সোস্ফেয়ার (Exosphere)—যা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেছে মহাশূন্যে। এই স্তরের ভাগ কিন্তু পুরোটাই কাল্পনিক এবং যত ওপরে উঠেছে ততই এই গ্যাসের স্তর হয়েছে পাতলা।

এর মধ্যে আয়নোস্ফেয়ার স্তরে গ্যাস বিভাজিত অবস্থায় থাকে এবং তার ফলে এর পরমাণুগুলোও বিভাজিত হয়ে তড়িৎগ্রস্থকণা বা আয়ন হয়ে যায়। এই বিভাজন ঘটে সূর্যের থেকে বিচ্ছুরিত অতি বেগুনী রশ্মি (-Ultra-violet Ray) ও অসীম মহাশূন্য থেকে আসা কসমিক রশ্মি (Cosmic Ray) গুলোর জন্য। এই তড়িৎ-গ্রস্থ কণাগুলোর স্তর থেকে প্রতিসারিত (Refracted) হয়ে কিছু ফ্রিকোয়েন্সি পৃথিবীতে ফিরে আসে, যাকে বলা হয় আকাশ তরঙ্গ বা স্কাই ওয়েভ (Sky Wave)।

আয়নোস্ফেয়ারের এই আয়নস্তর রেডিও ওয়েভের কিছু ফ্রিকোয়েন্সিকে প্রভাবিত করে। কিছু ফ্রিকোয়েন্সি এই আয়ন স্তরটা ভেদ করে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যায়। কিছু ফ্রিকোয়েন্সির তরঙ্গ কিন্তু প্রতিসারিত হয়ে ফিরে

আসে এই পৃথিবীতেই, যাকে স্কাই ওয়েভ বলা হচ্ছে। 30 MHz এর নীচের ফ্রিকোয়েন্সিগুলোই প্রতিসারিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে এবং এই ফিরে আসা সম্পূর্ণ নির্ভর করে সেই তরঙ্গগুলো ঠিক কী কোণ (Angle) এ আয়নোস্ফেয়ারে আপতিত হচ্ছে, তার উপর। কম কোণে আপতিত তরঙ্গগুলোই শুধুমাত্র প্রতিফলিত হয়। বেশী কোণে আপতিত তরঙ্গগুলো স্তর ভেদ করে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যায়।

এই 'স্কাই ওয়েভ' এর মাধ্যমে তরঙ্গ বিস্তার সম্ভব 3MHz থেকে 30MHz এই উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির 'ব্যাণ্ড' এর ক্ষেত্রে। এই ব্যাণ্ডের ফ্রিকোয়েন্সি হাজার হাজার মাইল দুরের রিসিভার সেট দিয়ে ধরে, আমরা শুনতে পারি। কিন্তু টেলিভিশনের ছবি এবং শব্দ পাঠানোর জন্য ব্যবহার করা হয় আরো উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির তরঙ্গ। সে ক্ষেত্রে কী ভাবে সম্ভব হয়? ৫.২ নং চিত্র হতে দেখা যাচ্ছে কত রকমভাবে তরঙ্গকে বিস্তার করা সম্ভব।
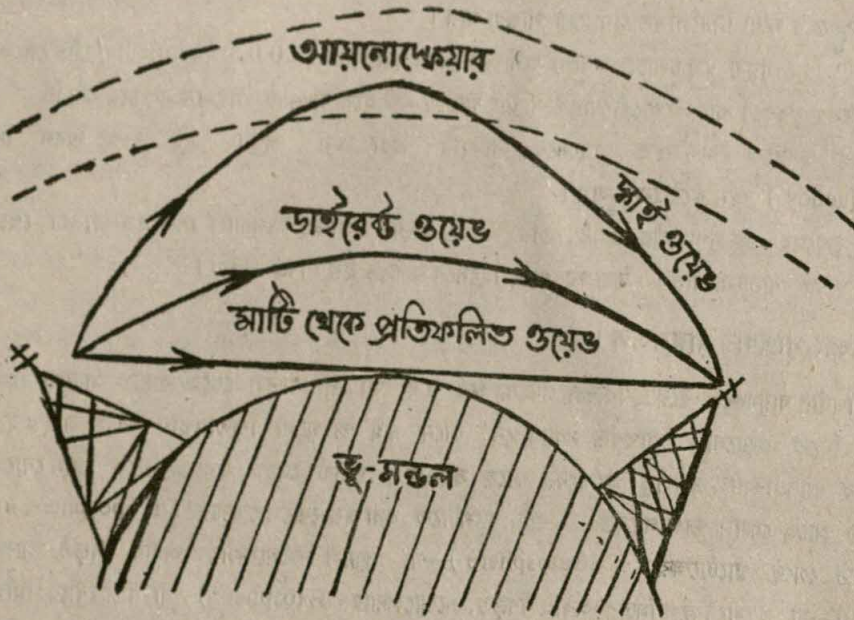
চিত্র ৫.২

টেলিভিশন ট্রান্সমিশনের বা প্রচারের জন্য ব্যবহার করা হয় 62.25 MHz ও 67.75 MHz (ব্যাণ্ড **I**, চ্যানেল 4) ফ্রিকোয়েন্সির তরঙ্গ। আয়নোস্ফেয়ার ভেদ করে এই ফ্রিকোয়েন্সি চলে যায় অসীম মহাশূন্যে। তাই স্কাই ওয়েভ হিসেবে এই ফ্রিকোয়েন্সি পাওয়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে ট্রান্সমিটার এ্যান্টেনা এবং রিসিভার এ্যান্টেনার দ্বারা অনুভূমিক বা পৃথিবীর সাথে সমান্তরাল অভিমুখী তরঙ্গ (Horizontal Polarised Wave)-র মাধ্যমে ফ্রিকোয়েন্সি ট্রান্সমিশন করা হয়। একে বলে সরাসরি তরঙ্গ বিস্তার (Direct Wave Propagation)। যার ফলে, একশো কিলোমিটারের মধ্যেই সাধারণতঃ টেলিভিশন সম্প্রসারণ সীমাবদ্ধ থাকে। সেইজন্যই, বিভিন্ন রিলে সেন্টারের মাধ্যমে টেলিভিশন ট্রান্সমিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কলকাতা থেকে শিলিগুড়ীতে অনুষ্ঠান সম্প্রসারনের জন্য তাই মাঝখানে মাঝখানে বসাতে হয়েছে অনেকগুলো রিলে সেন্টার।

টেলিভিশন ব্রডকাষ্ট-এর জন্য বিভিন্ন চ্যানেল ও তাদের ফ্রিকোয়েন্সি মাত্রা

ব্যাণ্ড I	নীচু VHF* মাত্রা	41 থেকে 68 MHz
ব্যাণ্ড II	VHF* মাত্রা	88 থেকে 108 MHz
ব্যাণ্ড III	উচু VHF* মাত্রা	174 থেকে 230 MHz
ব্যাণ্ড IV	UHF* মাত্রা	470 থেকে 582 MHz
ব্যাণ্ড V	UHF* মাত্রা	606 থেকে 890 MHz

[ব্যাণ্ড II ব্যবহৃত হয় FM (Frequency Module) ব্রডকাস্টের জন্য]

ব্যাণ্ড I এবং III-তে ব্যবহৃত বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের বণ্টন

ব্যাণ্ড	চ্যানেল নম্বর	ফ্রিকোয়েন্সি মাত্রা	ছবি বহনকারী ফ্রিকোয়েন্সি (MHz)	শব্দ বহনকারী ফ্রিকোয়েন্সি (MHz)
I	1.	41—47	(টেলিভিশনে ব্যবহৃত হয় না)	
(41 থেকে 68 MHz)	2.	47—54	48·25	53·75
	3.	54—61	55·25	60·75
	4.	61—68	62·25	67·75
III	5.	174—181	175·25	180·75
(174—230 MHz)	6.	181—188	182·25	187·75
	7.	188—195	189·25	194·75
	8.	195—202	196·25	201·75
	9.	202—209	203·25	208·75
	10.	209—216	210·25	215·75
	11.	216—223	227·25	222·75
	12.	223—230	224·25	229 75

* VHF এবং UHF নিয়ে 'এ্যান্টেনা বিভাগে' আলোচনা করা হয়েছে।

৬

কিছু নতুনতর পার্টস

টিভি দুনিয়ায় প্রত্যেকটা দিনই, নতুনতর কিছু আবিষ্কৃত হচ্ছে। বদলে যাচ্ছে ইলেকট্রনিক্সের সনাতন ধ্যান ধারণা। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স কম্পানীগুলোকে টিকে থাকতে হলে এরকম সুস্থ প্রতিযোগিতার প্রয়োজন আছে। ক্রেতাদের আরো সুবিধা দেওয়ার চেষ্টায় লাভবান হচ্ছে ক্রেতা এবং সাথে সাথে ইলেকট্রনিক্সে উৎসাহী মানুষদেরও নতুন নতুন টেকনোলজি'র সাথে পরিচয় ঘটছে। এবার আমরা এরকমই কিছু পার্টস নিয়ে আলোচনা করবো, যা বিদেশের টিভিতে বহুল ব্যবহৃত হয় এবং আমাদের দেশেও খুব শীঘ্রই ব্যবহৃত হবে অথবা সম্প্রতি টিভিতে ব্যবহৃত হওয়া শুরু হয়ে গেছে।

সিলিকন নিয়ন্ত্রিত সুইচ্ (Silicon Controlled Switch)

সিলিকন নিয়ন্ত্রিত রেকটিফায়ার (SCR) এর পরিবর্তে, বর্তমানে এই সিলিকন নিয়ন্ত্রিত সুইচ্ (SCS) এর ব্যবহার ইলেকট্রনিক্স শিল্পে আস্তে আস্তে প্রসারিত হচ্ছে। যদিও ভারতের কোনো টিভিতে এখনো এর ব্যবহার হয়নি কিন্তু অদুর ভবিষ্যতেই এর ব্যবহারের কথা চিন্তা করে, এস সি এস সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হলো।
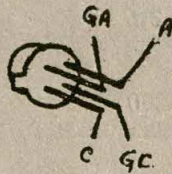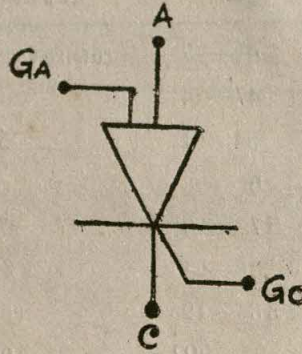
C = ক্যাথোড A = এ্যানোড
GA = এ্যানোড গেট Gc = ক্যাথোড গেট

চিত্র ৬'১ ওপরে এস সি এসের সাংকেতিক চিহ্ন, নীচে বাস্তবে এস সি এসের লেগগুলোর অবস্থান

এস সি এস আসলে এস সি আর এরই কিছুটা পরিবর্তিত রূপ। আমরা জানি, এস সি আর এর তিনটে লেগ—অ্যানোড, ক্যাথোড, এবং গেট। এস সি এসের কিন্তু চারটে লেগ—অ্যানোড, ক্যাথোড এবং দু'টো গেট। অ্যানোড গেট এবং ক্যাথোড গেট।

এস সি এসের অ্যানোড এবং ক্যাথোড গেটের কোনো একটাতেও যদি কোনো তড়িৎ ঝল্‌ক বা পালস্ না যায় তাহলে কোনো গেটই খুলবে না এবং গেট না খুললে এর ব্যবহার একটা তড়িৎবিহীন অপরিবাহী তারের মতো, যার মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু, একটা পজেটিভ্ তড়িৎ পালস্ যদি ক্যাথোড গেটে কিংবা নেগেটিভ তড়িৎ পালস্ যদি অ্যানোড গেটে দেওয়া যায় তাহলেই গেট খুলে যায়। মনে রাখতে হবে যে, এই পালসের যে কোনো একটা যদি নির্দিষ্ট গেটে পৌঁছোয় তাহলেই গেট খুলে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎ অ্যানোড থেকে ক্যাথোডে প্রবাহিত হবে।

আবার, গেট বন্ধ করার ক্ষেত্রে, এস সি আর এর গেট একবার খুলে গেলে, তা'কে বন্ধ করার জন্য তড়িৎ প্রবাহমাত্রাকে প্রায় শূন্যে নামিয়ে আনতে হয়। কিন্তু এস সি এসের গেটকে সহজেই বন্ধ করে দেওয়া যায়। যে রকম ভাবে অল্প পরিমাণ পজেটিভ তড়িৎ পালস্ ক্যাথোড গেটে অথবা নেগেটিভ তড়িৎ পালস্ অ্যানোড গেটে পাঠিয়ে দিলেই গেট খুলে যায়, ঠিক সেই রকমভাবে বেশী পরিমাণ পজেটিভ পালস্ ক্যাথোড গেটে বা বেশী পরিমাণ নেগেটিভ পালস্ অ্যানোড গেটে দিলেই গেট বন্ধ হয়ে যায় এবং তড়িৎ প্রবাহিত হতে পারে না। গেট বন্ধ করার এই সুবিধা এবং বেশী নিরাপত্তার কারণে এস সি এস এখন সমাদৃত হচ্ছে।

জিরো ওহ্‌ম জাম্পার রেজিষ্টর (Zero Ohm Jumper Resistor)

রেজিস্টর মাত্রই কিছু বাধা থাকবে এটা তো আমার আগেই জানতাম, কিন্তু বাধাহীন রেজিস্টর! জিরো ওহম এই রেজিস্টরকে ব্যবহার করা হয় জাম্পার তারের বদলে। পিসিবিতে, কোনো একটা পার্টস থেকে হয়তো পরবর্তী সার্কিটের পিসিবিতে একটা কানেকশন গেছে। এক্ষেত্রে একটা তার দিয়ে সেই যুক্তকরণ বা কানেকশন করা হয়। কিন্তু তারটি কী সত্যিই বাধাহীন? প্রত্যেক তারেরই একটা বাধা আছে এবং তা' তারের জন্য ব্যবহৃত ধাতু ও তারের ব্যাসের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু জিরো ওহ্‌ম রেজিস্টরের ক্ষেত্রে, এই বাধার মান খুবই কম এবং নির্দিষ্ট। বিশেষ ডিজাইনে তৈরী এই জিরো ওহম রেজিস্টরকে তাই সহজেই 'জাম্পার ওয়ার'-এর পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য আমাদের দেশে এর ব্যবহার এখনো চোখে পড়েনি। বিদেশের টেলিভিশনে সম্প্রতি এই জিরো ওহ্‌ম রেজিস্টরের ব্যবহার শুরু হয়েছে।

মেটাল অক্সাইড ফিল্ম রেজিষ্টর (Metal oxide film Resistor)

সার্কিটে, যেখানে স্থায়ীত্ব (Stability) এবং ধারাবাহিকতার (Uniformity) প্রয়োজন আছে, সেখানে এই মেটাল অক্সাইড রেজিস্টর লাগিয়ে খুব ভালো ফল পাওয়া যায়। কার্বন রেজিস্টর এবং মেটাল ফিল্ম রেজিস্টরের চেয়ে অনেক কম খরচে তৈরী এই রেজিস্টর, এদের বিকল্প হিসেবে ধীরে ধীরে জায়গা করে নিচ্ছে। এমন কি অল্প শক্তির ওয়ার উণ্ড রেজিস্টরের জায়গায়ও একে লাগানো যেতে পারে, যার ফলে বাঁচবে পয়সা এবং সময়। প্রচণ্ড গরম হয়ে লাল হয়ে গিয়ে হঠাৎ আগুন লাগার যে সম্ভাবনা ওয়ার উণ্ড রেজিস্টরে থাকে, সেটা থেকে মেটাল

অক্সাইড ফিল্ম রেজিস্টর যুক্ত। এই রেজিস্টর খুবই সহনশীল—সহজে যান্ত্রিক এবং বৈদ্যুতিক আঘাতে ভেঙে পড়ে না। উচ্চ শক্তি সম্পন্ন হলেও অপেক্ষাকৃতভাবে সাইজে ছোট যার ফলে ব্যবহার করা যায় সহজেই।
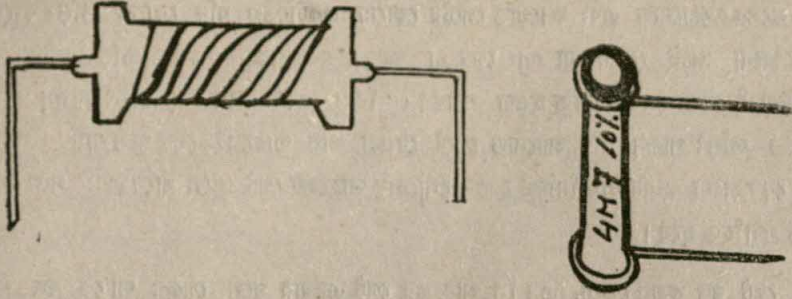
চিত্র ৬.২ মেটাল অক্সাইড ফিল্ম রেজিস্টর

লাইট এমিটিং ডায়োড (Light emitting diode বা LED)

লাইট এমিটিং ডায়োড (LED)—এই নামের মধ্যে দিয়েই বোঝা যাচ্ছে এই ডায়োড এর কাজ হলো, এর মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হলে, এটা আলোকিত হয় বা সহজ বাংলায় জ্বলে ওঠে। আমরা প্রায়শঃ দেখি টেপরেকর্ডার, অ্যাম্প্লিফায়ার বা রেডিওতে কিছু ছোট ছোট লাল-সবুজ-হলুদ আলো, শব্দ বাড়া-কমার সাথে সাথে নাচছে। ওগুলো আসলে এলইডি। ঠিক সেভাবেই ক্যালকুলেটর বা ইলেকট্রনিক মাল্টিমিটারের 'ডিসপ্লে' অংশে যে সংখ্যাগুলো জ্বলজ্বল করে ওঠে—ওগুলো আসলে এলইডি'র সমষ্টি।

এবার এলইডি বোঝার আগে, আমরা বরং একবার ফিরে যাই এই বইয়ের 'সেমিকনডাকটার ডায়োড' অংশে। সেখানে আমরা রিভার্স বায়াস ও ফরওয়ার্ড বায়াস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। মনে আছে নিশ্চয়ই যে, ফরওয়ার্ড বায়াস এর ক্ষেত্রে অর্থাৎ যখন ডায়োডের অ্যানোডে ব্যাটারীর পজেটিভ অংশ এবং ক্যাথোডে ব্যাটারীর নেগেটিভ অংশ লাগানো হয় তখন তড়িৎপ্রবাহ সহজেই ডায়োডের মধ্যে দিয়ে চলে যেতে পারে কিন্তু রিভার্স বায়াস এর ক্ষেত্রে অর্থাৎ যখন অ্যানোডে ব্যাটারীর নেগেটিভ অংশ এবং ক্যাথোডে ব্যাটারীর পজেটিভ অংশ লাগানো হয় তখন প্রায় কোনো তড়িৎপ্রবাহই ডায়োডের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় না।

এলইডি হলো ফরওয়ার্ড বায়াসড্ ডায়োড অর্থাৎ একে ফরওয়ার্ড বায়াস অবস্থাতে রাখলেই এ কাজ করতে সক্ষম হয়।

সিলিকন বা জারমেনিয়াম এর মতো সেমিকনডাকটার পদার্থ দিয়ে তৈরী সাধারণ সেমিকনডাকটার ডায়োডের ফরওয়ার্ড বায়াস অবস্থায় ইলেকট্রন এবং হোল একসাথে থাকে এবং এর জন্য কিছুটা শক্তি বা এনার্জিকে তারা মুক্ত করে দেয়। বার বার ইলেকট্রন এবং হোলের যুক্তকরণের ফলে সৃষ্ট এই শক্তি, তাপশক্তি রূপে মুক্ত হয় তাই সার্কিট চলাকালীন সাধারণ সেমিকনডাকটার ডায়োড গরম হয়ে যায়।

এল ইডি'ও একটা পি-এন জাংশন ডায়োড কিন্তু এটা তৈরী হয় গ্যালিয়াম আরসেনাইড বা গ্যালিয়াম আরসেনাইড ফসফাইড বা গ্যালিয়াম ফসফাইড দিয়ে। যখন এই পি-এন জাংশনকে অর্থাৎ এলইডিকে ফরওয়ার্ড বায়াস

অবস্থায় লাগানো হয় তখন এই ডায়োড মুক্ত এনার্জি হিসেবে আলোক শক্তিকে মুক্ত করে। যার ফলে ডায়োডটা জ্বলে ওঠে। আসলে আমরা যেটা জ্বলতে দেখি সেটা আর কিছুই নয় একটা শক্তির মুক্তি মাত্র।
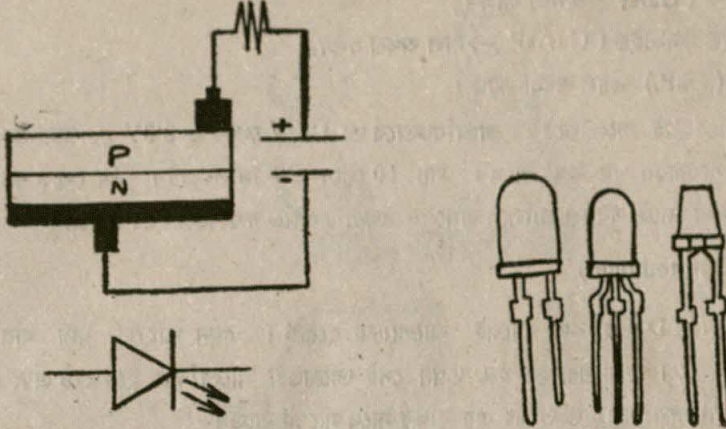
চিত্র ৬.৩

৬.৩ নং ছবিতে এলইডির গঠন পদ্ধতি ও সাংকেতিক চিহ্ন দেখানো হয়েছে।

এই এলইডি বাজারে বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায়। অনেক সময় আমরা টিভিতে বিভিন্ন চ্যানেল নাম্বার জ্বলতে দেখি। বিশেষ করে কালার টিভিতে এই 'নাম্বার ডিস্‌প্লে' দেখা যায়। এগুলো আসলে সাতটা এলইডির সমষ্টি। নিচের ছবি দু'টো দেখলে ব্যাপারটা অনেকটা পরিস্কার হবে।
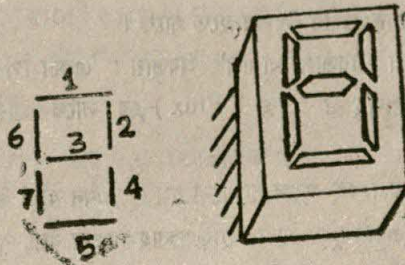
চিত্র ৬.৪

এই এলইডিগুলো প্রত্যেকটিই লাগানো থাকে ফরওয়ার্ড বায়াস অবস্থায়, এখন যদি আমরা সংখ্যা 3-কে পেতে চাই তাহলে ডায়োড নম্বর 1, 2, 3, 4, ও 5, কে জ্বালাতে হবে। ঠিক সেইভাবে যদি '2' পেতে চাই তাহলে জ্বালাতে হবে ডায়োড 1, 2, 3, 7 ও 5 কে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এগুলো প্রত্যেকেই আছে ফরওয়ার্ড বায়াস অবস্থায়।

এবার দেখা যাক, বিভিন্ন রঙের এলইডি আমরা কী করে পাই। এটা কিন্তু নির্ভর করে আমরা কী ধরনের সেমিকনডাকটার পদার্থ ব্যবহার করছি তার ওপর। নিচে একটা ছোট্ট তালিকা দিয়ে দেওয়া হলো, যা এই রঙের ব্যবহার বুঝতে সাহায্য করবে।

গ্যালিয়াম আরসেনাইড (GaAs)→ইনফ্রা লাল।

গ্যালিয়াম আরসেনাইড ফসফাইড (GaAsP)→লাল অথবা হলুদ।

গ্যালিয়াম ফসফাইড (GaP)→লাল অথবা সবুজ।

এলইডি খুব কম ভোল্টেজেই জ্বলে ওঠে। স্বাভাবিকভাবে তা 1·7 V থেকে ও 3·3V ভোল্টের মধ্যে এবং এটা জ্বলতে তড়িৎ ক্ষমতা বা পাওয়ারও খুব কম লাগে। মাত্র 10 থেকে 20 মিলিওয়াট। সব থেকে বড় কথা একটা এলইডি চলে দীর্ঘ দিন। দেখা গেছে, সর্বক্ষণ জ্বালিয়ে রাখলেও একটা এলইডি দশ বছরের বেশী চলে।

ফোটোডায়োড (Photodiode)

লাইট এমিটিং ডায়োড (LED) এর কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। এখন তাহলে বলা যায় যে, যখন তড়িৎপ্রবাহ একটা এলইডির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন সেই ডায়োডটা আলোকিত হয়ে ওঠে এবং এই আলোর উজ্জলতা সেই ডায়োডের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ এর বৃদ্ধির সাথে সাথেই বাড়ে।

এখন আমরা আলোচনা করবো এমন একটা ডায়োডের কথা, যা চারিত্রিক ভাবে এল ই ডি'র ঠিক বিপরীতভাবে পরিচালিত হয়। তার নাম ফোটোডায়োড। হয়তো কথাটা একটু জটিল শোনাচ্ছে কিন্তু বাস্তবে এটা ঠিক যে, এল ই ডি'র বিপরীত কাজটাই করে থাকে ফোটোডায়োড। এল ই ডিতে তড়িৎপ্রবাহের সাথে সাথে জ্বলে ওঠে আলো কিন্তু ফোটোডায়োডের ক্ষেত্রে, আলোর প্রয়োগ করে পাওয়া যায় তড়িৎপ্রবাহ। তাহলে আক্ষরিক অর্থেই এলইডির বিপরীতমুখী হলো এই ফোটোডায়োড।

যখন ফোটোডায়োডে কোনো আলোক উৎস থাকে না, তখন সেখানে কোনো তড়িৎপ্রবাহ প্রায় থাকেই না কিন্তু যখন ফোটোডায়োডের উপর আলো পড়ে, সাথে সাথেই সে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন করে এবং এই আলোক উৎস যত বাড়তে থাকে ততই এই ফোটোডায়োড দিয়ে বেশি তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হতে থাকে।

ফোটোডায়োডকে সার্কিটে লাগানো হয় 'রিভার্স বায়াস' অবস্থায়। একটা পি-এন জাংশনকে রিভার্স বায়াস অবস্থায় লাগালে তড়িৎপ্রবাহ, আলোর প্রবাহ বা ফ্লাক্স (Flux)-এর সাথে প্রায় রৈখিকভাবে (Linearly) পরিবর্তিত হয়।

ফোটোডায়োডের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটাকেই কাজে লাগানো হয়। এখন যদি এই রিভার্স বায়াস ভোল্টেজকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলেও প্রায় একটা ধ্রুবক মাত্রার তড়িৎপ্রবাহ পাওয়া যায়, পরিমানে যা মিলি অ্যামপিয়ারেরও ভগ্নাংশ মাত্র। এই ধ্রুবক মাত্রার তড়িৎপ্রবাহকে বলে 'ডার্ক কারেন্ট' (Dark current) বা 'অন্ধকার তড়িৎপ্রবাহ'। তখন এই রিভার্স বায়াস ডায়োডের ব্যবহার অনেকটা 'ওপেন সার্কিট' এর মতো হয়। তৈরী হয় একটা 'নিরপেক্ষ ক্ষেত্র' (Depletion layer)। কিন্তু যখন ঐ ডায়োডের গায়ে একটা বিশেষ দিকে আলো পড়ে, তখন এই সেমিকনডাকটার পদার্থের মধ্যেকার ইলেকট্রন ও হোলগুলো প্রচুর তড়িৎ উৎপন্ন করে, যাকে বলা হয় 'লাইট কারেন্ট' (Light current) বা 'আলোক তড়িৎপ্রবাহ'। এই লাইট কারেন্ট কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে ডায়োডের উপর আপতিত আলোর বিচ্ছুরণের ওপর।

একটু আগেই বলা হয়েছে যে, একটা বিশেষ দিকে আলো পড়লেই এই ডায়োড কাজ করে। এই ধারনাটা পরিষ্কার করে নেবার জন্য নিচে ছবি দেওয়া হলো। [চিত্র ৬.৫]
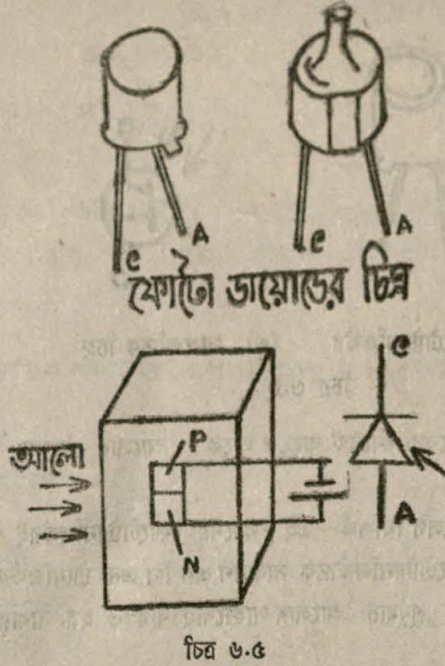
চিত্র ৬.৫

আলোর উৎসকে এই পি-এন জাংশনের উপর সরাসরি একটা দিকে ফেলা হয়। এই দিকটা কাঁচ বা স্বচ্ছ প্লাষ্টিকের জানলার মতো থাকে, যা আলোকে ঢোকার অনুমতি দেয়। অন্যদিকগুলো কালো রং বা ধাতব পাত দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়, যার ফলে সেখান দিয়ে আলো কিছুতেই ঢুকতে বা বে'র হয়ে যেতে পারে না। এর ফলে সামনে থাকা পি-এন জাংশনের উপর আলো সরাসরি পড়ে। আলোক উৎস পি-এন জাংশনে পড়লেই কিছু অতিরিক্ত ইলেকট্রন ও হোল তৈরী হয়ে যায়, যা' দিয়ে তড়িৎপ্রবাহিত হয়।

ফোটোডায়োডের সাংকেতিক চিহ্ন = চিত্র ৬.৫-এ দেওয়া আছে।

ফোটোট্র্যানজিষ্টর (Phototransistor)

পি এন পি এবং এন পি এন ট্র্যানজিস্টরের মতো সেমিকনডাকটারের নাম আমরা আগেই শুনেছি। সাধারণ ট্র্যানজিষ্টরের বেস, এমিটার, কালেকটর নামে তিনটে লেগ বা কানেকশন থাকে এটাও আমরা জানি। কিন্তু এবার আমরা শুনছি একটা নতুনতর নাম—ফোটোট্রানজিষ্টর।

এখানে ফোটোট্র্যানজিষ্টরের ছবি দেওয়া হলো। এই ট্র্যানজিষ্টরকে কাজে লাগাবার জন্য এর বেস এ কিছুটা আলোর প্রয়োজন। এই ট্র্যানজিষ্টরের কালেকটর-বেস জাংশনটা আসলে আলোক সংবেদনশীল (Light sensetive) তাই

এর কালেকটর-বেস জাংশনে সরাসরি আলো ঢোকার ব্যবস্থা রাখা থাকে। তবে এই আলোকে 10° ডিগ্রীর কম কৌণিক বিন্দু দিয়ে ঢুকতে হবে। যে আলোকরশ্মি 10° ডিগ্রী কোণের চেয়ে বেশী হয়ে আপতিত হবে, তা' এর মধ্যে ঢুকবে না। যখন কালেকটর-বেস জাংশনে কোনো আলো প্রবেশ করে না, তখন বেস কারেন্ট প্রায় শূন্যই থাকে এবং যখনই কালেকটর-
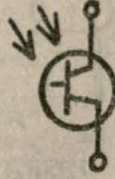
(ক) ফোটোট্রানজিস্টর (খ) সাংকেতিক চিহ্ন

চিত্র ৬.৬

বেস জাংশনে আলো পৌঁছোয় তখনই বেস কারেন্ট বাড়তে থাকে। আলোর তীব্রতার সাথে সাথেই এই বেস কারেন্ট বাড়ে।

তিনটে লেগ বিশিষ্ট এবং দুটো লেগ বিশিষ্ট—এই দু'ধরণের ফোটোট্রানজিস্টরই পাওয়া যায়। তিনটে লেগ বিশিষ্ট (কালেকটর, বেস, এমিটার) ফোটোট্রানজিস্টরকে সাধারণ এন পি এন ট্রানজিস্টর হিসেবেও ব্যবহার করা যায় কিন্তু দুই লেগ বিশিষ্ট ফোটোট্রানজিস্টর শুধুমাত্র আলোর সাহায্যেই ব্যবহৃত হয়, সাধারণ কারেন্ট দিয়ে তা' ব্যবহার করা যায় না।
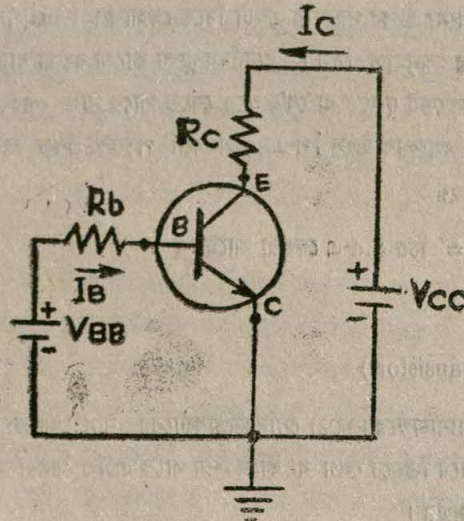
চিত্র ৬.৭

এবার একটু থিয়োরীর দিকে যাওয়া যাক। ৬.৭ নং চিত্রে একটা সার্কিটের সাহায্যে এন পি এন ট্রানজিস্টরের কার্যপ্রণালী দেখানো হয়েছে। যদি I_b, I_c এবং I_e যথাক্রমে ট্রানজিস্টরের বেস, কালেকটর এবং এমিটারের মধ্যে প্রবাহিত তড়িৎমাত্রা হয় এবং β যদি ট্রানজিস্টরের 'গেইন' (Gain) এর আনুপাতিক মাত্রা হয় তাহলে এই নিচের দু'টো সূত্র ট্রানজিস্টরের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। সে দু'টো হলো

$I_c = \beta I_b$ — (সূত্র 1)

$I_e \simeq I_c$ — (সূত্র 2)

এখন β এর মান 50 থেকে 300-র মধ্যে হয়। তাহলে বলা যায় কালেকটর কারেন্ট এক মাত্রা বাড়লে, বেস কারেন্ট 50 থেকে 300 গুণ মাত্রায় বৃদ্ধি পাবে (সূত্র 1 অনুযায়ী) এবং এমিটার কারেন্ট ও কালেকটর কারেন্ট প্রায় সমান (সূত্র 2)।

সূত্র 1 এর জন্যই ট্রানজিস্টরকে আমরা অ্যাম্প্লিফায়ার হিসেবে ব্যবহার করে থাকি।
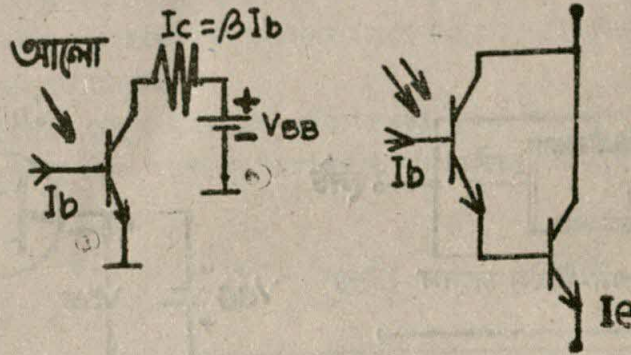
(ক) ফোটোট্রানজিস্টর ব্যবহৃত সার্কিট (খ) ফোটো ডারলিংটন

চিত্র ৬.৮

৬.৭ নং চিত্রে, দেখা যাচ্ছে বেস কারেন্ট আমরা তৈরী করছি V_{BB} ব্যাটারীর সাহায্যে। এবার চিত্র ৬.৮ নং এ একটা ফোটোট্রানজিস্টর লাগানো আছে। এক্ষেত্রে ব্যাটারী না থাকলেও, ফোটোট্রানজিস্টরের কালেকটর-বেস জাংশনে আলো বা তাপের সাহায্যে আমরা খুব অল্পপরিমাণ বেস কারেন্ট তৈরী করতে পারি এবং যেহেতু কালেকটরে আমরা বেস কারেন্টের অনেক বেশীগুণ কারেন্ট পাবো, তাই ইনপুটের এই অল্প কারেন্টই আউটপুট হিসেবে অনেক বেশী মাত্রায় পাওয়া যায়।

দু'টো ফোটোট্রানজিস্টরকে সিরিজে লাগিয়ে আরো অনেক বেশী কারেন্ট অ্যাম্প্লিফাই করা যায়। একে বলে 'ফোটো ডারলিংটন'। চিত্র ৬.৮ নং এ এই কানেকশন দেখানো হলো। প্রথমটার এমিটারকে দ্বিতীয়টার বেস এ লাগিয়ে অনেক বেশী আউটপুট কারেন্ট পাওয়া যায়। এই 'ফোটা ডারলিংটন' এ, $I_e = \beta^2 I_b$ সূত্র পাওয়া যায়। সাধারণতঃ

β^2 এর মান এক্ষেত্রে প্রায় 10,000 গুণ হয়ে যায়। অতএব আলো বা তাপের দ্বারা সৃষ্ট খুব অল্প তড়িৎও আমরা সহজেই একটা বিশাল মাত্রায় বৃদ্ধি করে নিতে পারি।

ফিল্ড-এফেক্ট ট্রানজিষ্টর (Field-effect Transistor)

ফিল্ড-এফেক্ট ট্রানজিষ্টর হলো এমনই এক সেমিকনডাকটার ডিভাইস, যার কার্যকারণ সম্পূর্ণ নির্ভর করে কোনো বৈদ্যুতিক ফিল্ড দ্বারা তড়িৎপ্রবাহের নিয়ন্ত্রণের উপর। দু'ধরণের ফিল্ড এফেক্ট ট্রানজিষ্টর আছে। জাংশন ফিল্ড-এফেক্ট ট্রানজিষ্টর (Junction field effect Transistor) বা সংক্ষেপে 'ফেট' (FET) এবং ইনসুলেটেড-গেট ফিল্ড এফেক্ট ট্রানজিষ্টর (Insulated-gate field effect Transistor) যাকে আরো সহজভাবে বলা হয় মেটাল অক্সাইড সেমিকনডাকটার ট্রানজিষ্টর (Metal oxide Semiconductor Transistor) বা সংক্ষেপে মসফেট (MOSFET)

জাংশন ফিল্ড এফেক্ট ট্রানজিষ্টর (Junction field effect Transistor)
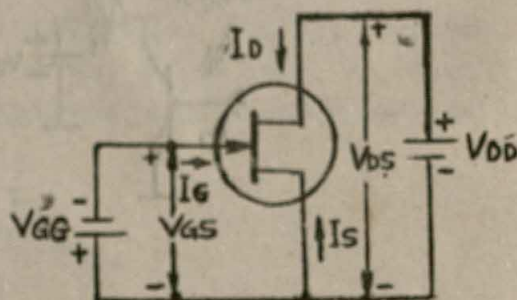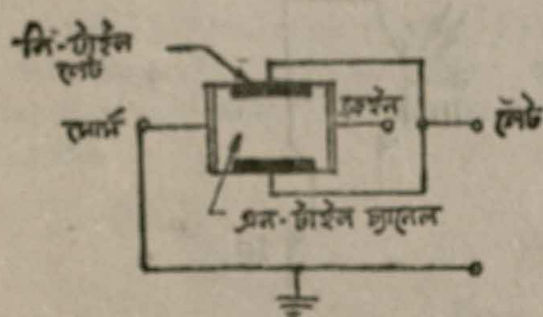
(ক) ফেট-এর গঠনতন্ত্র (খ) ফেট-এর কার্যকরী সার্কিট

চিত্র ৬.১

উপরের ৬.১ (ক) নং ছবিতে একটা এন-চ্যানেল জাংশন ফিল্ড এফেক্ট ট্রানজিষ্টর দেখানো হয়েছে। এখানে তিনটে অংশকে আলাদা করে দেখানো হয়েছে। সোর্স (Source), ড্রেইন (Drain) এবং গেট (Gate)। 'ফেট' এর ক্ষেত্রে সোর্স এবং ড্রেইন হলো চ্যানেলের দুই ধারের দু'টো কানেকশন বিন্দু। একটু সহজ করে বললে সোর্স হলো সেই টারমিনাল যেখান দিয়ে প্রধান ক্যারিয়ার বা ইলেকট্রন বাহিত হয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয় এবং ড্রেইন হলো সেই টারমিনাল যেখান দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ বে'র হয়ে যায়। সোর্সকে আমরা সাধারণ সেমিকনডাকটার ট্রানজিষ্টরের এমিটার এবং ড্রেইনকে কালেকটর হিসাবে ধরতে পারি। এখন এই এন-টাইপ চ্যানেলের দু'পাশেই থাকে প্রচণ্ডভাবে 'ডোপিং' করা পি-টাইপ

অংশ, যা দিয়ে পি-এন জাংশন তৈরী করা হয়। এই ইলেকট্রোড অংশ চ্যানেলের পরিবাহিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে, সোর্স থেকে ড্রেইন এর মধ্যে তড়িৎপ্রবাহের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটায়। এই অংশটিই হলো গেট। ইনপুট সিগন্যাল ভোল্টেজ সাধারণভাবে এই 'গেট' এ দেওয়া হয়। একে সাধারণ ট্রানজিস্টরের বেস এর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এই 'গেট' ভোল্টেজই চ্যানেলের বৈদ্যুতিক ফিল্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে ঠিক যেমন সাধারণ ট্রানজিস্টরে 'বেস কারেন্ট' কালেক্টরের কারেন্টকে নিয়ন্ত্রণ করে।

এখানে বারবার চ্যানেল কথাটা ব্যবহৃত হয়েছে, এই চ্যানেল হলো সেই অংশ, যেখান দিয়ে ইলেকট্রন, সোর্স থেকে ড্রেইন এর দিকে যায়। চিত্র ৬.১ (ক) এ সেই অংশটা পরিষ্কার করে দেখানো আছে।

'গেট' এর কার্যপ্রণালী

আমরা আগেই জেনেছি, একটা পি-এন জাংশনকে রিভার্স বায়াসে রাখলে, সেই পি-এন জাংশনে একটা নিরপেক্ষ ক্ষেত্র তৈরী হয় এবং তড়িৎবহনকারী কণাগুলো জাংশনের আড়াআড়ি দিকে ছড়িয়ে পড়ে। শুধুমাত্র কিছু এন-অংশের পজেটিভ আয়ন এবং পি-অংশের নেগেটিভ আয়ন মুক্ত অবস্থায় থেকে যায়। এখন পজেটিভ আয়নগুলো থেকে উৎপন্ন তড়িৎ এর 'ফিল্ড ইনটেন্সিটি' (Field intensity) নেগেটিভ আয়নে গিয়ে শেষ হয়। যার ফলে কমতে থাকে পি-এন জাংশনের ভোল্টেজ এবং এই রিভার্স বায়াস অবস্থার ফলে, ক্রমশঃ বাড়তে থাকে নিরপেক্ষ ক্ষেত্র—যা সম্ভব হয় এই মুক্ত আয়নগুলোর স্থিরতার জন্য। আর শেষ অবধি তড়িৎবহন করার জন্য কোনো কণাই পাওয়া যায় না, যার ফলে পি-এন জাংশনে তড়িৎপ্রবাহ প্রায় শূন্য হয়ে যায়।

এখন চিত্র ৬.৯ (ক) দেখলে, দেখা যাবে, চ্যানেলের কার্যকরী প্রশস্থতা তখনই কমতে থাকবে যখন রিভার্স বায়াসকে বাড়ানো হবে কারণ এর ফলেই পি-এন জাংশন-এর নিরপেক্ষ ক্ষেত্র বাড়তে বাড়তে চ্যানেলের ঐ অংশটাকে ছোট করে দেবে।

চিত্র ৬.১০

এভাবেই ড্রেইন থেকে সোর্স ভোল্টেজ একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় পেতে হলে ড্রেইন তড়িৎপ্রবাহ (V_{DD}) কে রিভার্স বায়াস এ গেট জাংশনের আড়াআড়ি ভাবে রাখতে হবে। [চিত্র ৬.৯ (খ)]

'ফিল্ড এফেক্ট' শব্দটা এই কারণেই ব্যবহার করা হয়েছে কারণ তড়িৎ নিয়ন্ত্রনের মূল ব্যাপারটাই হলো 'এফেক্ট', যা সম্ভব হয় 'ফিল্ড' এর রিভার্স বায়াস বাড়িয়ে অর্থাৎ নিরপেক্ষ ক্ষেত্র বাড়িয়ে।

ফেট ট্রানজিস্টরকে সাধারণ জাংশন ট্রানজিস্টরের মতোই এ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ফরওয়ার্ড বায়াস এর সাহায্যে, কম ইনপুট রেজিস্টেন্স এবং রিভার্স কালেকটর ভোল্টেজের অপচয় বন্ধ করার জন্য এর ব্যবহার হয়। ফেট এর ক্ষেত্রে খুব বেশী ইনপুট রেজিস্টেন্স পাওয়া যায় এবং 'ফেট' ইনপুট সিগন্যালকে অনেক কম ভোল্ট হিসেবে বহন করে।

চিত্র ৬.৯ (ক) ও (খ) এ যে এন-চ্যানেল জাংশন ফেট এর ছবি দেওয়া হয়েছে তা' বাস্তবোচিত করতে গেলে কিছু গঠন তান্ত্রিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। চিত্র ৬.১০ এ একটা ফেট এর বাস্তব গঠনতন্ত্রের ছবি দেওয়া হলো। সাবস্ট্রেট (Substrate) বা বাল্ক (Bulk) হলো একটা পি-টাইপ পদার্থ যা নিরপেক্ষ বা একটু ডোপড্। যার ওপর গড়ে উঠেছে একটা এন-টাইপ চ্যানেল। একটা পি-টাইপ গেটকে তারপর ঐ এন-টাইপ চ্যানেলের ওপর পরিব্যাপ্ত করা হয়েছে। এখন সাবস্ট্রেট বা বাল্ক—যা একটা গেটের মতোই কাজ করে এবং গেট—দু'টোই অপেক্ষাকৃত অল্প-রোধক পদার্থ বা লো রেজিস্টিভিটি (Low resistivity) হওয়ার জন্য, যখন তড়িৎপ্রবাহকে চ্যানেলের একপ্রান্তে সোর্স এ দেওয়া হয়, চ্যানেলের ভেতর দিয়ে তা প্রবাহিত হয়ে ড্রেইন-এ যাওয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে গেট। চ্যানেল পি-টাইপ বা এন টাইপ—যাই হোক না কেন, তড়িৎপ্রবাহ কিন্তু শুধুমাত্র সোর্স থেকে ড্রেইন-এই প্রবাহিত হতে পারে।

'ফেট' এর সাংকেতিক চিহ্ন— চিত্র ৬.১২-তে দেওয়া আছে।

মেটাল অক্সাইড ফিল্ড এফেক্ট ট্র্যানজিস্টর (Metal Oxide field effect Transistor or MOSFET)

'জাংশন ফেট' এর আলোচনার পর 'ইনস্যুলেটেড গেট ফেট' বা 'মেটাল অক্সাইড ফেট' এর আলোচনাটাও সেরে ফেলা যাক। মেটাল অক্সাইড ফেটকে সংক্ষেপে বলা হয় 'মস্ফেট' (MOSFET)। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে জাংশন ফেট এর চেয়ে মসফেটের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী।
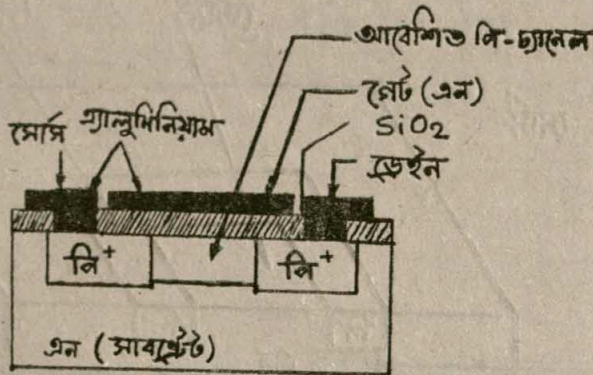
চিত্র ৬.১১ মসফেট-এর গঠনতন্ত্র

চিত্র ৬.১১ তে একটা মসফেট এর গঠনতন্ত্র দেখানো হয়েছে, এটা একটা পি-চ্যানেল মসফেটের ছবি। অল্প ডোপ্‌ড এন-টাইপ সাবস্ট্রেট এর ওপর দু'টো বেশী ডোপ্‌ড পি-অঞ্চল পরিব্যাপ্ত করা হয়েছে, যা'কে সোর্স ও ড্রেইন বলা হচ্ছে। এই সোর্স আর ড্রেইন এর ওপরে একটা সিলিকন-ডাই-অক্সাইডের খুব পাতলা স্তর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়।

তার ওপর থাকে গেট-মেটেরিয়াল। সিলিকন-ডাই-অক্সাইড (SiO_2) মাঝখানে থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ইনসুলেটর (Insulator) হিসেবে কাজ করে। সোর্স থেকে ড্রেইন এর মধ্যে একটা ধাতব যোগাযোগ থাকে, যাকে বলা হয় চ্যানেল। সম্পূর্ণ চ্যানেলকে ঢেকে দিয়ে থাকে গেট টার্মিনাল—অবশ্যই চ্যানেল আর গেটের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্যই মাঝখানে থাকে সিলিকন-ডাই-অক্সাইড (SiO_2)। সাধারণ ট্রানজিষ্টরের থেকে মসফেটের আয়তন খুবই ছোট হয়।

গেট মেটেরিয়ালের ধাতব ক্ষেত্রফল, সঙ্গে অক্সাইডের স্তর এবং সেমিকনডাকটার চ্যানেল—এই তিনটে মিলে তৈরী হয় একটা সমান্তরাল বা প্যারালাল প্লেট ক্যাপাসিটর। সিলিকন-ডাই-অক্সাইডের ইনসুলেটর স্তরের জন্যই এর নাম ইনস্যুলেটেড-গেট ফিল্ড এফেক্ট ট্রানজিষ্টর। এই সিলিকন-ডাই-অক্সাইড স্তরের জন্যই মসফেটের ইনপুট রেজিস্টেন্স খুব বেশী হয় (10^{10} থেকে 10^{15} Ω)। পি-চ্যানেল মসফেটই বেশী ব্যবহৃত হয়।

কার্য প্রণালী

যদি গেট মেটেরিয়ালে নেগেটিভ ভোল্ট দেওয়া হয় তাহলে তার চারপাশে একটা তড়িৎ ফিল্ড তৈরী হয়, যা SiO_2-কে আবেশিত করে এবং পজেটিভ চার্জ তৈরী হয় (চিত্র-৬.১১) যা SiO_2-কে সরাসরি ভেদ করে এবং আবেশিত তড়িৎ, সেমিকনডাকটার চ্যানেলকেও পজেটিভ চার্জ দ্বারা আবেশিত করে। এই পজেটিভ চার্জ তৈরী করে একটা 'বিপরীত স্তর' (Inversion layer)। এখন যতই নেগেটিভ ভোল্টজের বিস্তৃতি ঘটে, ততই এই বিপরীত স্তরের চার্জও বৃদ্ধি পায়। SiO_2-র স্তরের নিচের অংশ এখন পি-টাইপ ক্যারিয়ার হয়ে যায় এবং চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে সোর্স থেকে ড্রেইন এর মধ্যে তড়িৎ প্রবাহিত হতে থাকে। এই 'ড্রেইন তড়িৎপ্রবাহকে' বৃদ্ধি করা যায় নেগেটিভ গেট ভোল্টেজ দ্বারা।

বিভিন্ন ফেট এর সাংকেতিক চিহ্ন নিম্নরূপ :—

বিভিন্ন ফেট্ এর সাংকেতিক চিহ্ন

চিত্র ৬.১২
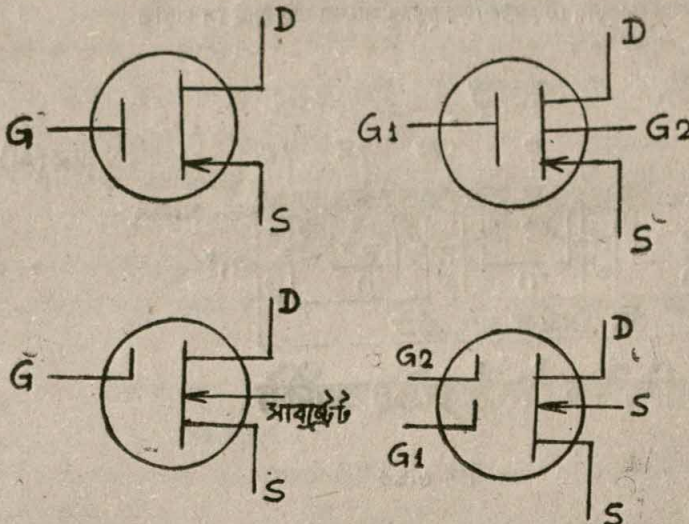
[প্রতিটিই পি-টাইপ ফেটের সাংকেতিক চিহ্ন। এন-টাইপ ফেটের ক্ষেত্রে শুধু তীরচিহ্নটা উল্টে যাবে।]

ইনটিগ্রেটেড সার্কিট (Integrated Circuit)

আগেই বলেছি, ঢাউস ঢাউস যন্ত্রাংশকে ছোট করার চেষ্টার থেকেই ট্র্যানজিষ্টরের আবিষ্কার। কিন্তু বিজ্ঞানীরা তো আর হাত গুটিয়ে বসে থাকার লোক নন। তাঁরা দেখলেন, ট্র্যানজিষ্টর লাগানোর পরেও সার্কিটটা বেশ বড়ই হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে বিভিন্ন সেটগুলোও মানুষের বহনযোগ্য হচ্ছে না। হালকা হয়তো হচ্ছে কিন্তু ছড়িয়ে থাকছে অনেকটা জায়গা নিয়ে। এর চেয়েও ছোট যদি কিছু বানানো যায়—এই চেষ্টা থেকেই তৈরী হলো ইনটিগ্রেটেড সার্কিট বা আই সি (I C)।

একটা ট্র্যানজিষ্টরকে সঠিকভাবে কার্যকরী করতে দরকার পড়ে বেশ কিছু রেজিষ্টর আর ক্যাপাসিটরের। আই সি-তে এই পুরো ব্যাপারটাকেই ঢুকিয়ে দেওয়া হলো একটা ছোট্ট চিপসের মধ্যে। ডায়োড, ট্র্যানজিষ্টরকে সহজেই বিজ্ঞানীরা বাগে এনে ফেললেও রেজিষ্টরকে পুরোপুরি আনা গেল না। একেবারে নিখুঁতমানের না হলেও, আনুপাতিক মানের মধ্যে তারা বেঁধে ফেললেন রেজিষ্টরকে। ইনডাকটরকে কিন্তু কিছুতেই ছোট্ট করে ফেলা গেল না। ওকে রাখতেই হলো সার্কিটের বাইরে এবং এভাবেই তৈরী হয়ে গেল ইনটিগ্রেটেড সার্কিট।

কীভাবে ইনটিগ্রেটেড সার্কিট তৈরী হয়—সেটা বেশ জটিল। এখানে চেষ্টা করবো হালকাভাবেই তা' আলোচনা করতে। একটা একক সিলিকন কৃষ্ট্যাল থেকেই কিন্তু তৈরী হয় আই সি। তার মধ্যেই থাকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ এলিমেন্ট (Active & Passive element)। তারপর বিভিন্ন প্রক্রিয়া যেমন এপিটেক্সিয়াল গ্রোথ (Epitaxial growth), ভেজাল বা ডোপিং করা, অক্সাইড গ্রোথ (Oxide growth), অক্সাইড এচিং (Oxide etching), ফোটোলিথোগ্রাফি (Photolithography) ইত্যাদি করা হয়। এই সমস্ত কিছুই পর পর হয়ে যাওয়ার জন্য আছে বিশেষ প্রক্রিয়া, যার ফলে খুব তাড়াতাড়ি একটার পর একটা আই সি তৈরী হয়ে যায়, তাই এর উৎপাদন মূল্য (Production cost) বেশ কম হয়। সেমিকনডাকৃটার টেক্নোলজির চূড়ান্ত সাফল্য এই আই সি প্রস্তুতি।
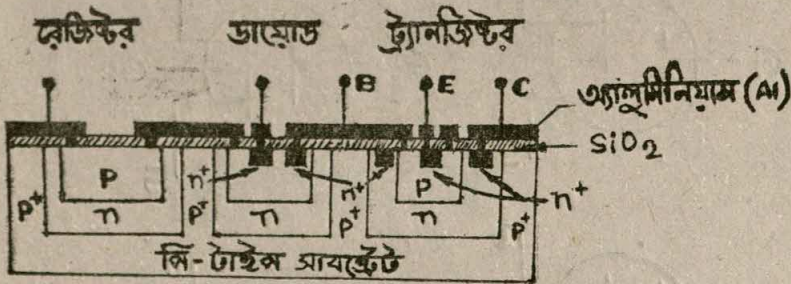
চিত্র ৬.১৩

আই সি তৈরীর জন্য দরকার নির্দিষ্ট চারটে স্তরের মেটেরিয়াল। চিত্র ৬.১৩ তে তা পরিষ্কার করে দেখানো হয়েছে। সবচেয়ে নিচের স্তরটা হলো পি-টাইপ সিলিকন। এর কাজ হলো সাবষ্ট্রেট (Substrate) হিসেবে, এর ওপরই ইনটিগ্রেটেড সার্কিটটা গড়ে উঠবে। দ্বিতীয় স্তরটা খুবই পাতলা এন-টাইপ মেটেরিয়ালে তৈরী। বিভিন্ন প্রসারণ

পদক্ষেপের ব্যবহারে এই এন-অংশেই গড়ে ওঠে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কম্পোনেন্টগুলো যেমন ট্রানজিস্টর, ডায়োড, ক্যাপাসিটর, রেজিস্টর। এগুলো তৈরী হয় পি-টাইপ এবং এন-টাইপ ভেজালকে এর মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে এবং খুব
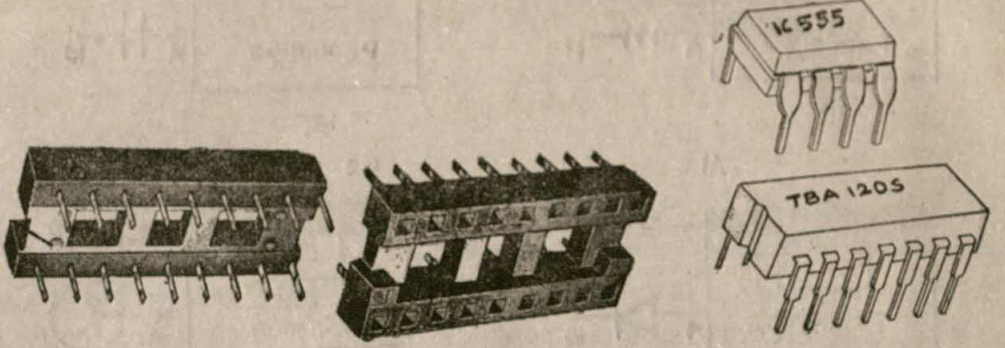
ইনটিগ্রেড সার্কিটের বেস। এই বেস-এর লেগগুলো পিসিবিতে লাগানো হয়। এর ওপর বসে মূল আইসি

বিভিন্ন লেগ সমৃদ্ধ আইসি'র আকৃতি

চিত্র ৬.১৪

পরিশীলিত মাত্রায় নির্দিষ্ট অংশে এই ভেজাল মেশানো হয়। ভেজাল যাতে গোটা অংশেই না ছড়াতে পারে, তারজন্য সিলিকন-ডাই-অক্সাইড (SiO_2)-কে প্রাচীর হিসেবে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ এই প্রাচীর 'ভেজাল'-এর অনুপ্রবেশ আটকাতে সাহায্য করে। তৃতীয় স্তরে থাকে শুধুই সিলিকন-ডাই-অক্সাইড, যা সেমিকনডাকটার তলকে অন্য ভেজাল পদার্থ দ্বারা কলুষিতকরণের হাত থেকে বাঁচায়। যেখানে যেখানে ভেজাল পদার্থ মেশানো দরকার, সেখানে এই SiO_2 স্তরকে বিশেষ পদ্ধতিতে কেটে তুলে নেওয়া হয়, যাকে বলা হয় এচিং (etching) এবং এই এচিং করা হয় ফোটোলিথোগ্রাফিক পদ্ধতি (photolithographic process)-র সাহায্যে। চতুর্থ এবং শেষ স্তর হিসেবে একটা ধাতব (এ্যালুমিনিয়াম) স্তর দেওয়া হয়, যা সেই আই সি'র মধ্যেকার কম্পোনেন্টগুলোর অন্তঃসম্পর্ক ঘটায়।

এখন দেখা যাক, আই সি ব্যবহারের ফলে আমরা কোন কোন দিকে লাভবান হলাম।

(1) যেহেতু কম মেটেরিয়াল দিয়ে অনেক বেশী পরিমাণ আই সি বানানো যায় তাই উৎপাদন মূল্য অনেক কম।

(2) আয়তনে ক্ষুদ্র যার জন্য জায়গা কম নেয়। আই সি দিয়ে প্রস্তুত কোনো সামগ্রীর আয়তন সেই কারণেই যথেষ্ট ছোট হয়।

(3) যেহেতু এর গঠনতন্ত্রই আলাদা, তাই এর মধ্যে কোনোরকম সোল্ডারিং-এর দরকার পড়ে না, যার জন্য ভেতরে ফল্টও কম হয়। অনেক বেশী বিশ্বাসযোগ্য।

(4) যেহেতু দাম অপেক্ষাকৃত কম তাই অনেক জটিল ও ব্যয়সাপেক্ষ সার্কিটও আই সি দিয়ে করলে খরচ কম পড়ে কিন্তু সেই সার্কিট উন্নততর হয়।

টিভিতে যে আইসিগুলো ব্যবহার করা হয়, এগুলোকে বলে মোনোলিথিক (Monolithic) ইনটিগ্রেটেড সার্কিট। গ্রীক ভাষায় 'Monos' এর অর্থ হলো এক বা একক এবং 'lithos' এর অর্থ হলো 'পাথর'। যেহেতু একটাই মাত্র পাথর বা ক্রিস্ট্যালের উপরই গেঁথে তোলা হয় এই সার্কিট তাই এর নাম মোনোলিথিক ইনটিগ্রেটেড সার্কিট।
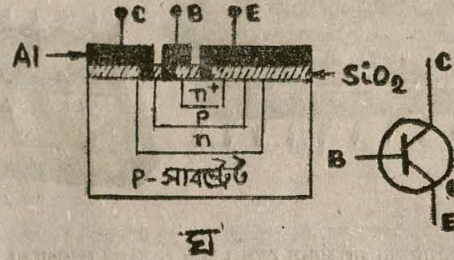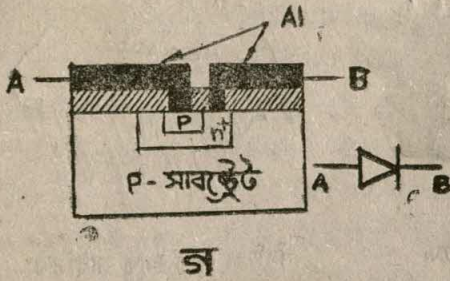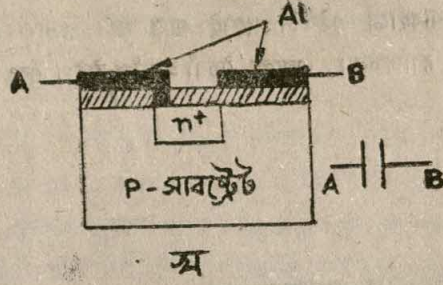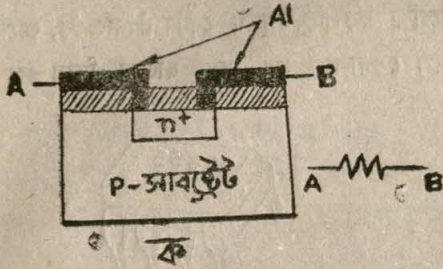
(ক) ইনটিগ্রেটেড রেজিস্টর (খ) ইনটিগ্রেটেড ক্যাপাসিটর (গ) ইনটিগ্রেটেড ডায়োড (ঘ) ইনটিগ্রেটেড ট্র্যানজিস্টর
চিত্র ৬.১৫

ইনটিগ্রেটেড রেজিস্টর

ইনটিগ্রেটেড সার্কিট রেজিস্টর বানানোর জন্য পি-টাইপ সাবস্ট্রেটের ওপর এন-টাইপ রিজিয়নকে যুক্ত করা হয়। এন-টাইপ পদার্থের দু'টো অংশে থাকে দু'টো টার্মিনাল পয়েন্ট। SiO_2 থাকে চিপ্-এর প্রধান অংশ এবং ধাতব কনটাক্টের মাঝখানে। এই SiO_2, ইনসুলেটর ও সার্কিট আইসোলেটর (Circuit Isolator) হিসেবে কাজ করে এবং শর্টসার্কিট হওয়া থেকে বাঁচায়।

ধাতব পদার্থের রেজিস্টিভিটি (Resistivity) বা বাধাদানের ক্ষমতা এবং ধাতব পদার্থের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের ওপর রেজিস্টরের মান নির্ভর করে। পদার্থের রেজিস্টিভিটি পূর্ব নির্ধারিত থাকে এবং এর মান নিচের সমীকরণের সাহায্যে সহজেই বা'র করা যায়।

$$\text{রেজিস্টেন্স} = \frac{\text{দৈর্ঘ্য}}{\text{প্রস্থ}} \times \text{রেজিস্টিভিটি}$$

ইনটিগ্রেটেড ক্যাপাসিটর

ইনটিগ্রেটেড সার্কিট ক্যাপাসিটর বানানোর সময়, SiO_2-কে ডাইলেকট্রিক (Dielectric) হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এখানে [চিত্র নং ৬.১৫ (খ)] একটা ধাতব কনটাক্ট এন-টাইপ পদার্থের সাথে যুক্ত, অন্য কনটাক্টটার মধ্যেখানে রয়েছে SiO_2, যা এখানে ডাইলেক্ট্রিক হিসেবে ব্যবহৃত এবং তার তলায় রয়েছে এন-টাইপ পদার্থ।

ক্যাপাসিটর এর মান বা'র করার জন্য নিম্নোক্ত সমীকরণ ব্যবহার করা হয়।

$$\text{ক্যাপাসিটেন্স} = \frac{\text{পদার্থের তলের ক্ষেত্রফল}}{SiO_2\text{-র গভীরতা}} \times \text{ডাইলেকৃট্রিক কনটাক্ট}$$

SiO_2-র গভীরতা সাধারণতঃ ধ্রুবক থাকে। উচ্চমানের ক্যাপাসিটর বানানোর জন্য বাড়ানো হয় এন-টাইপ রিজিয়ন।

ডায়োড ও ট্র্যানজিষ্টর

চিত্র ৬.১৫ (গ) ও (ঘ)-এ ডায়োড ও ট্র্যানজিষ্টর বানানোর ছবি দেওয়া হয়েছে। এখানেও ঐ একই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। ধাতব কনটাক্টকে পরিবর্তন করে বিভিন্ন কম্পোনেন্টকে আলাদা করা হয়।

যদিও এগুলোকে আলাদা আলাদা করে দেখানো হলো কিন্তু বাস্তবে, চিপ্‌কে ছোট করার জন্য এ সবই একই চিপের মধ্যে ধরে রাখা যায়। [চিত্র ৬.১৩]

জেনার ডায়োড (Zener diode)

পদার্থবিজ্ঞানী সি. এ. জেনার-এর নামে এই ডায়োডটার নামকরণ করা হয়েছে। এই ডায়োডটা রিভার্স ভোল্টেজের চরিত্রানুযায়ী বানানো হয়েছে অর্থাৎ এটা রিভার্স বায়াসে কাজ করে। এটাও একটা সিলিকন ডায়োড, যা থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রিভার্স ব্রেকডাউন ভোল্টেজ (সাধারণতঃ 3·9V থেকে 27V) পাওয়া যায়। এটা নির্মাণের জন্য খুব বেশী ডোপিং-এর প্রয়োজন হয়। এই ডায়োড ; ডায়োডের ব্রেকডাউন অংশেও কার্যকরী হওয়ার ফলে ধ্রুবক-ভোল্টেজ (constant voltage) আউটপুট হিসেবে দিতে পারে। এই ডায়োডকে এ্যাভালঞ্চ (Avalanche) বা ব্রেকডাউন (Breakdown) ডায়োডও বলা হয়।

বিভিন্ন মানের জেনার ডায়োড পাওয়া যায়। এর দ্বারা এর ওপর লোড হিসেবে যতই তড়িৎপ্রবাহ বাড়ানো হোক না কেন, তার ফলে যে ভোল্টেজের পরিবর্তন ঘটে, এই ডায়োডের মাধ্যমে আমরা নির্দিষ্ট জেনার মান-এর ভোল্টেজই পেয়ে থাকি।
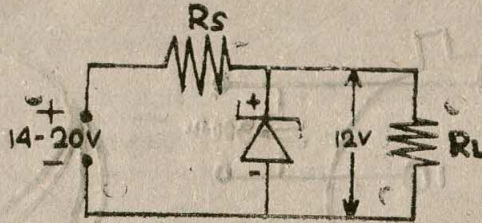
চিত্র ৬.১৬

চিত্র ৬.১৬ দেখলে ধারণাটা পরিষ্কার হবে। ওপরের সার্কিটটা একটা ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রক (voltage regulator) সার্কিট যাতে একটা 12V জেনার ডায়োড ব্যবহার করা হয়েছে রেজিস্টেন্স R_L-এর সমান্তরালে। ইনপুট ভোল্টেজ হিসেবে 14 থেকে 20V দেওয়া হয়েছে। একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, রিভার্স ভোল্টেজের জন্য ইনপুট ভোল্টেজকে জেনার ডায়োডের N-অংশে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ডায়োডটাকে রিভার্স বায়াস অবস্থায় লাগানো হয়েছে। রেজিস্টেন্স R_S তড়িৎপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং R_L এর সমান্তরালে আমরা পাবো নিয়ন্ত্রিত 12V।

বাজারে জেনার ডায়োড নির্দিষ্ট মান-এ পাওয়া যায়। এই মানগুলো হলো 3·9V 4·5V, 6V, 7·5V, 9V, 12V, 15V, 16V, 18V, 27V।

টানেল ডায়োড (Tunnel diade)

এটাও একটা সেমিকনডাকটার ডায়োড। এই ডায়োডের আবিষ্কর্তা বিজ্ঞানী এসাকির নামে এই ডায়োডকে অনেকে এসাকি ডায়োড (Esaki diode) ও বলেন।

একটু বেশী ডোপিং করা এই সেমিকনডাকটার ডায়োডের পি-এন জাংশনের নিরপেক্ষ ক্ষেত্রে তৈরী হয় একটা সুরঙ্গ, যেখান দিয়ে সহজেই তড়িৎ আধান বহনকারী ইলেকট্রন ও হোলগুলো চলাচল করতে পারে।

টানেল ডায়োডকে এ্যাম্প্লিফায়ার এবং অসিলেটর সার্কিটে, যেখানে অত্যন্ত কম (মাইক্রো-ওয়েভ) ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ে কাজ করা হয়, সেখানে ব্যবহার করা হয়।

টানেল ডায়োডের সাংকেতিক চিহ্ন = চিত্র ৪.৪ এ দেওয়া আছে।

সারফেস এ্যাকোসটিক ওয়েভ ফিলটার (Surface Acoustic Wave filter or SAW Filter).

টেলিভিশনের ইন্টারমিডিয়েট ফ্রিকোয়েন্সি অংশ (IF Stage)-র আগে এই 'স' (SAW) ফিলটার লাগানো হয়। টেলিভিশনে, এ্যান্টেনার মধ্যে দিয়ে টিউনার-এ এসে পৌঁছোয় সিগন্যাল। সেখানে শব্দর জন্য অডিও সিগন্যাল' (Audio Signal ; 40.4 MHz) এবং ছবির জন্য 'ভিডিও সিগন্যাল' (Video Signal ; 31·9 MHz) পাওয়া যায়। এই সিগন্যালের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় সিগন্যালের অনুপ্রবেশ হ্রাস করার জন্যই এই 'স' ফিলটার ব্যবহার করা হয়।

ইনটিগ্রেটেড সার্কিট (IC) বানানোর সময় আমরা 'ফোটোএচিং টেকনিক' কথাটা শুনেছি। 'স' ফিলটার বানানোর সময়ও এই 'ফোটোএচিং টেকনিক' এর প্রয়োগ কৌশল ব্যবহার করা হয়। 'স' ফিলটার পিজোইলেকট্রিক (Piezoelectric) উপাদানে তৈরী যা তড়িৎ সিগন্যালকে যান্ত্রিক স্পন্দনে (Mechanical vibration) এবং বিপরীতক্রমে যান্ত্রিক স্পন্দনকে তড়িৎ সিগন্যালে পরিণত করে।
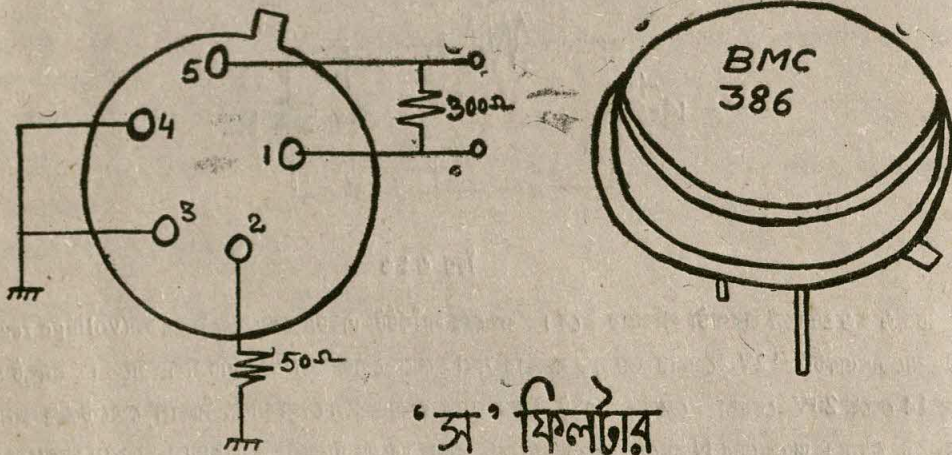
চিত্র ৬.১৭

'স' ফিলটারের মধ্যে থাকে একটা প্লেট। যাকে বলে 'স-প্লেট'। এর প্রাথমিক অংশ, যেটাকে ট্রান্সমিটার অংশ বলা হয়—সেখানে পাতলা চিরুনির দাঁতের মতো দু'টো ইনপুট ইলেকট্রোড (Electrode) থাকে। এই দু'টো ইলেকট্রোড

কিন্তু কাজ করে সামঞ্জস্যপূর্ণ সার্কিটের মতো এবং তাদের উপর সিগন্যাল প্রয়োগিত হলে তাদের যে প্রতিক্রিয়া হয়, তা' সম্পূর্ণ নির্ভর করে ঐ চিরুনির দাঁতের মতো ইলেকট্রোড দু'টোর দৈর্ঘ্য এবং মধ্যবর্তী দূরত্ব বা ফাঁকের উপর। প্লেটটার অন্যপ্রান্তে, যে অংশটাকে রিসিভার বলা হয়, সেখানেও থাকে আরো দু'টো চিরুনির মতো দাঁত।

যখন কোনো পরিবর্তনশীল সিগন্যাল, ট্রান্সমিটার অংশের ইনপুট ইলেকট্রোডে দেওয়া হয় তখন পুকুরে ঢিল মারলে যেমন তরঙ্গর সৃষ্টি হয়, ঠিক সেইরকম একটা ক্ষুদ্র তরঙ্গ ঐ পিজোইলেকট্রিক প্লেটের উপর তরঙ্গায়িত হয় এবং তা' অন্য প্রান্তের রিসিভার ইলেকট্রোডে পৌঁছোয়। রিসিভার ইলেকট্রোড এই যান্ত্রিক কম্পনকে গ্রহণ করে এবং তা'কে আবার তড়িৎ সিগন্যালে পরিবর্তিত করে।

'স' ফিলটারের একটা মস্ত বড় অসুবিধা হলো, এই ফিলটার আগত বা ইনকামিং সিগন্যাল (Incoming Signal)-এর মাত্রা হ্রাস করে। এই ক্ষতিপূরণের জন্য একটা প্রাক-সিগন্যাল সম্প্রসারণ অংশ (Pre-Amplifier Stage) র প্রয়োজন হয়, যা সিগন্যালের মাত্রা হ্রাস-এর ঘাটতি মেটায়।
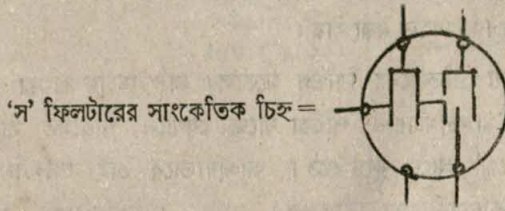
একটা 'স' ফিলটার (BMC 389)-এর চারিত্রিক গুণাবলী

ষ্টোরেজ তাপমাত্রা (স্বাভাবিক তাপমাত্রা সহ্য করার ক্ষমতা) ঃ– 25°C থেকে 85°C
কার্যকরী তাপমাত্রার হার (সার্কিটে লাগানো অবস্থায়) ঃ—10°C থেকে 70°C

প্যারামিটার	ফ্রিকোয়েন্সি (MHz)	বিস্তার (Amplitude in db)
ভিশন ক্যারিয়ার	38·9	–6
শব্দের ক্যারিয়ার	33·4	–24 (Min),—18 (Max)
ভিশন ট্র্যাপ	31·9	–38
সাউণ্ড ট্র্যাপ	40·4	–38
ইনপুট ইম্পিডেন্স	37·0	—
আউটপুট ইম্পিডেন্স	37·0	—

৭

মাল্টিমিটার বা এ্যাভোমিটার

যে কোনো যন্ত্রাংশ এবং সার্কিট পরীক্ষা করার জন্য 'মাল্টিমিটার' বা এ্যাভোমিটার (Multimeter or AVOmeter) দরকার। কোনো টিভি পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের মধ্যে এটাই সবচেয়ে বেশী দরকারী এবং মূল্যবান। এই মিটার দিয়ে অ্যামপিয়ার (A) ভোল্ট (V) এবং ওহ্‌ম (O) মাপা যায় বলে একে AVOmeterও বলা হয়। তড়িৎপ্রবাহ, ভোল্টেজ এবং বাধা বা রেজিস্টেন্স মাপার সাথে সাথে, আজকাল কিছু কিছু মিটারে তাপমাত্রা মাপারও ব্যবস্থা থাকছে। এসি এবং ডিসি—দু'টোর ক্ষেত্রেই এই মিটার ব্যবহার করা যায়।

সাধারন মাল্টিমিটার

চিত্র ৭.১

বাজারে নানা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন মডেলের মাল্টিমিটার পাওয়া যায়। এখন 'ডিজিটাল মাল্টিমিটার'ও পাওয়া যাচ্ছে, যেখানে পরিমিত মান এর সংখ্যাগুলো 'ডিসপ্লে' অংশে ফুটে ওঠে। আলাদাভাবে তাই মাল্টিমিটারের গঠন নিয়ে আলোচনা করা নিরর্থক। সমস্ত মাল্টিমিটারের সাথেই 'নির্দেশিকা' দেওয়া হয়, যাতে সেই মাল্টিমিটারের বৈশিষ্টগুলো লেখা থাকে।

এখানে মাল্টিমিটারের সেই বিষয় গুলো নিয়েই আলোচনা করা যাক, যা' প্রত্যেকটা মাল্টিমিটারের ক্ষেত্রেই এক। যে মাল্টিমিটার নিয়ে এখন আলোচনা করবো তা'হল ইলেকট্রোম্যাগনেটিক কারেন্ট মিটার।

মাল্টিমিটার থেকে লাল এবং কালো রঙের দু'টো তার বের করা হয়। এগুলোকে বলে টেস্ট প্রড (Test prod) কালো তারটা সব সময় কমন নেগেটিভে স্থির রেখে লাল তারটা বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয়। একই মাল্টিমিটারে বিভিন্ন মান মাপার জন্য বিভিন্ন স্কেল থাকে। সিলেক্টর সুইচ (Selector Switch) ঘুরিয়ে বা লাল প্রডের স্থান পরিবর্তন করে ভোল্টেজ, অ্যাম্‌পিয়ার বা রেজিষ্ট্যান্স-এর বিভিন্ন মান মাপা হয়।

ওহ্‌ম মিটার

সাধারণতঃ বিভিন্ন যন্ত্রাংশের মধ্যেকার রোধ, রেজিস্টরের রোধ এবং কন্টিনিউইটি (অর্থাৎ ছেদহীন কানেকশন) পরীক্ষা করার জন্য এর ব্যবহার করা হয়। দু'টো প্রড্‌কে পরীক্ষনীয় পার্টসের দু'দিকে লাগালে যদি কাঁটাটা সম্পূর্ণ স্কেলকে পার হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে সেই পার্টসের কোন রোধ বা বাধা নেই। কারণ, রোধ মাপার স্কেলটা কিন্তু বিপরীত দিক থেকে অর্থাৎ ডানদিক থেকে শুরু হয়। বাকি স্কেলগুলো শুরু হয় বাঁদিক থেকে। এবার কাঁটা বাঁদিক থেকে ডানদিকে যতটা কম যাবে রেজিস্টরের মান তত বেশী হবে। মাল্টিমিটারের মধ্যে ব্যাটারী লাগানো থাকে।

রেজিষ্ট্যান্স মাপার সময় সেই ব্যাটারী সার্কিটে রেজিষ্টরটাকে লাগিয়ে দেওয়া হয়। রেজিষ্টর না লাগিয়ে দু'টো প্রড কে যুক্ত করলে মাল্টিমিটার বাধাহীন সার্কিটের মতো কাজ করে এবং কাঁটাটা পুরো ওহ্‌ম স্কেল পেরিয়ে শূন্যতে চলে যায়। কন্টিনিউইটি পরীক্ষার জন্য এই ব্যাটারী সার্কিটটাকে ব্যবহার করে বোঝা যায় কন্টিনিউইটি ঠিক আছে কিনা।

সঠিক মান অনুযায়ী রোধ মাপার জন্য দু'টো প্রডকে যুক্ত করে, কাঁটাটাকে ওহ্‌ম স্কেলের শূন্যতে মিলিয়ে নিয়ে অ্যাড্‌জাষ্ট করে নিতে হয়। এর জন্য মাল্টিমিটারের গায়ে একটা অ্যাড্‌জাষ্ট নব (Adjust Knob) থাকে। মনে
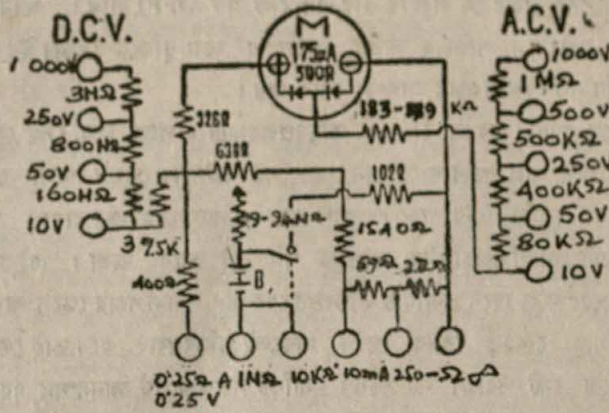
চিত্র ৭.২ মাল্টিমিটারের সার্কিট

রাখতে হবে মাল্টিমিটারের ভেতরের ব্যাটারী সার্কিট রোধহীন হলেই সার্কিটে লাগানো রোধের মান সঠিক পাবো। মাল্টিমিটারে ওহ্‌মের সাংকেতিক চিহ্ন হিসেবে গ্রীক হরফ 'ওমেগা' (Ω) দেওয়া থাকে।

ভোল্ট মিটার

আমরা জানি ভোল্ট হল বিভব-প্রভেদের একক। কোন পরিবাহীর দুই প্রান্তকে একটা পজেটিভ ও অপরটা নেগেটিভ ধরলে ভোল্ট মাপার সময় নেগেটিভ সাপেক্ষে পজেটিভ অথবা পজেটিভ সাপেক্ষে নেগেটিভ বিভব প্রভেদ মাপতে হয়। ডিসি এবং এসি—দুটো ক্ষেত্রেই ভোল্টেজ মাপার জন্য একই মাল্টিমিটার ব্যবহার করা হয়। নেগেটিভ সাপেক্ষে পজেটিভ ভোল্টেজ মাপার জন্য কালো প্রডটার একপ্রান্ত মাল্টিমিটারের কমন নেগেটিভে রেখে অন্য প্রান্তটা পরীক্ষনীয় সেটের নেগেটিভ অংশে (মূল পাওয়ার সাপ্লাইয়ের নেগেটিভ অংশ। সাধারণতঃ চেসিস নেগেটিভ হয়।) যুক্ত করে, লাল প্রডটার এক প্রান্ত সঠিক ভাবে প্রয়োজনীয় স্কেলের নির্বাচন করে অন্যপ্রান্ত দিয়ে সাবধানে যন্ত্রাংশের বিভিন্ন পজেটিভ অংশে লাগিয়ে স্কেলের মাপ দেখে বুঝতে হবে সেই অংশে কত ভোল্টেজ আছে। এসি এবং ডিসির ক্ষেত্রে আলাদা অলোদা স্কেল এবং স্থান নির্দেশ করা থাকে। সিলেক্টর সুইচ ঘুরিয়ে বা লাল প্রডের স্থান পরিবর্তন করে এবং সঠিক স্কেল বেছে নিয়ে তবেই ভোল্টেজ মাপা উচিৎ।

পজেটিভ সাপেক্ষে নেগেটিভ ভোল্টেজ বা এককথায় নেগেটিভ ভোল্টেজ মাপার সময় স্বাভাবিকভাবেই প্রডদু'টোর স্থান ঘুরিয়ে দিতে হবে। সেক্ষেত্রে লাল প্রডটা চলে যাবে কমন নেগেটিভে এবং কালো প্রডটা দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে।

ভোল্টেজ পরীক্ষার সময় পরীক্ষনীয় সেটটা চালু বা অন্ (ON) অবস্থায় থাকতেই হবে।

অ্যামপিয়ার মিটার

তড়িৎপ্রবাহ মাপার জন্য অ্যামপিয়ার মিটার ব্যবহার করা হয়। তবে মাল্টিমিটারের এই অংশটা ব্যবহার না করাই ভালো। একটা পার্টস বা সার্কিট পরীক্ষার জন্য ওহ্মমিটার আর ভোল্টমিটারের সাহায্যেই আমরা যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়ে যাই এবং সিদ্ধান্তে আসতে পারি। আসলে তড়িৎপ্রবাহমাত্রার মাপ পেতে গেলে মিটারটাকে সার্কিটের সাথে সিরিজে ঢুকিয়ে দিতে হয়। রোধের ক্ষেত্রেও অবশ্য তাই করা হয় কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা 'পাওয়ার সাপ্লাই' হিসেবে মাল্টিমিটারের ভেতরের ব্যাটারীকে ব্যবহার করি এবং সেট অফ (OFF) রাখি। অ্যামপিয়ার মাপার ক্ষেত্রে কিন্তু মিটারটাকে লাইন কারেণ্ট অর্থাৎ মূল পাওয়ার সাপ্লাই কারেন্টের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। যার ফলে, একটু এদিক ওদিক হলেই পুরো মিটারটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

একান্তই মাপতে হলে, পার্টস এর যে লেগ-এ তড়িৎপ্রবাহমাত্রা মাপতে হবে, সেই লেগটা খুলে ফেলে সেখানে নেগেটিভ কালো প্রডটা লাগিয়ে, লাল প্রডটাকে-যে স্থান থেকে সেই পার্টসটার লেগটা খোলা হলো সেখানে ছোঁয়াতে হবে এবং অবশ্যই যেন সেই স্থানটা মূল সার্কিটের পজেটিভ অংশ হয়—এ ব্যাপারের নজর রাখতে হবে। এখন অ্যামপিয়ার মিটারটার ব্যবহার হবে একটা অ্যাম্পিয়ারমিটার লাগানো পরিবাহী তারের মতো। এইবার ঠিক মাত্রায় স্কেল বেছে নিয়ে সেট অন্ করলে, মিটারের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎপ্রবাহের মান, অ্যামপিয়ার স্কেলে পাওয়া যাবে।

ব্যক্তিগতভাবে বলা যায়, যেহেতু বিভব প্রভেদ থাকলেই তড়িৎপ্রবাহ হবে তাই ভোল্টমিটার এবং ওহমমিটার ব্যবহার করেই যে কোনো সেট পরীক্ষা করা সম্ভব। সার্কিট সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন না হয়ে অ্যামপিয়ার মিটারের ব্যবহার, উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী করবে।

মিটারের তিনটে অংশের কাজ জানার পর, মিটার দিয়ে কিছু পার্টসের পরীক্ষা কীভাবে করা যায় সেটাও জানা উচিত। নীচে সেরকমই কিছু পরীক্ষা দেওয়া হলো।

রেজিষ্টরের পরীক্ষা

রেজিস্টরের কালার কোড দিয়ে মান নির্ণয়ের কথা আগেই বলা হয়েছে। কখনো মান সরাসরি রেজিস্টরের গায়েও লেখা থাকে। সেক্ষেত্রে 2E2 লেখা থাকলে বুঝতে হবে রেজিস্টরের মান 2·2Ω অথবা 5K6 লেখা থাকলে বুঝতে হবে 5·6KΩ। কিন্তু সেই লেখাটা যে সঠিক, নির্মাতারা যে প্রত্যেকেই সত্যবাদী এমন বিশ্বাস না করে, প্রতিটা রেজিস্টর পরীক্ষা করে লাগানোই ভালো। অনেক সময় সেটে লাগানো রেজিস্টরের মান এর পরিবর্তন হয়ে যায় বা রেজিস্টর কেটে যায়, যাকে বলা হয় 'ওপেন' (open) হয়ে যাওয়া। রেজিস্টর, ওহ্ম মিটারের সাহায্যে মাপা হয়। সঠিকভাবে স্কেল নির্ণয় করে, রেজিস্টরের দু'টো প্রান্তে দু'টো প্রডকে লাগালে, যদি কাঁটা না নড়ে তা'হলে বুঝতে হবে রেজিস্টরটা কেটে (open) গেছে এবং যদি কাঁটা সম্পূর্ণ স্কেলকে পেরিয়ে শূন্যতে পৌঁছোয় তাহলে বুঝতে হবে, রেজিস্টরটা শর্ট হয়ে গেছে অর্থাৎ একটা পরিবাহী তারের মতো ব্যবহার করছে।

সার্কিটে রেজিস্টর মাপার সময় যে কোনো একটা প্রান্তকে খুলে, তারপর মাপলে তবেই সঠিক মান পাওয়া যায়।

ক্যাপাসিটরের পরীক্ষা

ক্যাপাসিটরের জন্য ওহ্মমিটারের ব্যবহার করা হয়। নন-ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটরের প্রান্ত দু'টো যেহেতু পজেটিভ বা নেগেটিভ হিসেবে আলাদাভাবে চিহ্নিত নয় (অর্থাৎ পোলারিটি নেই) তাই মিটারের দু'টো প্রডকে,

ক্যাপাসিটরের দু'টো লেগে ধরলে যদি কাঁটা না নড়ে তাহলে বুঝতে হবে ক্যাপাসিটরটা ঠিক আছে অর্থাৎ শর্ট হয়ে যায়নি। কিন্তু, যদি কোনভাবে কাঁটা নড়ে এবং কোনো রিডিং দেয় তাহলে বুঝতে হবে ক্যাপাসিটরটা খারাপ অর্থাৎ শর্ট হয়ে গেছে।

ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটরের পজেটিভ এবং নেগেটিভ হিসেবে দু'টো প্রান্তকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে, তাই পজেটিভ প্রান্তে লাল প্রডটাকে এবং নেগেটিভ প্রান্তে কালো কমন নেগেটিভে রাখা প্রান্তটাকে লাগালে, প্রথমেই ওহ্‌ম স্কেলে কিছু রেজিস্টেন্স পাওয়া যাবে, যা তারপরই আস্তে আস্তে কমতে কমতে পূর্বস্থানে ফিরে আসবে। যদি এরকম না ঘটে, অন্য কিছু ঘটে তাহলেই বুঝতে হবে ক্যাপাসিটরটা খারাপ হয়ে গেছে।

ডায়োডের পরীক্ষা

ডায়োডের পরীক্ষার জন্যও ওহ্‌মমিটারের ব্যবহার করা হয়। তবে ডায়োড পরীক্ষার আগে, মিটারের সাথে লাগানো ব্যাটারীর পজেটিভে কোন্ প্রডটা এবং নেগেটিভে কোন্ প্রডটা লাগানো আছে, সেটা জেনে নেওয়া দরকার। সাধারণতঃ কমন নেগেটিভে ব্যাটারীর পজেটিভ এবং ওহ্‌ম স্কেলের অন্য প্রান্তে ব্যাটারীর নেগেটিভ লাগানো থাকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য শুধুমাত্র ওহম মিটারের ব্যবহারের সময়ই মিটারের মধ্যে লাগানো ব্যাটারী আমরা ব্যবহার করি।

ডায়োড মাপার সময় একটু বেশী মাত্রার ওহ্‌ম স্কেল অর্থাৎ মেগা স্কেলটা বেছে নিতে হয়। এবার কালো প্রডটাকে ডায়োডের অ্যানোডে এবং মেগা স্কেলে স্থিত লাল প্রডটাকে ডায়োডের ক্যাথোডে লাগালে, সামান্য রেজিস্টেন্স পাওয়া যাবে অর্থাৎ কাঁটাটা বাঁদিক থেকে, স্কেল পেরিয়ে প্রায় ডানদিকে শূন্যর কাছাকাছি চলে যাবে। আসলে এটা হয় ডায়োডের ফরওয়ার্ড বায়াস অবস্থায় থাকার জন্য।

এইবার প্রড দু'টোকে যদি ঘুরিয়ে ঠিক বিপরীতভাবে লাগানো হয় তাহলে অনেক বেশী রেজিস্টেন্স পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে কাঁটা বাঁদিক থেকে ডানদিকে একটু সরবে মাত্র। এটা আসলে ডায়োডের রিভার্স বায়াস অবস্থার জন্য ঘটে।

সমস্ত রকমের ডায়োডেরই সঠিক থাকার সর্ত এটা। এর বাইরে, অন্য কিছু ঘটলেই বুঝতে হবে ডায়োডটা খারাপ।

ট্র্যানজিষ্টর এর পরীক্ষা

সার্কিটে লাগানো অবস্থায় ভোল্টমিটারের সাহায্যে

যে কোনো সার্কিটেই সাধারণতঃ পি এন পি অথবা এন পি এন ধরনের ট্র্যানজিষ্টর ব্যবহার করা হয়। সার্কিটে দু'টোর প্রয়োগই সমান কার্যকরী শুধু সাপ্লাই হিসেবে তড়িৎপ্রবাহর দিক (Polarity) অর্থাৎ নেগেটিভ এবং পজেটিভ এর ব্যবহার—দু'টো ট্র্যানজিষ্টরের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত। একটা পি এন পি ট্র্যানজিষ্টরের ক্ষেত্রে, এমিটারে পজেটিভ ভোল্টেজ দেওয়া হয় কিন্তু এন পি এন ট্র্যানজিষ্টরের এমিটারে দেওয়া হয় নেগেটিভ ভোল্টেজ। বিশেষভাবে যেটা মনে রাখা দরকার, সেটা হলো একটা ভালো ট্র্যানজিষ্টরের কালেকটর ভোল্টেজ, সাপ্লাই ভোল্টেজের কম হবে। এখন যদি দেখা যায় কালেকটর ভোল্টেজ আর সাপ্লাই ভোল্টেজ সমান হয়ে গেছে, তাহলে বুঝতে হবে ট্র্যানজিষ্টরটা শর্ট হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে ট্র্যানজিষ্টরটা খুলে, একই মান এর একটা নতুন ট্র্যানজিষ্টর লাগিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। একটা খারাপ ট্র্যানজিষ্টর স্বাভাবিকের থেকে খুব বেশী অথবা খুব কম তড়িৎ গ্রহণ করে তবে সেটা নির্ভর করে ট্র্যানজিষ্টরটা ওপেন হয়ে গেছে না শর্ট হয়েছে, তার ওপর।

এখন ট্রানজিস্টরটা লিক্ (Leak) করছে কিনা জানতে হলে, একটা তার দিয়ে বেস আর এমিটারকে শর্ট করে দিলে, যদি সাপ্লাই ভোল্টেজ আর কালেকটর ভোল্টেজ সমান হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে ট্রানজিস্টরটা লিক্ করছে না এবং স্বাভাবিকভাবেই চলছে।

খোলা অবস্থায় ওহ্‌ম মিটারের সাহায্যে

আমরা 'ট্রানজিস্টরের গঠনতন্ত্র' আলোচনায় দেখেছি, ট্রানজিস্টর আসলে হলো দু'টো ডায়োডের সংমিশ্রণ, যার বেসটা দু'টো ডায়োডের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। সহজভাবে বলতে পারি 'কমন বেস'। তাই, ট্রানজিস্টর পরীক্ষার সময়ও, ডায়োডের মতোই বেশী মাত্রার স্কেলটা পছন্দ করতে হয়। এখন, পি এন পি ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে, 'কমন নেগেটিভ' (অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ ব্যাটারীর পজেটিভ) প্রডটা ট্রানজিস্টরের 'বেস' এ লাগিয়ে, লাল পজেটিভ (অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ ব্যাটারীর নেগেটিভ) প্রডটা যথাক্রমে 'এমিটার' এবং 'কালেকটর' এ লাগালে, উভয় ক্ষেত্রেই খুব বেশী রেজিস্টেন্স পাওয়া যাবে। এবার, ঠিক বিপরীতভাবে, লাল প্রডটাকে 'বেস' এ লাগিয়ে, 'এমিটার' আর 'কালেকটর'-এ কমন নেগেটিভ কালো প্রডটা পর্যায়ক্রমে লাগালে মিটারে খুবই কম রেজিস্টেন্স পাওয়া যাবে।

এন পি এন ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে, কালো প্রডটা বেস এ লাগিয়ে, কালেকটর ও এমিটারে লাল প্রডটা লাগালে খুবই কম রেজিস্টেন্স এবং বিপরীতক্রমে অর্থাৎ বেস এ লাল প্রডটা এবং কালেকটরে ও এমিটারে কালো প্রডটা লাগালে খুব বেশী রেজিস্টেন্স পাওয়া যাবে।

যেহেতু সব মিটারের গঠনতন্ত্র একই নয়, তাই ট্রানজিস্টর আর ডায়োড পরীক্ষার সময়, কোন্ প্রডে মিটারের মধ্যে লাগানো ব্যাটারীর কোন্ দিকটা অর্থাৎ ব্যাটারীর নেগেটিভ এবং পজেটিভ দিকটা অবশ্যই জেনে নিতে হবে, কারণ তার ওপরই নির্ভর করবে পরীক্ষালব্ধ ফল—যা একটু ভুল হলেই ভালো পার্টস বাতিল হয়ে যাবে এবং বাতিল পার্টস 'ভালো' হিসেবে স্বীকৃত হবে।

এস সি আর এর পরীক্ষা

মাল্টিমিটারের ওহ্‌মমিটার ব্যবহার করে এস সি আর পরীক্ষা করা যায়। এই পরীক্ষা, সার্কিট থেকে খোলা অবস্থায় থাকা এস সি আর নিয়ে করতে হয়। সাধারণতঃ অ্যানোড ও ক্যাথোড এবং গেট ও ক্যাথোডের 'রোধ' পরীক্ষার মাধ্যমেই এস সি আর পরীক্ষা করা হয়।

একটা ভালো এস সি আর এ, অ্যানোড এবং ক্যাথোডের মধ্যে কখনই রোধ পাওয়া যাবে না কারণ মাঝখানে থাকে গেট এবং সেটা সার্কিট থেকে খোলা অবস্থায় সবসময় বন্ধ থাকে। কিন্তু গেট ও ক্যাথোডের মধ্যে রোধ মাপার সময় প্রড দু'টোকে ঘুরিয়ে বিপরীত অবস্থায় যদি দু'বার রোধ মাপা যায়, সেক্ষেত্রে একবার 30Ω এবং অন্যবার 500Ω রেজিস্টেন্স বা রোধ পাওয়া যাবে।

এই পরীক্ষার মাধ্যমে এস সি আর ভালো আছে—এই নির্ণয় নিয়ে নেওয়া ঠিক নয় কারণ এস সি আর এর মধ্যে একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করে 'গেট'। এই গেট যদি না খোলে তাহলে এস সি আর কখনই কার্যকরী হতে পারবে না। সেই কারণে এই 'গেট'-এর জন্যে বিশেষ একটা পরীক্ষা করা যেতে পারে। মাল্টিমিটারের পজেটিভ প্রডটা অ্যানোডে এবং নেগেটিভ প্রডটা ক্যাথোডে লাগালে মিটারে কোনো রোধই পাবো না—এটাই স্বাভাবিক। এইবার একটা তার দিয়ে বা যে কোনো পরিবাহী পদার্থ দ্বারা নির্মিত বস্তুর (যেমন স্ক্রু-ড্রাইভারের ব্লেড, ছুরির ডগা ইত্যাদি) সাহায্যে এক মূহুর্তের জন্য যদি ক্যাথোড ও গেটকে 'শর্ট' (Short) বা একত্রিত করে দেওয়া যায়, তাহলে

ব্যাটারীর পজেটিভ (মাল্টিমিটারের নেগেটিভ প্রডে পাওয়া যায়) তড়িৎ ঝলক গিয়ে গেটটাকে খুলে দেবে, তখন মিটারে খুব 'অল্প রোধ' পাওয়া যাবে এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো এই শর্টকে তুলে নেওয়া হলেও এই 'রোধ' কিন্তু স্থায়ী হাব। এই পরীক্ষা দু'টোর পর নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এস সি আর টা ঠিক আছে।

ডিজিটাল মাল্টিমিটার

আগেই বলা হয়েছে যে, সাধারণ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক কারেন্ট মিটার এর সাথে সাথে এখন ডিজিটাল মাল্টিমিটারও সহাবস্থান গড়ে তুলেছে। একটু দাম বেশী হওয়াতে এই মিটারের ব্যাপক ব্যবহার এখনো শুরু হয়নি কিন্তু এর সুবিধা অনেক। আগামী দিনে, এই মাল্টিমিটারের ব্যাপক ব্যবহার হবেই।

চিত্র ৭.২

একটা সাধারণ মাল্টিমিটারের থেকে ডিজিটাল মাল্টিমিটার পরীক্ষা করা অনেক সহজ। এখানে কোনো কাঁটা নেই, পরিবর্তে আছে একটা 'ডিসপ্লে' বা 'রিড আউট' অংশ, যেখানে এল ই ডি (LED)-র মাধ্যমে পরীক্ষালব্ধ ফলটা আলোকিতভাবে ফুটে ওঠে। সাধারণ মিটারের তুলনায় এর মাপা ফল অনেকাংশে বেশী সঠিক হয়।

আসলে, ডিজিটাল মাল্টিমিটার এসি ভোল্টেজ, নেগেটিভ ভোল্টেজ, রেজিস্টেন্স, কারেণ্ট সমস্ত রকমের পরীক্ষার ক্ষেত্রেই সেটাকে ডিসি ভোল্টেজে পরিবর্তিত করে নেয়।

ডিজিটাল মাল্টিমিটারেও একটা বা দু'টো 'সিলেকশন সুইচ্' থাকে, যা দিয়ে সঠিক মাত্রা বেছে নিতে হয়। এতেও থাকে দু'টো প্রড। সাধারণতঃ চার ধরনের 'ডিজিটাল মাল্টিমিটার' এখন পাওয়া যায়। এগুলো হলো,

(1) র‍্যাম্প টাইপ (Ramp type)

(2) স্টেয়ার কেস র‍্যাম্প টাইপ (Staircase Ramp type)

(3) ডুয়াল স্লোপ ইন্টিগ্রেটিং (Dual Slope integrating)

(4) নাল ব্যালান্স টাইপ (Null balance type)

ডিজিটাল মাল্টিমিটারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অসুবিধাজনক হলো ভোল্টেজ এবং কারেণ্ট মাপার ক্ষেত্রে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল মান দেখানো। খুবই সংবেদনশীল এই ইলেকট্রনিক মাল্টিমিটারে খুব অল্প ওঠানামাও ধরা পড়ে, যার জন্য অনভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে প্রাথমিকভাবে খুবই অসুবিধা ভোগ করতে হয়। তবে কিছুদিন ব্যবহার করলেই এটা রপ্ত হয়ে যায়।

বহুল ব্যবহারের সাথে সাথে এর মূল্য হ্রাস হলে, ডিজিটাল মিটার যথেষ্ট জনপ্রিয় হবে।

৮

সোল্ডারিং

ইলেকট্রনিক পার্টসগুলো দিয়ে তৈরী হয় বিভিন্ন সার্কিট। কিন্তু পিসিবি (প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড) তে সেইসব পার্টসগুলো গুঁজে দিলেই কিন্তু কাজ শেষ হয়ে যায় না। সার্কিটকে চালু রাখতে গেলে যেটা দরকার সেটা হলো সঠিক সোল্ডারিং। এই সোল্ডারিং কেন দরকার? উত্তরটা খুবই সহজ, কোনো সার্কিটের জন্য ব্যবহৃত পার্টসগুলোকে পিসিবিতে যুক্ত করার জন্য সোল্ডারিংই হলো সবচেয়ে সহজ, কার্যকরী কমনীয় এবং পরিচ্ছন্ন পদ্ধতি।

সোল্ডারিং এর জন্য দরকার একটা সোল্ডারিং আয়রন, বাংলায় যাকে তাতাল বলে, কিছুটা সোল্ডার মেটেরিয়াল যাকে ঝালা বা রাং বলা হয়। এছাড়াও ফ্লাক্স মেটেরিয়াল হিসেবে রজন বা ফ্লাক্স পেস্ট (Flux paste) ও লাগে।

ইলেকট্রনিক জগতে সাধারণতঃ 10 ওয়াট এবং 35 ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সোল্ডারিং আয়রন ব্যবহার করা হয়। খুব তাপ সংবেদনশীল পার্টসগুলোর ক্ষেত্রে অল্প ওয়াটের এবং একটু সহিষ্ণু পার্টসগুলোর ক্ষেত্রে বেশী ওয়াটের সোল্ডারিং আয়রন ব্যবহার করা উচিত।

সোল্ডার বা ঝালা হিসেবে যা ব্যবহৃত হয়, তা'হল টিন ও সীসার মিশ্রন যা প্রায় 60/40 অনুপাতে মেশানো থাকে এবং বেশ কম গলনাঙ্ক (মাত্র 190°C) সম্পন্ন হয়।

কিভাবে সোল্ডার করতে হয়

অনেকের ধারণা আছে, ঝালা দিয়ে ঝেলে দিতে পারলেই সঠিক কানেকশন পাওয়া যাবে। তাই দেখা যায় টিভি সারাতে গিয়ে একটা ভুল ঝালাই এর জন্য গলদঘর্ম হচ্ছেন টেকনিশিয়ানরা। 'ড্রাই সোল্ডার' টেকনিশিয়ানদের কাছে খুবই পরিচিত একটা বিপদ সূচক শব্দ এবং সার্কিটের মধ্যে থেকে সেটা খুঁজে বা'র করা খুবই কঠিন কাজ। অথচ প্রথমেই যদি একটু সাবধানে এবং সঠিক পদ্ধতি মেনে এই সোল্ডারিং করা যায় তাহলে 'ড্রাই সোল্ডার' এর পরিমাণ অনেকাংশে কমিয়ে আনা মোটেই অসম্ভব কাজ নয়।

সোল্ডারিং এর প্রথমেই দেখে নেওয়া উচিৎ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি হাতের কাছেই আছে কি না। একটা নোজ প্লায়ার (Nose plier), একটা চিমটে বা সন্না, রজন, ফাইল এবং পিসিবিতে যে যে পার্টসগুলো গাঁথতে হবে, সেগুলো মিলিয়ে নিয়ে সাজিয়ে রাখার পর সোল্ডারিং আয়রন গরম করতে দেওয়া উচিত।

তারপর প্রতিটা পার্টস এর লেগগুলো এবং পি সি বি তে যেখানে যেখানে পার্টসগুলো যুক্ত হবে তা, ছোট ফাইল বা এমেরি পেপার বা কোনো ছোট ছুরির ডগা দিয়ে ঘষে নিতে হয়। তা'তে সেই অংশগুলো থেকে মোলায়েম, তেলতেলে ভাবটা উঠে গিয়ে কিছুটা রুক্ষভাব আসে, যা সঠিক ঝালাই এর সহায়ক। কোনো তৈলাক্ত পদার্থ থাকলে, তা' সীসা'র মাঝখানে থেকে যায় এবং ভালো বৈদ্যুতিক কানেকশনের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

এইবার, সোল্ডারিং আয়রনের সুচ্যগ্রভাগ, যেটাকে টিপ্ (Tip) বলা হয়, সেটাকেও পরিষ্কার করে নিতে হয়। রজন বা পেস্ট এ ডুবিয়ে এই কাজটা করা হয়। পরিষ্কার করার পর সোল্ডার বা ঝালার একটা হালকা প্রলেপ ঐ মুখে

লাগিয়ে নিতে হয়। টিপ্‌টা তখন দেখতে একটা চকচকে রূপোর মতো হয়ে যায়। তাহলেই বুঝতে হয় যে এই সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে ঝালাই এর কাজ করা সম্ভব।
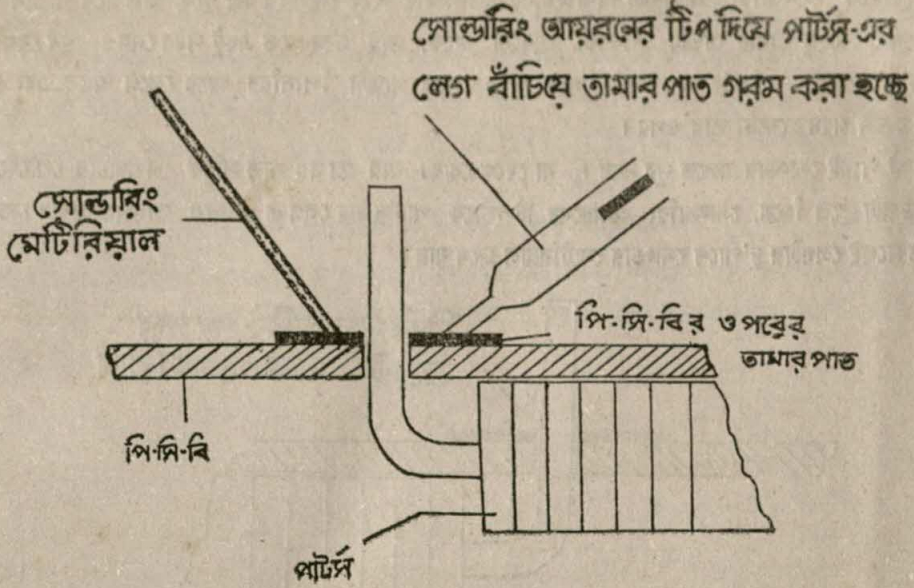
চিত্র ৮.১ (ক)

ঝালাই করার সময় দু'টো ব্যাপার মাথায় রাখতে হয়। প্রথমতঃ হলো, ঝালাটাকে ভালোভাবে গলাতে পারে এমন একটা তাপমাত্রা আমাকে ঝালাই করার জায়গায় সৃষ্টি করতে হবে দ্বিতীয়তঃ এতো বেশী তাপমাত্রা কখনই সৃষ্টি করা হবে না, যাতে আমার ব্যবহৃত পার্টসটাই খারাপ হয়ে যায়। মনে রাখবে, পিসিবির তামার পাতে তাপ দিলে তামার
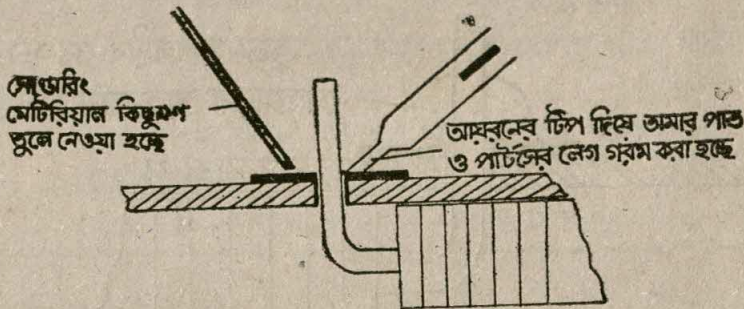
চিত্র ৮.১ (খ)

প্লেট গরম হবে। তাই, প্রথমে যদি পার্টস এর লেগ-এ তাপ না দিয়ে, একটু ফাঁক রেখে শুধু পিসিবির তামার পাতে তাপ

দিই এবং সোল্ডারিং এর শেষ মুহূর্তে পার্ট'স এর লেগ-এ তাপ দিয়ে ঝালাই এর কাজ সম্পন্ন করি, তা'হলে পার্টসটার ওপর তাপমাত্রার খুব বেশী প্রভাব পড়ে না। চিত্র ৮.১ (ক) এবং (খ) দেখলেই এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। সঠিক ঝালাই-এর জন্য যেদিকে সোল্ডারিং আয়রনটা রাখা হয়, তার বিপরীত দিকে সোল্ডার ধরা হবে, মাঝখানে থাকবে পার্ট'স এর লেগ। এখন, যেহেতু তামার পাতটা অনেকটা ছড়ানো থাকে, তাই গরম হতে একটু সময় নেয়। খুব বেশী নয় মাত্র পাঁচ থেকে ছ'সেকেণ্ড—যা নির্ভর করে কতটা অংশ জুড়ে তামার পাতটা পিসিবির গায়ে লেগে আছে এবং সোল্ডারিং আয়রনটা কতটা গরম হয়েছে, তার ওপর।

একটু পরেই সোল্ডার গলতে শুরু করে। যা দেখে বোঝা যায় তামার পাত সঠিক তাপমাত্রায় পৌঁছেছে। এই সময় সোল্ডারটা তুলে নিয়ে, সোল্ডারিং আয়রনের টিপ্‌টাকে পার্ট'স এর লেগ এ ঠেকিয়ে, তারপর আবার সোল্ডারটাকে একবার ঠেকালেই লেগটার দু'পাশে সোল্ডার মেটেরিয়াল জমে যায়।
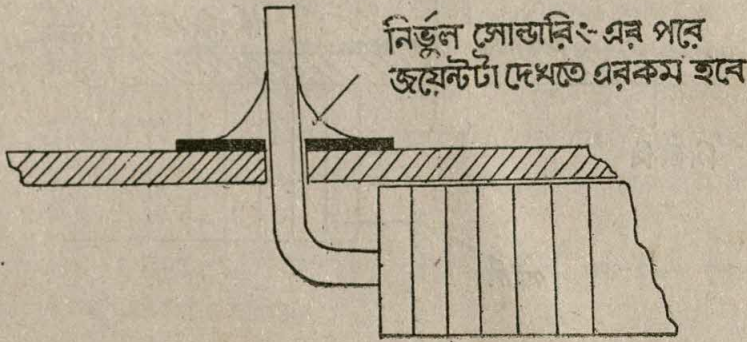
চিত্র ৮.২ (ক)

যখনই সোল্ডার সম্পূর্ণ হয়েছে মনে হয়, সাথে সাথে সোল্ডারিং আয়রন তুলে নিতে হয়। পিসিবির মধ্যে ছড়ানো থাকার জন্য, তামার পাত (তাপের সুপরিবাহী) খুব তাড়াতাড়িই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ঝালাই হয়ে যাবার পর ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করাটা কিন্তু মারাত্মক অপরাধ! দুঃখজনক হলেও সত্য, এই অভ্যেসটা অনেক টেকনিশিয়ানের মধ্যেই
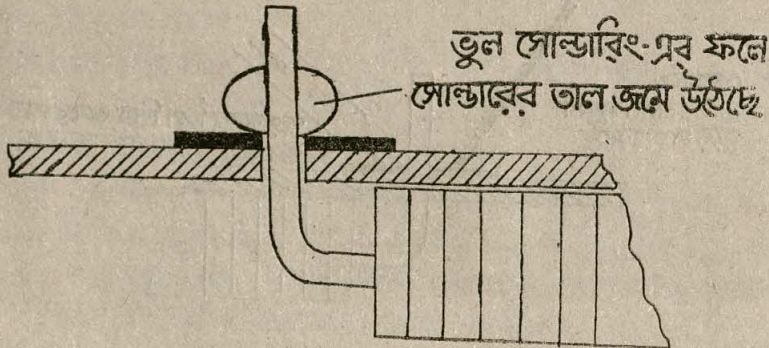
চিত্র ৮.২ (খ)

বিদ্যমান। ঝালাই করার পর সেখানে ফুঁ দিলে, নরম সোল্ডার ফাঁক হয়ে যেতেই পারে। এবং তারপর শক্ত অবস্থায়

সেটা খালি চোখে ধরা পড়ে না। স্বাভাবিক ভাবে ঠাণ্ডা হতে মোটেই বেশী সময় লাগে না। তাই ফুঁ দেবার অভ্যেস থাকলে, প্রথমেই ছেঁটে ফেলতে হবে।

একটা সঠিক নির্ভুল 'সোল্ডারিং জয়েন্ট' এবং একটা ভুল 'সোল্ডারিং জয়েন্ট', চিত্র ৮.২ (ক) ও (খ)দেখলেই বোঝা যাবে। ভালো জয়েন্ট হলে সেটা দেখতে হবে আর্ক (Arc) এর মতো। কিন্তু একটা ভুল বা বাজে সোল্ডারিং জয়েন্ট হবে গোলাকার, একটা সোল্ডারের ঢিপির মতো। অনেক সময় মনে হবে যেন সোল্ডার দিয়ে লেপে দেওয়া হয়েছে।

তবে কাজ কিন্তু এখনই শেষ নয়। সোল্ডারিং হয়ে গেলে, সোল্ডারিং পয়েন্ট এর গোড়া থেকে, পার্টস এর লেগগুলোর অতিরিক্ত বেরিয়ে থাকা অংশকে কেটে ফেলতে হবে। না হলে ঐ অংশ পিসিবির অন্য কোথাও ঠেকে গিয়ে 'শর্ট সার্কিট' করে দিতে পারে।

সবশেষে বলি, সোল্ডারিং করাটা একটা শিল্প। মনযোগ আর অভ্যেস—এই দু'টোর সাহায্যেই একমাত্র এর পরিমার্জন সম্ভব। বার বার অভ্যেস করার ফলে, কতটা সোল্ডার মেটরিয়াল লাগবে, সে সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা জন্মাবে, যার ফলে অনেক চেষ্টা করলেও উঁচু ঢিবির মতো বা বলের মতো সোল্ডার করা সম্ভব হবে না। ভালো সোল্ডারিং করাটা তখন মনে হবে যেন একটা সহজাত গুণ।

সেন্সর

যে কোনো ইলেকট্রনিক যন্ত্রের কিছু শত্রু থাকে। প্রধান শত্রু অবশ্যই তাপমাত্রা (Temperature)। হঠাৎ করে যদি তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটে তাহলে খুব স্পর্শকাতর যন্ত্রাংশগুলো যেমন ট্র্যানজিস্টর, আই সি, ডায়োড তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ই, তাছাড়াও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সবকিছু এমনকি তারও। এছাড়াও বাতাসের আর্দ্র'তা (Humidity) অর্থাৎ বাতাসে জলকণার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও ইলেকট্রনিক যন্ত্রের চরম ক্ষতি হয়। এ কারণেই বর্ষাকালে ইলেকট্রনিক যন্ত্র বেশী নষ্ট হয়। আলোর মাত্রার বৃদ্ধি ঘটলেও তা'থেকে উৎপন্ন হতে পারে তাপ।

এইসব ইলেকট্রনিক্সের শত্রুদের হাত থেকে বাঁচার জন্যও ব্যবহার করা হয় ইলেকট্রনিক গার্ড। এরা আগে থেকেই সাবধান করে দেয় আমাদের। এদের বলে সেন্সর (Sensor)। সারা বিশ্বে কুড়ি হাজারেরও বেশী এই ধরনের সেন্সর পাওয়া যায়। তারা বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন রকমের শত্রুদের উদঘাটিত করে বা সঠিক মাত্রা নির্দিষ্ট করে দেয়। এখানে আমরা সেইসব সেন্সর নিয়েই আলোচনা করছি, যা' টেলিভিশনের সাথে সম্পর্কিত। বিদেশী টেলিভিশনে এগুলোর ব্যবহার অনেকদিন আগেই শুরু হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে এখানেও এর ব্যবহার শুরু হবে—এই ধারণা থেকেই তিনটে সেন্সর এর উল্লেখ করা হলো।

তাপমাত্রার সেন্সর—আমরা থার্মিস্টরের কথা আগেই আলোচনা করেছি। থার্মিস্টর আসলে একটা সেন্সর। এছাড়াও প্ল্যাটিয়াম ও রোডিয়াম ধাতুর মিশ্রিত অ্যালয় বা প্ল্যাটিনাম-রোডিয়াম ধাতুর মিশ্রিত অ্যালয় ধাতুর থার্মোকাপল্ (Thermocouple) করে এক ধরনের শলাকা তৈরী করা হয়। এগুলো খুবই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন হয় (1500°C)। কপার-কনষ্ট্যানটান বা আয়রন-কনষ্ট্যানটান থার্মোকাপলও ব্যবহার করা হয় কম তাপমাত্রা (500°C) মাপার জন্য।

ইনফ্রা-রেড সেন্সর দিয়েও তাপমাত্রা মাপা হয়। এই টেকনিককে বলে থার্মোগ্রাফি (Thermography)। তবে এটা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ, সাধারণতঃ বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরীর পর এই টেকনিকে তা' পরীক্ষা করা হয়।

আর্দ্র'তার সেন্সর—বিভিন্ন ধরনের আর্দ্র'তার সেন্সর পাওয়া যায়। তাদের কাজের প্রণালীও ভিন্ন। কিন্তু এখন বাজারে যেটা সবচেয়ে বেশী চলছে এবং যা ছোট ছোট যন্ত্রে সহজেই লাগানো যায় তা' হল এক বিশেষ ধরনের ক্যাপাসিটর। এই ক্যাপাসিটরের মধ্যবর্তী ডাইলেকট্রিক হিসেবে এমন পদার্থ ব্যবহার করা হয়, যা আর্দ্র'তা-অনুভূতি-সম্পন্ন। এখন আর্দ্র'তার পরিবর্তনের সাথে সাথেই ক্যাপাসিটরের ক্যাপাসিটেন্স পরিবর্তিত হয় এবং তা' সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় ইলেকট্রিক্যাল ভোল্টেজে।

আলোর সেন্সর—আলোর সেন্সর এর সাথে পরিচয় আমাদের হয়েই গেছে। ফোটো ডায়োড, ফোটো ট্র্যানজিস্টর হলো আলোর সেন্সর। এছাড়াও ফোটো ভ্যারিস্টর (Photo varistor) বা সোলার সেল (Solar cell) ও ব্যবহার করা হয়। এগুলো সবই তৈরী কিন্তু সেমিকনডাকটার পদার্থ সিলিকন থেকে।

আলোর সঙ্গে থাকে ফোটন (Photon) কণা। এই ফোটন কণা যখন সিলিকনের পারমাণবিক চক্র বা ভ্যালেন্স সেল'এ প্রবেশ করে তখন কিছু ইলেকট্রন কণাকে পরবর্তী অরবিটে ঠেলে দেয় এবং এভাবেই কিছু ইলেকট্রন মুক্ত হয়ে

সৃষ্টি করে তড়িৎপ্রবাহ। এই তড়িৎপ্রবাহ দিয়ে সহজেই কোন সঙ্কেত (Alarm) পাঠানো যায়, যা দিয়ে বোঝা যায় যন্ত্রটার ভেতরে কোনো আলোর উৎস সৃষ্টি হয়েছে।

এসব তো গেলো কিছু নিরাপত্তামূলক পার্টস। এবার একটা মজার জিনিষ শোনাই। ধরা যাক, টেলিভিশনের একটা অনুষ্ঠানে শেখানো হচ্ছে একটা বিশেষ পদ্ধতির মাংস রান্না আর সঙ্গে সঙ্গে যে ঘরে বসে আমরা টেলিভিশন দেখছি সেই ঘরটা স্বাদু মাংসের সুগন্ধে ভরপুর হয়ে উঠলো কিংবা টেলিভিশনের পর্দায় সিনেমা দেখতে দেখতে, একটা দৃশ্যে দেখা গেলো নায়ক, নায়িকাকে দিচ্ছে একগুচ্ছ লাল গোলাপ আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে বসেই আমরা পেলাম এক ঝলক তরতাজা গোলাপের গন্ধ। এও কী সম্ভব? এও সম্ভব করেছেন বিজ্ঞানীরা।
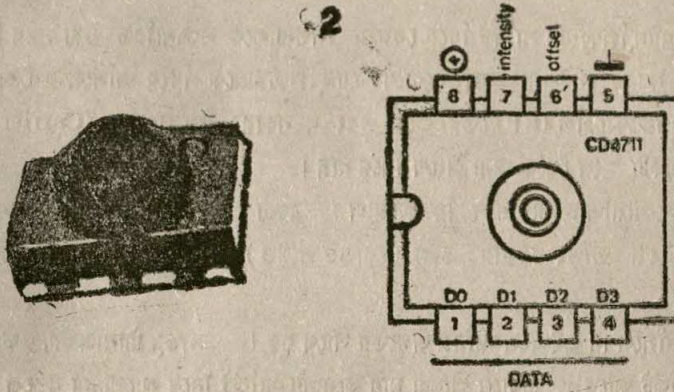
চিত্র ৯.১ অডার জেনারেটর (২) আইসি'র ব্লক ডায়াগ্রাম

Odorant Elektronik GmbH, কোলন (জার্মানী) থেকে সম্প্রতি এই ধরনের 'প্রোগ্রাম-কন্ট্রোলড্ অডার জেনারেটর' (Pogramme-controlled odour generator) লাগানো টেলিভিশন বাজারে ছেড়েছে। টেলিভিশনটা অবশ্য রঙিন-ষ্টিরিও সিষ্টেম-ত্রি-মাত্রিক। ওদের দাবী চারটে CMOS এবং TTL ডাটা ইনপুটের ফলে পনেরো রকমের সুগন্ধ ছড়াতে পারে এই টেলিভিশন। গোটা পৃথিবীকে বাসস্থানের ছোট্ট পরিসরের মধ্যেই বুঝি আস্তে আস্তে ধরে ফেলতে চান বিজ্ঞানীরা।
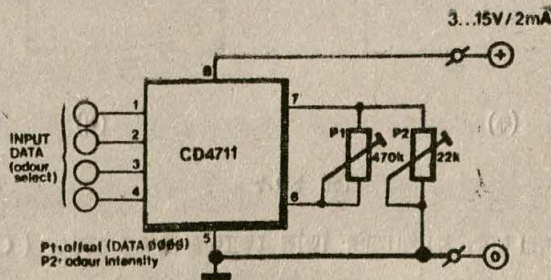
চিত্র ৯.২ অডার জেনারেটরের সার্কিট ডায়াগ্রাম

১০

অসিলেটর

অসিলেশন-এর সহজ অর্থ হলো 'দোলন। ঘড়ির পেণ্ডুলাম যখন দোলে, তখন আমরা বলতে পারি ওখানে অসিলেশন হচ্ছে।

আমরা দেখেছি এ্যাম্‌প্লিফায়ার সার্কিট দিয়ে কোনো সিগন্যালকে সম্প্রসারিত করা সম্ভব কিন্তু সেই সিগন্যালকে বহুদূরে পাঠানো সম্ভব নয়। সেইজন্য প্রয়োজনবোধে এ্যাম্‌প্লিফায়ারকে দিয়ে অসিলেটর তৈরী করে নেওয়া হয়। অসিলেটর একটা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি (RF) তৈরী করে এবং বহনকারী ফ্রিকোয়েন্সি (Carrier frequency) হিসেবে সিগন্যালকে বহন করে একটা অংশ থেকে অন্য অংশে নিয়ে যায়।

এই বহনকারী ফ্রিকোয়েন্সি হলো এসি ফ্রিকোয়েন্সি। একটা পরিবাহীর মধ্যে ইলেকট্রনের দ্রুত সামনে-পেছনে চলাচলের জন্য তৈরী হয় তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ (রেডিও ওয়েভ)—অসিলেটরের কাজ এই দ্রুত পরিবর্তনশীল এসি ফ্রিকোয়েন্সি সৃষ্টি করা।

বিভিন্ন ধরনের অসিলেশন এই ইলেকট্রনিক্স জগতের সাথে যুক্ত। ভালভ্‌, ট্র্যানজিস্টর, ক্রিষ্ট্যাল ইত্যাদির সাহায্যে নানারকম অসিলেটর সার্কিট আছে। এখানে আমরা মাত্র কয়েকটা সার্কিট নিয়ে আলোচনা করবো।

ট্যাঙ্ক সার্কিট অসিলেশন (Oscillation in tank circuit)

ট্যাঙ্ক সার্কিটে, একটা ক্যাপাসিটর এবং ইনডাকটর বা কয়েলকে সমান্তরালভাবে লাগিয়ে অসিলেশন-এর ব্যবস্থা করা হয়।
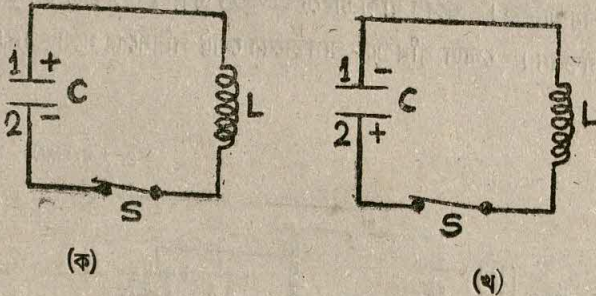
চিত্র ১০.১

চিত্র ১০.১ (ক) থেকে ধরা যাক, ক্যাপাসিটর ডিসি ভোল্টেজ থেকে চার্জড্‌ (Charged) হয়েছে এবং এখন ডিস্‌চার্জড্‌ (Discharged) হচ্ছে ইনডাকটর কয়েল L-এর মাধ্যমে। এটা সম্ভব হচ্ছে যখন সুইচ (S)-কে লাগিয়ে সার্কিট সম্পূর্ণ করা হচ্ছে।

আবার মনে করা যাক, ক্যাপাসিটরের 2নং প্লেট প্রাথমিকভাবে নেগেটিভ তড়িৎগ্রস্থ (Charged) এবং 1নং প্লেট পজেটিভ তড়িৎগ্রস্থ তাহলে 1 এবং 2নং প্লেটের মধ্যে তৈরী হয় একটা তড়িৎ ক্ষেত্র (Electric field)।

এখন, সুইচ (S)-কে অন্ (ON) করলে, অর্থাৎ তড়িৎবর্তনী (circuit) সম্পূর্ণ করলে, 2নং প্লেট থেকে ইলেকট্রন দ্রুত চালিত হয়ে কয়েল (L)-এর মধ্যে দিয়ে 1নং প্লেটে আসে। যখনই কয়েলের মধ্য দিয়ে তড়িৎ চালিত হয়, তার চারপাশে তৈরী হয় একটা চৌম্বক ক্ষেত্র (Magnetic field) এবং এর ফলে একটা বিপরীত তড়িৎ-চালক বল (Counter emf), তড়িৎপ্রবাহকে বাধা দেয়। এর ফলে, ক্যাপাসিটর থেকে ইলেকট্রন মুক্ত করার হার কমে যায়। এভাবেই যখন 2নং প্লেট থেকে সমস্ত ইলেকট্রন মুক্ত হয়ে যায়, তখনও ইলেকট্রন প্রবাহকে চালু রাখে কয়েল। এদিকে 2নং প্লেট তার ধরে রাখা অতিরিক্ত ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়া ছাড়াও নিজস্ব ইলেকট্রনও ছেড়ে দেয় এবং ধীরে ধীরে পজেটিভ তড়িৎগ্রস্থ হয়ে যায় এবং এই অতিরিক্ত ইলেকট্রন জমা হয় 1নং প্লেটে [চিত্র ১০.১(খ)]। মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয় এই প্রক্রিয়া যখন চৌম্বক ক্ষেত্রে জমে থাকা ইলেকট্রন, 1নং প্লেটে অতিরিক্ত ইলেকট্রন জমা করতে গিয়ে শেষ হয়ে যায়। সেই মুহূর্তে চৌম্বক ক্ষেত্র কিছুটা থমকে যায় কিন্তু এর মধ্যেই ক্যাপাসিটর নতুনভাবে তড়িৎগ্রস্থ হয়ে গেছে এবং এবার ঠিক বিপরীত দিকে অর্থাৎ 1নং প্লেট নেগেটিভ তড়িৎগ্রস্থ এবং 2নং প্লেট পজেটিভ তড়িৎগ্রস্থ। এখন কিন্তু 1নং প্লেট থেকে কয়েলের মধ্যে দিয়ে 2নং প্লেটে ইলেকট্রন চালিত হয়।

এইবার আগের প্রক্রিয়াই চলে বিপরীত দিক থেকে। সাইকল্ (cycle) সম্পূর্ণ হয় যখন ক্যাপাসিটর আবার প্রথম অবস্থায় [চিত্র ১০.১ (ক)] ফিরে আসে।

এইভাবে ইলেকট্রন গ্রহণ ও বর্জনের ফলে তৈরী হয় একটা পরিবর্তী ইলেকট্রন প্রবাহ বা একটা অসিলেটিং তড়িৎপ্রবাহ (Oscillating current)। প্রতিটা সাইকল্-এ কিছু অংশপ্রদানকারী শক্তি, কয়েলের মধ্য দিয়ে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। এভাবেই অসিলেটিং তড়িৎপ্রবাহ একেবারে বন্ধ হয় যখন সমস্ত শক্তিই, তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

ট্যাঙ্ক সার্কিটে অসিলেশনের ফ্রিকোয়েন্সি, ক্যাপাসিটেন্স এবং ইনডাকটেন্সের সাথে ব্যাস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়। তাই স্বাভাবিক অসিলেশন ফ্রিকোয়েন্সির সূত্র হলো,

$$f=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

যখন f = ফ্রিকোয়েন্সি (সাইকল প্রতি সেকেণ্ডে)

L = ইনডাকটেন্স (হেনরী)

C = ক্যাপাসিটেন্স (ফ্যারাড)

$\pi = 3{\cdot}1416$ (ধ্রুবক)

L-C টিউনড্ কলপিটস্ অসিলেটর (L-C Tuned Colpitts Oscillator)

চিত্র ১০.২-এ L-C ট্যাঙ্ক সার্কিট ব্যবহার করে তৈরী কলপিটস্ অসিলেটর সার্কিটের ডায়াগ্রাম আঁকা হয়েছে। এখানে কয়েল L1 এবং দু'টো ক্যাপাসিটর C1 ও C2 দিয়ে তৈরী করা হয়েছে ট্যাঙ্ক সার্কিট। ক্যাপাসিটর C1 আছে বেস সার্কিটে এবং ক্যাপাসিটর C2 আছে কালেকটর সার্কিটে। যার ফলে এসি ভোল্টেজ, দু'টো ক্যাপাসিটরের মধ্যেই ভাগ হয়ে যাচ্ছে।

C1 থেকে যে এসি ভোল্টেজ তৈরী হচ্ছে, তা' কাপলিং ক্যাপাসিটরের মধ্যে দিয়ে প্রয়োগ করা হচ্ছে ট্রানজিস্টরের বেস-এ এবং এর ফলস্বরূপ যে কালেকটর সিগন্যাল পাওয়া যাচ্ছে তা ক্যাপাসিটর C4 এর মাধ্যমে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটর C2তে।
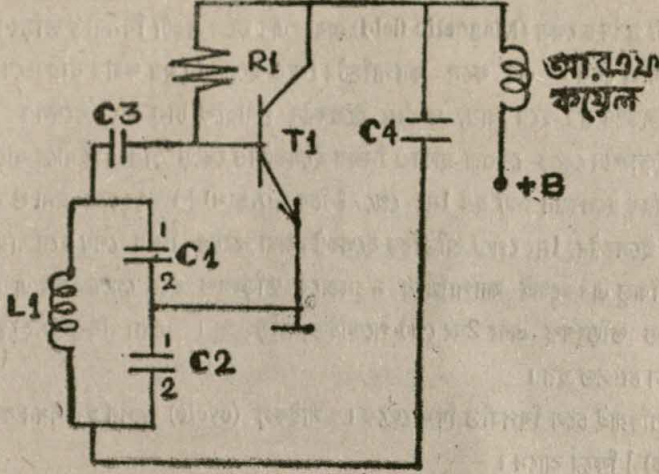
চিত্র ১০.২ L-C টিউনড্ কলপিটস্ অসিলেটর

এই পুনরায় ফিরিয়ে আনা (Feed back)-র ফলে C2-তে ভোল্টেজ উৎপন্ন হচ্ছে। এখন ক্যাপাসিটর C1-এর 1 নং প্লেট এবং ক্যাপাসিটর C2-র 2 নং প্লেটকে সবসময় বিপরীতভাবে তড়িৎগ্রস্থ হতেই হবে, তাহলেই এই সার্কিটের মাধ্যমে অসিলেশন সম্ভব।

ক্রিষ্ট্যাল অসিলেটর (Crystal Oscillator)

যে অসিলেটর সার্কিটে খুব বেশী ফ্রিকোয়েন্সির স্থিতিশীলতা দরকার, সেখানেই ব্যবহার হয় এই ক্রিষ্ট্যাল অসিলেটর। L-C অসিলেটরের চেয়ে, ক্রিষ্ট্যাল অসিলেটর অনেক বেশী উচ্চ স্থিতিস্থাপক। L-C অসিলেটরের ব্যবহার ব্যাপকভাবে হয়, কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সির চরম স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে L-C অসিলেটরের ব্যবহার মোটেই খুব সন্তোষজনক নয়।

ক্রিষ্ট্যাল অসিলেটর সাধারণতঃ তৈরী হয় কোয়ার্জ (Quartz) নামক প্রধান ফ্রিকোয়েন্সি নির্ধারক (Frequency determining) পদার্থ দ্বারা। কোয়ার্জ শব্দটা আমাদের কাছে বেশ পরিচিত শব্দ। এই ক্রিষ্ট্যাল ব্যবহার করে এখন ভারতেও প্রচুর ঘড়ি তৈরী হচ্ছে।

অন্য অনেক ক্রিষ্ট্যালের মতো কোয়ার্জ ক্রিষ্ট্যালেও পিজোইলেকট্রিক এফেক্ট পাওয়া যায় তাই একেও পিজো-ইলেকট্রিক ক্রিষ্ট্যাল বলা হয়।

এখন মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে যে এই পিজোইলেকট্রিক এফেক্ট ব্যাপারটা কী? মনে আছে নিশ্চয়ই, 'স' ফিলটার (SAW filter) নিয়ে আলোচনা করার সময় এই পিজোইলেকট্রিক এফেক্ট নিয়ে সামান্য কিছু আলোচনা

করা হয়েছিলো। আরো একটু গভীরভাবে বলতে গেলে বলা যায়, যদি কোনো যান্ত্রিক চাপ (Mechanical pressure), এই পিজোইলেকট্রিক ক্রিস্ট্যালের ওপর দেওয়া যায়, তাহলে সেই ক্রিস্ট্যালের দুই মুখে, দুই বিপরীত মেরুর তড়িৎ-আধান (Positive and Negetive polarity) সৃষ্টি হয় এবং ঠিক বিপরীতধর্মী আরো একটা যান্ত্রিক চাপ যদি ঐ ক্রিস্ট্যালে দেওয়া হয়, তাহলে ঐ ক্রিস্ট্যালের দুই মুখের তড়িৎ মেরুও বদলে যায়।

এইবার, যদি ঐ ক্রিস্ট্যালটার ওপর ক্রমান্বয়ে দুই দিক থেকে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ক্রমান্বয়ে যান্ত্রিকভাবে চাপ দেওয়া হয়, তাহলে একটা এসি ফ্রিকোয়েন্সি সহজেই পাওয়া যাবে।

বিপরীতক্রমে, যদি ঐ ক্রিস্ট্যালের কোনো মুখে, এসি ভোল্টেজ দেওয়া হয়, ক্রিস্ট্যালটা যান্ত্রিকভাবে স্পন্দিত (Mechanically vibrated) হয়। যখন এসি ভোল্টেজটা তুলে নেওয়া হয়, ঐ স্পন্দনটা কিন্তু একেবারেই কমে আসে না। যান্ত্রিক স্থিতিজাড্য (Inertia of motion)-র কারণে এই স্পন্দন ধীরে ধীরে ক্ষীণতর হয়ে শূন্যাতে নেমে আসে। এখন, এই ধীরে ধীরে কমে আসাকে যদি যথেষ্ট তড়িৎশক্তির মাধ্যমে দূর করা যায় তাহলেই কিন্তু এই ক্রিস্ট্যাল এসি ভোল্টেজের তরঙ্গ সৃষ্টি করে।
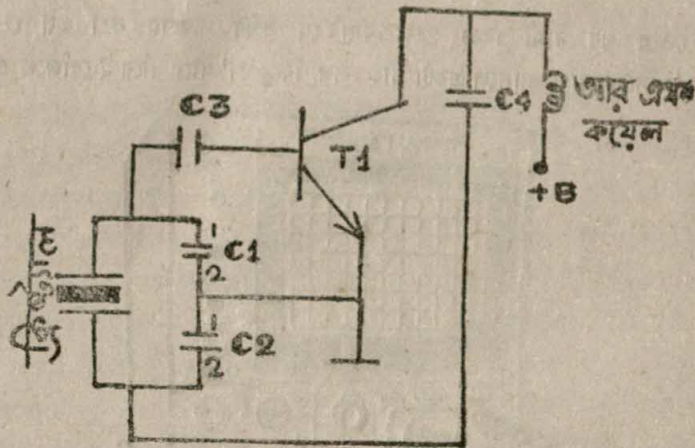
চিত্র ১০.৩ ক্রিস্ট্যাল অসিলেটর

একটা কোয়ার্জ ক্রিস্ট্যালের ফ্রিকোয়েন্সি নির্ভর করে সেই ক্রিস্ট্যালের ওপর আরোপিত সময় সাপেক্ষে যান্ত্রিক চাপ বা যান্ত্রিক ফ্রিকোয়েন্সির ওপর। ক্রিস্ট্যালের স্বাভাবিক ফ্রিকোয়েন্সি নির্ভর করে তার পুরুত্ব (Thickness)-র ওপর। অসিলেটরের ক্ষেত্রে, ক্রিস্ট্যালের স্লাইস (Slice ; পাতলা ও চওড়া ফালি) ব্যবহার করা হয়। ক্রিস্ট্যাল যত পাতলা হয়, ততই অনুনাদী (Resonant) ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ে—সহজ বাংলায় যার অর্থ স্পন্দন বাড়ে।

ক্রিস্ট্যালের ওপর তাপমাত্রার হেরফের কিন্তু তার আউটপুটে যথেষ্ট তারতম্য আনে। কিছু ক্রিস্ট্যাল পদার্থ তাপমাত্রার তফাৎ হলে দৈর্ঘ্যে বেড়ে বা কমে যায়, যার ফলে ফ্রিকোয়েন্সির তফাৎ ঘটে।

ক্রিস্ট্যাল তখনই সার্কিটে কার্যকরী হয় যখন তাকে তার ধারক (Holder) এর মধ্যে দেওয়া হয়। দু'টো ধাতব ইলেকট্রোডের মধ্যে ক্রিস্ট্যালটা দিয়ে ক্যাপাসিটরের কাজ করানো হয়। ক্রিস্ট্যালের ব্যবহার তখন ডাইলেকট্রিক (Dielectric ; যে পদার্থ ক্যাপাসিটরের মধ্যে দেওয়া হয় যেমন পেপার, মাইকা ইত্যাদি) এর মতো। ক্রিস্ট্যাল ধারক,

ক্রিস্টালকে মজবুত করে নিজের মধ্যে ধরে রাখে। এটা বিভিন্ন উপায়ে করা হয়। কিছু ধারকের দু'টো ইলেকট্রোডের মধ্যে ক্রিস্টালকে চেপে দেওয়া হয়। কিছু ক্ষেত্রে ইলেকট্রোড দু'টো এবং ক্রিস্টালটার মধ্যেখানে থাকে ফাঁকা এয়ার গ্যাপ। এই এয়ার গ্যাপের মাপ, ক্রিস্টালের উপর চাপ এবং কনটাক্ট প্লেটের আয়তনের ওপর ফ্রিকোয়েন্সি তৈরীর ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন নির্ভরশীল। যার ফলে এগুলোর দ্বারা কিছু মাত্রায় ফ্রিকোয়েন্সির উপর নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব।

এই ক্রিস্টালকে অনেক অসিলেটর সার্কিটেই ব্যবহার করা হয়। চিত্র ১০.৩ এ ক্রিস্টাল ব্যবহৃত কলপিটস্ অসিলেটর সার্কিট দেখানো হয়েছে।

কলপিটস্ অসিলেটর সার্কিটে, ট্যাঙ্ক সার্কিটের বদলে ক্রিস্টাল ব্যবহার করা যায়। ক্রিস্টালই, অসিলেটরের ফ্রিকোয়েন্সি স্থির করে। ক্যাপাসিটর C1 ও C2, কালেক্টর এবং বেস এর ভোল্টেজকে বিভক্ত করে। এই দুই ক্যাপাসিটরের ওপরেই ফিডব্যাকের পরিমাণ নির্ভর করে। ক্রিস্টাল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কলপিটস্ অসিলেটর সার্কিট খুবই স্থিতিশীল।

অসিলোস্কোপ

ইলেকট্রনিক ক্ষেত্রে খুব দামী কিন্তু প্রয়োজনীয় যে যন্ত্রটা ব্যবহার করা হয় সেটা হলো অসিলোস্কোপ (Oscilloscope)। 'অসিলোস্কোপ' আসলে একটা গ্রীক শব্দ, কিন্তু তা' ধীরে ধীরে ইংরেজিতে চলে এসেছে, যার সঠিক
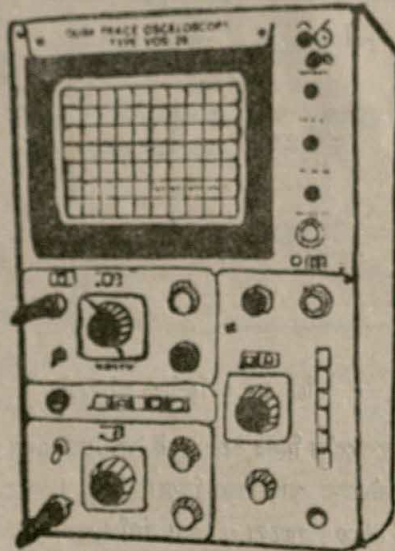
চিত্র ১০.৪ অসিলোস্কোপ

বাংলা করলে দাঁড়ায় 'এমন একটি যন্ত্র, যার সাহায্যে অসিলেশন বা দোলন দৃশ্যমান হয়।' শুনতে একটু জটিল লাগলেও আসলে এটা অতটা জটিল নয়। এর কাজ হলো সময় সাপেক্ষে ভোল্টেজ লেখ চিত্রের (Graph) মাধ্যমে বিভিন্ন তরঙ্গ দেখানো এবং এই দেখানোর কাজটা ঘটে অসিলোস্কোপের নিজস্ব স্ক্রীনে।

১০.৪ নং চিত্রে অসিলোস্কোপের ছবি দেওয়া হলো। এর প্রধান অংশ হলো পিকচার টিউব বা ক্যাথোড রে টিউব

(CRT)। টেলিভিশনের থেকে এর পিকচার টিউবের আকৃতিগত পার্থক্য আছে। কিছুটা লম্বা, গোলাকৃতি এই টিউবের ভেতরেই থাকে ডিফ্লেকশন প্লেটগুলো। ভার্টিকাল দু'টো প্লেট এবং হরাইজেন্টাল দু'টো প্লেট মিলে স্ক্রীনের গ্রাফকে যথাক্রমে হরাইজেন্টাল (X-axis) এবং ভার্টিকাল (Y-axis) লাইন দেয়।

বাজারে অনেক ধরনের অসিলোস্কোপ পাওয়া যায় এবং তাদের প্রত্যেকটাই স্বতন্ত্র। সামনের প্যানেলের লে-আউট (Lay-out) আলাদা করে তাই বিশ্লেষণ করা মুশকিল। অসিলোস্কোপের সাথে যে সহায়ক পুস্তিকা (Manual) দেওয়া হয় তা'তেই সবকিছু বিশদভাবে লেখা থাকে। অসিলোস্কোপ দু'ধরনের :

(1) এক-চ্যানেল অসিলোস্কোপ (2) দুই-চ্যানেল অসিলোস্কোপ।

এক চ্যানেলে ইনপুট হিসেবে একটাই তরঙ্গ দেখা যায় কিন্তু দুই-চ্যানেলের ক্ষেত্রে একসাথে দু'টো তরঙ্গ দেখা যায় এবং তুলনামূলক পার্থক্যও বিশ্লেষণ করা যায়। দু'ই চ্যানেলে ইনপুট এবং আউটপুট তরঙ্গকেও একসাথে দেখা যায়।

এছাড়াও থাকে উজ্জ্বলতার জন্য ব্রাইটনেস (Brightness) এবং পরিষ্কার বীমের জন্য ফোকাস (Focus) কন্ট্রোল।

এ্যাটেনুয়েটর (Attenuator) কন্ট্রোল দিয়ে লেখচিত্রকে কম করা যায় এবং এর সাহায্যে বোঝা যায় গ্রাফের 1 সেন্টিমিটারের ক্ষেত্রে আমরা ঠিক কত ভোল্ট বা মিলি ভোল্ট ধরবো।

Y-পজিশন নব (Knob) দিয়ে লেখচিত্রকে ওপরে ও নিচে এবং X-পজিশন নব্ দিয়ে লেখচিত্রকে পাশাপাশি সরানো যায়।

এছাড়াও থাকে নানাবিধ নব্, যা'দের প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা ভূমিকা আছে।

অসিলোস্কোপ প্রচণ্ড দামী পরীক্ষা করার যন্ত্র। সাধারণ মানুষ বা টেকনিশিয়ানের কাছে তা' প্রায় বিলাসিতার সামগ্রী। এছাড়াও অসিলোস্কোপের সূক্ষ্ম এবং জটিল ব্যবহার-প্রণালীর কথা ভেবেই অনেকে একে পরিহার করে চলে। অসিলোস্কোপ দামী কিন্তু ভয়ের সামগ্রী নয়। এর সাহায্যে বিভিন্ন তরঙ্গ মাপার জন্য মোটেই খুব বেশী কষ্ট করতে হয় না। টেকনিশিয়ানদের মনের এই ভুল ধারণা ভাঙতেই এখানে অসিলোস্কোপের আলোচনা করা হলো। সুযোগ থাকলে এর ব্যবহার প্রত্যেক টেকনিশিয়ানেরই জেনে রাখা উচিৎ। টেলিভিশন সারানোর সময়, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন মাঝে মাঝে হয়। কোনো সার্কিটের বিশেষ একটা যন্ত্র কিছুটা দুর্বল হয়ে গেলে অনেক সময় মাল্টিমিটারে তা' ধরা যায় না কিন্তু তার ফলে আউটপুট ভোল্টেজে যে তারতম্য ঘটে তা'তে ক্ষতিগ্রস্থ হয় পরবর্তী অংশ। এইসব ক্ষেত্রে অনেক সময় হাতের কাছে অসিলোস্কোপ থাকলে সহজেই আউটপুট ভোল্টেজের তারতম্য চোখে পড়ে এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে দুর্বল যন্ত্রটাকে বাদ দিয়ে সার্কিটটাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়।

অসিলোস্কোপ প্রচণ্ড দামী যন্ত্র, তবে তার মধ্যে একটা ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট টেলিভিশনের অভ্যন্তরীন সবকিছুই প্রায় থাকে। তাই ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট টিভির সাথে একটা এ্যামপ্লিফায়ার সার্কিট লাগিয়ে ইচ্ছে করলে কিছু ভোল্টেজের তরঙ্গ টিভি স্ক্রীনে পাওয়া যেতে পারে। এই অতিরিক্ত সার্কিটটার জন্য দরকার একটা অতিরিক্ত পাওয়ার সাপ্লাই (12V DC), তবে অসিলোস্কোপের সমস্ত সুবিধা কখনোই এভাবে পাওয়া সম্ভব নয়।

ভিডিও প্যাটার্ন জেনারেটর (Video Pattern Generator).

অসিলোস্কোপ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, অসিলোস্কোপ ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন সিগন্যাল তরঙ্গকে পরীক্ষা করার জন্য। কিন্তু, প্রচণ্ড দামী এই যন্ত্র কেনা সাধারণ টেকনিশিয়ানের পক্ষে সম্ভব নয়। এই যন্ত্র

ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন টেলিভিশন তৈরীর কারখানায় এবং অন্য বৃহত্তর ইলেকট্রনিক্স ফ্যাক্টরীগুলোতে। তবে, টেলিভিশন
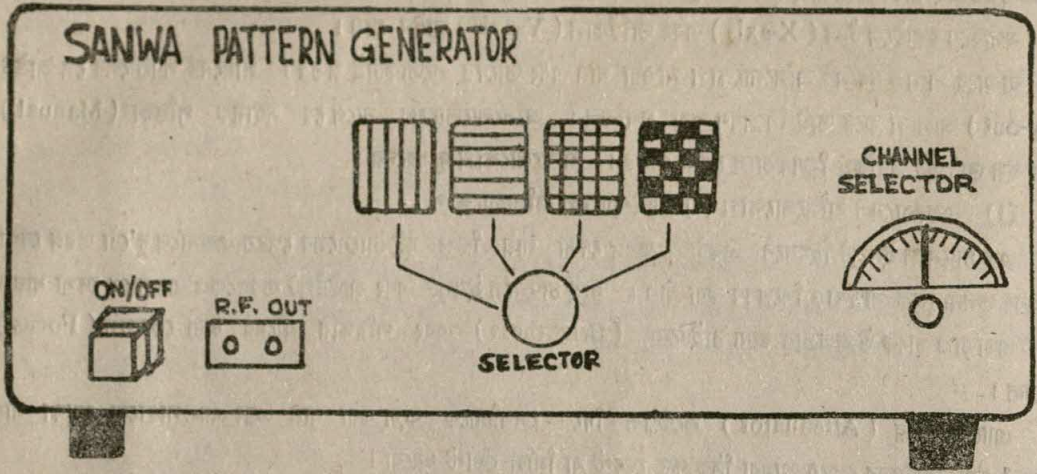
চিত্র ১০.৫ প্যাটার্ন জেনারেটর

সেটকে পরীক্ষা করার জন্য আরো একটা যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, যার দাম মোটেই আকাশছোঁয়া নয় এবং সহজেই পাওয়া যায়। সেই যন্ত্রটার নাম হলো প্যাটার্ন জেনারেটর।
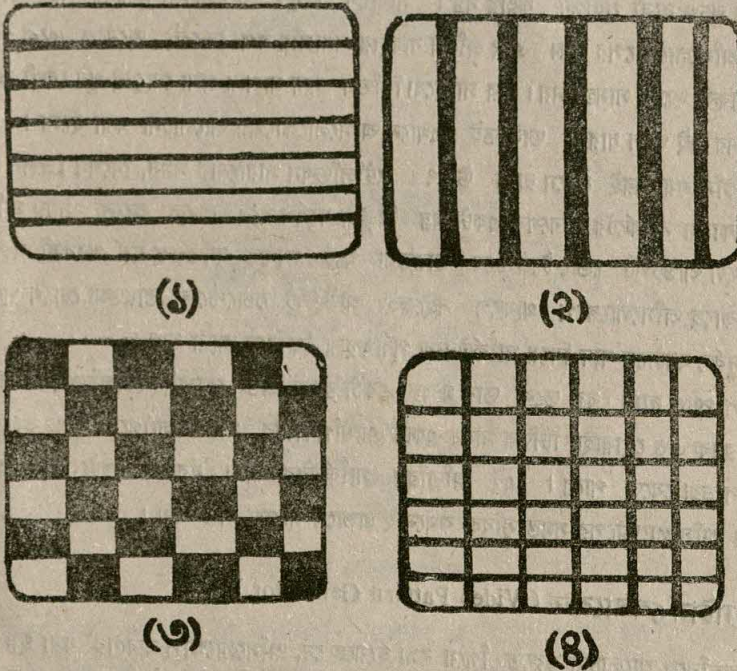
চিত্র ১০.৬ (১) হরাইজেন্টাল বার (২) ভার্টিকাল বার (৩) চৌখুপ্পী-বোর্ড (৪) ক্রশ হ্যাচ্

যখন টেলিভিশন ট্রান্সমিশন সেন্টার বা টিভি ষ্টেশন থেকে কোনো অনুষ্ঠান সম্প্রসারিত হয় না তখনই এই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে যখন টিভি সেন্টার বন্ধ থাকে তখনও সহজেই টেলিভিশনের বিভিন্ন অংশের ফল্ট সারিয়ে ফেলা যায়। চিত্র ১০.৬-এপ্যাটার্ন জেনারেটরের বিভিন্ন জ্যামিতিক প্যাটার্ন-এর ছবি দেওয়া হলো।

প্যাটার্ন জেনারেটরের সাহায্যে রেডিও সিগন্যাল—সরাসরি এবং আর এফ মডিল্যুশন সহ, রিসিভার সেটে কৃত্রিমভাবে তৈরী করা সম্ভব। এই সিগন্যাল টিভির জন্য নির্দিষ্ট চ্যানেলেই পাওয়া যায়, যার সাহায্যে সঠিকভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা (Alignment), পরীক্ষা এবং সার্ভিসিং করা যায়। এই জেনারেটরের আউটপুট এমনভাবে রিসিভার সেটের স্ক্রীনে জ্যামিতিক প্যাটার্ন তৈরী করে ; যেমন ভার্টিকাল এবং হরাইজেন্টাল বার, চৌখুপ্পী-বোর্ড (Chequer-Board), ক্রশ-হ্যাচ্, বিন্দুসমষ্টি ইত্যাদি, যার সাহায্যে রৈখিকতা (Linearity) এবং রেডিও এ্যামপ্লিফায়ার বিন্যস্ত বা নিয়ন্ত্রিত করা যায়।

এছাড়াও ক্যারিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি (5·5 MHz) সহ এফ এম সাউণ্ড ফ্রিকোয়েন্সিও তৈরী করে এই জেনারেটর, যার সাহায্যে শব্দও বিন্যস্ত করা যায় এবং সাউণ্ড সেকসনও পরীক্ষা করা যায়। এর ফলে আর এফ এবং আই এফ অংশে ও ডিসক্রিমিনেটর সার্কিটে পরীক্ষা করা সম্ভব হয়।

একটা 75/300 ওহম VHF* বেল্যুন (Balun) ও প্যাটার্ন জেনারেটরে থাকে।

ভ্যাকুয়াম টিউব ভোল্টমিটার (Vacuum Tube Voltmeter or VTVM)

অতি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির এসি ভোল্টেজ এবং উচ্চ রেজিস্টেন্স এর বিপরীতে থাকা ডি সি ভোল্টেজ মাপার কাজে এই ভ্যাকুয়াম টিউব ভোল্টমিটার খুবই বিশ্বস্ত ভূমিকা নেয় কারণ এই ভোল্টমিটারের ইনপুট ইমপিডেন্স অনেক বেশী। প্রধানতঃ দু'ধরণের VTVM পাওয়া যায়। সেগুলো হলো,

(1) রেকটিফায়ার-অ্যাম্প্লিফায়ার টাইপ

(2) অ্যাম্প্লিফায়ার-রেকটিফায়ার টাইপ,

রেকটিফায়ার-অ্যামপ্লিফায়ার টাইপে সাধারণ অবস্থায় 50 MHz অবধি ফ্রিকোয়েন্সি মাত্রার এসি ভোল্টজ সহজেই মাপা যায়। বিশেষ প্রব্ (Probe) ব্যবহার করে 100 MHz অবধি ফ্রিকোয়েন্সির এসি ভোল্টেজও মাপা যায়।

ডিসি ভোল্টেজ মাপার জন্য একটা বিশেষ প্রব্ ব্যবহার করতে হয়। একটা এসি/ডিসি সিলেকটর সুইচ্ দিয়ে এসি থেকে ডিসিতে মিটারকে পরিবর্তিত করে নিতে হয়। এই টাইপে এসি/ডিসি—উভয় ভোল্টেজই মাপা যায়। এ ছাড়াও এই টাইপের মিটারে যে কোনো রেজিস্টেন্সও মাপা যায়। তবে এটা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে এই রেজিস্টেন্স স্কেল কিন্তু সাধারণ মাল্টিমিটারের বিপরীত হয় অর্থাৎ বাঁদিক থেকে ডানদিকে ক্রমশঃ রেজিস্টরের মান অনুযায়ী বাড়তে থাকে।

অ্যামপ্লিফায়ার-রেকটিফায়ার টাইপে কিন্তু সাধারণ অবস্থায় 10 MHz-এর বেশী ফ্রিকোয়েন্সিসম্পন্ন এসি ভোল্টেজ মাপা যায় না এবং ডিসি ভোল্টেজ এবং রেজিস্টেন্সও মাপা যায় না।

*VHF—নিয়ে পরে এ্যান্টেনা অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

১১

এ্যাম্প্লিফায়ার

এ্যাম্প্লিফায়ার শব্দটা ইলেকট্রনিক্স জগতের একটা বহুল ব্যবহৃত এবং প্রচলিত শব্দ। এ্যাম্প্লিফায়ারের আক্ষরিক বাংলা হলো সম্প্রসারণ। কিন্তু এই সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই বুঝতে ভুল হয়ে যায়।

একটা এ্যাম্প্লিফায়ার সার্কিটে যখন কোন সিগন্যালকে দেওয়া হয়, তখন তরঙ্গ-বিস্তার (Amplitude) বেড়ে যায় এবং এই বৃদ্ধির ফলে সেই তরঙ্গর অন্যান্য চারিত্রিক গুণগুলো (Characteristic) ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। এখন, এ্যাম্প্লিফায়ার কথাটার সাথে জড়িয়ে আছে গেইন (Gain), ব্যাণ্ডউইডথ্ (Bandwidth) এবং ডিস্‌টরশন বা বিকৃতিকরণ (Distortion)।

গেইন্ (Gain)

এই শব্দটা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়। এ্যাম্প্লিফায়ারের ক্ষেত্রে 'গেইন'-এর অর্থ, এই এ্যাম্প্লিফায়ার সার্কিটের মাধ্যমে কতটা সম্প্রসারণ (Amplification) সম্ভব। আসলে, অঙ্কের নিয়মে এটা হলো আউটপুট তরঙ্গ বিস্তার এবং ইনপুট তরঙ্গ বিস্তারের একটা অনুপাত।

যদিও অনুপাতের ক্ষেত্রে কোন একক থাকে না। তবুও মাঝে মাঝে 'গেইন'-কে ডেসিবল্ (Decibel or db)-এ বলা হয়।

$$\text{গেইন} = \frac{\text{আউটপুট পাওয়ার (ওয়াট)}}{\text{ইনপুট পাওয়ার (ওয়াট)}} = \frac{P_2}{P_1}$$

ব্যাণ্ডউইডথ্ (Bandwidth)

ব্যাণ্ডউইডথ্ হলো সিগন্যাল ফ্রিকোয়েন্সির নির্দিষ্ট বিস্তার-এর সীমাবদ্ধতা, যার মধ্যে এ্যাম্প্লিফায়ার গেইন অপেক্ষাকৃত ধ্রুবক মাত্রায় পাওয়া যায়। আরো সহজভাবে বললে একটা ব্যাণ্ডের সর্বোচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি এবং সর্বনিম্ন ফ্রিকোয়েন্সির যে নির্দিষ্ট মাত্রা বেঁধে দেওয়া থাকে, ব্যাণ্ডউইডথ্ তাদের মধ্যেকার ব্যবধান, যেখানে গেইন সর্বোচ্চ গেইন-এর 0·707 গুণ।

এ্যাম্প্লিফায়ারের গেইন, সমস্ত ইনপুট সিগন্যালের ক্ষেত্রেই সমান বা ধ্রুবক নয়—এটা আমরা আগেই জেনেছি। গেইন সম্পূর্ণভাবেই ইনপুট সিগন্যালের ওপর নির্ভরশীল তাই সমান তরঙ্গ বিস্তার (Amplitude)-এর বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি, একই এ্যাম্প্লিফায়ারে বিভিন্ন মাত্রায় সম্প্রসারিত হয়।

ডিস্‌টরশন (Distortion)

এ্যাম্প্লিফায়ারের ক্ষেত্রে, বাস্তবিকভাবে ইনপুট তরঙ্গ এবং আউটপুট তরঙ্গের তরঙ্গ চিত্রটা এক হয় না। কিছুটা পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনকেই বলে ডিসটরশন, যার আক্ষরিক বাংলা অর্থ দাঁড়ায় বিকৃতিকরণ।

তিন ধরনের ডিস্‌টরশন পাওয়া যায়ঃ ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্‌টরশন (Frequency distortion), ফেজ্ ডিস্‌টরশন (Phase distortion) এবং তরঙ্গ-বিস্তার ডিস্‌টরশন (Amplitude distortion)।

প্রাক-এ্যাম্প্লিফায়ার (Pre-Amplifier)

একটা এ্যাম্প্লিফায়ার অংশের আগে বসে এই প্রাক-এ্যাম্প্লিফায়ার। প্রধানতঃ এটা ভোল্টেজ সম্প্রসারিত করে এবং পরবর্তী এ্যাম্প্লিফায়ার অংশের ইনপুটে একটু উচু ভোল্টেজ দিতে সাহায্য করে।

অডিও এ্যাম্প্লিফায়ার (Audio Amplifier)

অডিও এ্যাম্প্লিফায়ার 20 Hz থেকে 20,000 Hz অবধি শব্দ-তরঙ্গকে সম্প্রসারিত করে।

দু'ভাবে শব্দকে সম্প্রসারিত করা হয়। প্রথমতঃ অডিও ভোল্টেজ এ্যাম্প্লিফায়ার এবং দ্বিতীয়তঃ অডিও আউটপুট এ্যাম্প্লিফায়ার।

ভোল্টেজ এ্যাম্প্লিফায়ারের ক্ষেত্রে সিগন্যাল-ভোল্টেজের একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ তরঙ্গ-বিস্তার (Amplitude)-এর সম্প্রসারণ ঘটে। আউটপুট পাওয়ার এ্যাম্প্লিফায়ারে, পাওয়ার-এর বেশ বড় ধরনের সম্প্রসারণ ঘটে।

যে অডিও সিস্টেমে, সমস্ত ব্যাণ্ডউইডথ-এই মোটামুটি প্রয়োজনীয় একটা সঠিক এবং ধ্রুবক আউটপুট পাওয়া যায়, সেই সিস্টেমকে বলে হাই-ফাইডেলিটি বা হাই-ফাই (High-fidelity or Hi-Fi)। অনেক অডিও সিস্টেমের গায়েই এই শব্দটা লেখা থাকে। এই Hi-Fi-এর জন্য সার্কিটকে বিশেষভাবে ডিজাইন করতে হয়।

ভিডিও এ্যাম্প্লিফায়ার (Video Amplifier)

ভিডিও এ্যাম্প্লিফায়ার 20 সাইকল/সেকেণ্ড থেকে 4 মেগা সাইকল/সেকেণ্ড অবধি তরঙ্গকে সম্প্রসারিত করে।

ভিডিও এ্যাম্প্লিফায়ারকে, অডিও এ্যাম্প্লিফায়ারের চেয়ে অনেক বেশী ফ্রিকোয়েন্সি নির্ভর কম্পোনেন্ট (component)-এর ব্যাপক ফ্রিকোয়েন্সি-বিস্তৃতি (Frequency range)-কে সম্প্রসারিত করতে হয়। ব্যাণ্ডউইডথ্-এর ব্যপ্ততার জন্য তাই বিভিন্ন ধরনের অসুবিধার মধ্যেও ভিডিও এ্যাম্প্লিফায়ারকে পড়তে হয়।

রেডিও-ফ্রিকোয়েন্সি এ্যামপ্লিফায়ার (R. F. Amplifier)

ভিডিও এ্যাম্প্লিফায়ারের মতো বিশাল ফ্রিকোয়েন্সি-বিস্তৃতি নিয়ে আর-এফ এ্যাম্প্লিয়ারকে কাজ করতে হয় না। খুব নীচু ব্যাণ্ডের রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি নিয়েই আর এফ এ্যাম্প্লিফায়ার তরঙ্গ সম্প্রসারিত করে। যখন বিভিন্ন ধরনের ফ্রিকোয়েন্সিকে আর এফ এ্যাম্প্লিফায়ারের ইনপুটে দেওয়া হয়, তখনও কিন্তু আউটপুট হিসেবে সেই সব নীচু ব্যাণ্ডের ফ্রিকোয়েন্সিই পাওয়া যায়—যার মধ্যে আর এফ এ্যাম্প্লিফায়ারের ফ্রিকোয়েন্সি বিস্তৃতি সীমাবদ্ধ। এই কারণে ফ্রিকোয়েন্সি-নির্বাচক এ্যাম্প্লিফায়ার (Frequency Selecting Amplifier) হিসেবেও আর এফ এ্যাম্প্লিফায়ারকে ব্যবহার করা হয়।

এমিটার-ফলোয়ার এ্যাম্প্লিফায়ার (Emitter-follower Amplifier)

এই এ্যাম্প্লিফায়ার প্রধানতঃ ইম্পিডেন্স ম্যাচিং-এর কাজে ব্যবহার করা হয়। এই সার্কিটে, উচ্চহারের ইনপুট ইম্পিডেন্স এবং নীচু হারে আউটপুট ইম্পিডেন্স পাওয়া যায়। এই কারণে উচ্চ ইম্পিডেন্স সোর্স থেকে নীচু ইম্পিডেন্সের লোডের ম্যাচিং বা সঠিক ও মসৃণভাবে যোগাযোগ ঘটানোর কাজে এই সার্কিট ব্যবহার করা হয়।

বাফার এ্যাম্প্লিফায়ার (Buffer Amplifier)

অসিলেটর সার্কিট এবং তার পরবর্তী সার্কিটের মাঝখানে এই বাফার এ্যাম্প্লিফায়ার ব্যবহার করা হয়। অসিলেটর এবং তার পরবর্তী সার্কিটের মধ্যে কোনো মধ্যবর্তী-প্রতিক্রিয়াকে আটকানোর জন্য এই এ্যাম্প্লিফায়ার ব্যবহার করা হয় ; যা অসিলেটরকে আলাদা করে দেয়। কারণ, এই মধ্যবর্তী-প্রতিক্রিয়া ঘটলে অসিলেটর থেকে উৎপন্ন ফ্রিকোয়েন্সি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

বাফার এ্যাম্প্লিফায়ারে কিছুটা সম্প্রসারণও ঘটে, তবে তা' ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

পুশ-পুল এ্যাম্প্লিফায়ার (Push-Pull Amplifier)

পুশ-পুল এ্যাম্প্লিফায়ারে, দু'টো এ্যাম্প্লিফায়ার সার্কিটকে এমনভাবে রাখা হয় যা'তে সেই দু'টো সার্কিট একটা সিগন্যালকে একই সাথে সম্প্রসারিত করে এবং তারপর একটা আউটপুট বিন্দুতে মিলিত হয়ে, 'কমন আউটপুট' হিসেবে একটাই সিগন্যাল পরবর্তী অংশে পাঠায়। পুশ-পুল এ্যাম্প্লিফায়ারে দু'টো ইনপুট সিগন্যাল থাকে 180° ডিগ্রী আউট অফ ফেজ্ (out of phase)-এ এবং দু'টো আউটপুট একটাই কমন লোড-এ দেওয়া হয়, যার ফলস্বরূপ অনেক বড় সিগন্যাল আউটপুট হিসেবে পাওয়া যায়।

এই 180° ডিগ্রী আউট অফ ফেজ্ দু'টো ইনপুট সিগন্যালকে পাওয়ার জন্য এই সার্কিটে থাকে একটা ফেজ্ স্লিটার (phase slitter), যার কাজ একটা ইনপুট সিগন্যালকে গ্রহণ করে, সেই সিগন্যালকে দু'টো অভিন্ন 180° ডিগ্রী আউট অফ্ ফেজ্ সিগন্যালে ভাগ করে দেওয়া।

পুশ-পুল এ্যাম্প্লিফায়ারে উল্লেখযোগ্যভাবে ডিস্‌টরশন কমানো যায়।

ইন্টার-ক্যারিয়ার সাউণ্ড আই এফ অ্যাম্প্লিফায়ার (Inter-Carrier Sound I F Amplifier)

ভিডিও ডিটেকটর এর আউটপুটে পাওয়া ইন্টার ক্যারিয়ার শব্দের সিগন্যাল-এর বিস্তার (Amplitude) খুবই কম থাকে তাই ন্যূনতম দু'টো স্তরে সাউণ্ড আই এফ-এর সম্প্রসারণ ঘটানো হয় এবং তারপর সিগন্যালকে এফ এম ডিটেকটরে দেওয়া হয়। প্রতিটা আই এফ স্তরেই টিউনড্ সম্প্রসারণ ঘটে 5·5 MHz ফ্রিকোয়েন্সি এবং 150 KHz-এর বেশী ব্যাণ্ডউইডথ্ অনুযায়ী, যার ফলে এফ এম ডিটেকটরে সম্পূর্ণ 'গেইন' পাওয়া সম্ভব হয়।

কীভাবে একটা ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট টেলিভিশন কাজ করে
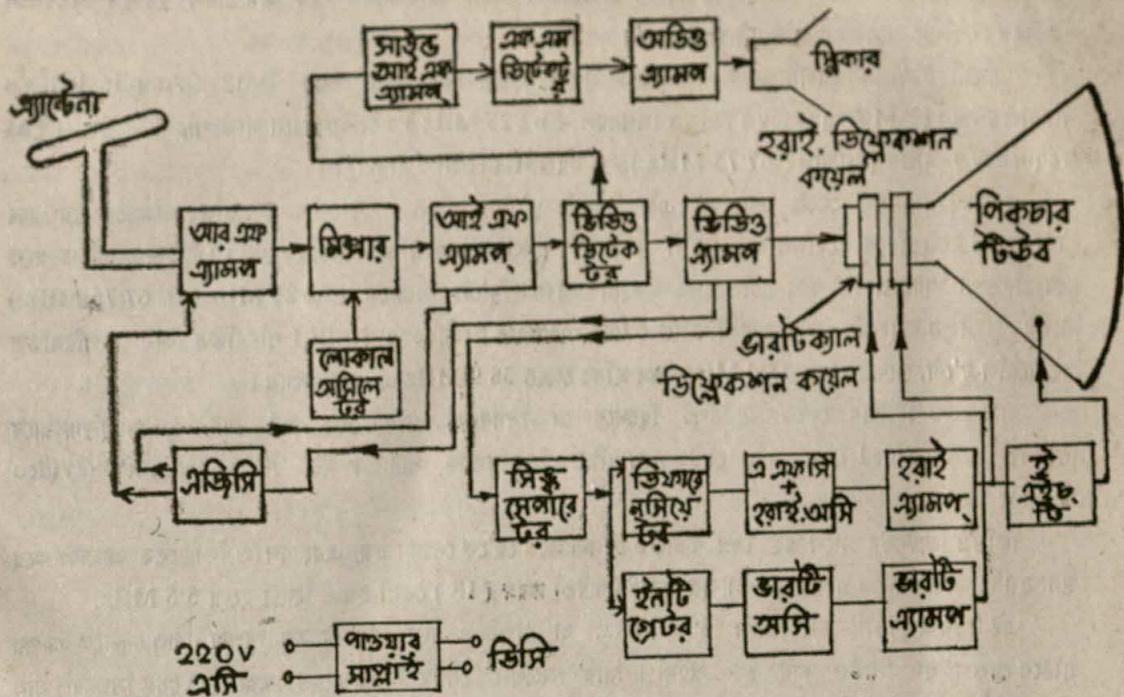
ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট টিভি রিসিভারের ব্লক ডায়াগ্রাম

ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত শব্দ ঃ

আই এফ এ্যামপ = ইন্টারমিডিয়েট ফ্রিকোয়েন্সি এ্যাম্প্লিফায়ার

আর এফ এ্যামপ = রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি এ্যাম্প্লিফায়ার

এ্যামপ = এ্যাম্প্লিফায়ার ; হরাই অসি = হরাইজেন্টাল অসিলেশন ; হরাই এ্যামপ = হরাইজেন্টাল এ্যাম্প্লিফায়ার ; ভারটি অসি = ভারটিকাল অসিলেশন ; ভারটি এ্যামপ = ভার্টিকাল এ্যাম্প্লিফায়ার ; ই এইচ টি = একস্ট্রা হাই টেনশন ট্র্যান্সফরমার ; এজিসি = অটোমেটিক গেইন কন্ট্রোল ; এ এফ সি = অটোমেটিক ফ্রিকোয়েন্সি কন্ট্রোল।

একজন নতুন টেলিভিশন শিক্ষার্থীর পক্ষে অত্যন্ত জরুরী প্রশ্ন হলো রিসিভার হিসেবে একটা টেলিভিশন কী ভাবে ছবি ও শব্দকে ধরে বিভিন্ন অংশের মধ্যে দিয়ে স্ক্রীনে ও স্পিকারে পৌঁছে দেয় ?

এখানে প্রতিটা আলাদা স্টেজকে একটা ব্লক ডায়াগ্রামের মধ্যে ধরা হয়েছে। ব্লক ডায়াগ্রামটা খুব খুঁটিয়ে দেখলে এই প্রশ্নের উত্তরটা অনেকটাই পরিস্কার হয়ে যাবে।

দূরবর্তী টেলিভিশন ট্র্যান্সমিশন সেন্টার থেকে দু'টো তরঙ্গ ছাড়া হয়। তরঙ্গ বিস্তার (Amplitude) কে পরিবর্তিত করে (AM frequency) ভিডিও সিগন্যাল (62·25 MHz) এবং ফ্রিকোয়েন্সিকে পরিবর্তিত করে (FM frequency) অডিও সিগন্যাল (67'75 MHz). [ব্যাণ্ড II, চ্যানেল 4 অনুসারী]

প্রথমেই বায়ুমণ্ডল থেকে এ্যান্টেনা এই নির্দিষ্ট দু'টো রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি বা রেডিও ওয়েভকে ধরে এবং দু'টো তারের মধ্যে দিয়ে 'রেডিও-ফ্রিকোয়েন্সি টিউনার' (RF Tuner) এ পাঠিয়ে দেয়। টিউনার এই তরঙ্গকে সম্প্রসারিত বা 'অ্যামপ্লিফাই' করে এবং প্রথম অবস্থায় পাওয়া দু'টো তরঙ্গকে (62·25 MHz এবং 67·75 MHz) নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী একটা মধ্যবর্তী তরঙ্গে (Intermediate Frequency বা IF) পরিবর্তিত করে। পরিবর্তিত ফ্রিকোয়েন্সি দু'টো, শব্দের ক্ষেত্রে 33·4 MHz এবং ছবির ক্ষেত্রে 38·9 MHz এ এসে দাঁড়ায়।

আর এফ টিউনার থেকে আউটপুট হিসেবে যে সিগন্যাল পাওয়া যায় তা' আই এফ অ্যাম্‌প্লিফায়ারে সম্প্রসারিত (Amplified) হয় এবং সেই সম্প্রসারিত সিগন্যালকে পাঠানো হয় 'ভিডিও ডিটেকটর' (Video detector) অংশে।

ভিডিও ডিটেকটর অংশে এই মিশ্র ভিডিও সিগন্যালকে ছেঁকে নেওয়া হয় এবং শব্দ ও ভিডিওকে আলাদা করে ফেলা হয়। এখান থেকে শব্দের জন্য আবার একটি মধ্যবর্তী তরঙ্গ (IF) তৈরী হয়। সেটা হলো 5·5 MHz.

এই নতুন মধ্যবর্তী ফ্রিকোয়েন্সি 5·5 MHz, যা 'ভিডিও ডিটেকটর' থেকে পাওয়া গেল সেটাকে এরপর পাঠিয়ে দেওয়া হয় 'সাউণ্ড আই এফ অ্যাম্‌প্লিফায়ার' অংশে। সেখানে সম্প্রসারিত হওয়ার পর সেই সিগন্যাল যায় 'অডিও ডিটেকটর' বা এফ এম ডিটেকটর (Audio detector or FM detector) অংশে। এই এফ এম ডিটেকটরে, শব্দের আই এফ সিগন্যালের দ্বারা যে সিগন্যাল পৌঁছেছে তা' সঠিকভাবে চিহ্নিত হয়। পরবর্তী ক্ষেত্রে তা' পাঠিয়ে দেওয়া হয় 'অডিও অ্যাম্‌প্লিফায়ার' (Audio amplifier) অংশে। সেখানে অডিও সিগন্যাল সম্প্রসারিত হয়ে আরো শক্তি সঞ্চয় করে, যা 'স্পিকার' (Speaker) কে চালানোর পক্ষে যথেষ্ট। শব্দ নিয়ে মাথা ঘামানো এখানেই শেষ, কারণ স্পিকারে পৌঁছে যাওয়ার পর এবং স্পিকারটা ঠিক থাকলে 'অডিও সিগন্যাল' শব্দ সৃষ্টি করবেই।

এইবার, আবার ভিডিও সিগন্যালকে ধরা যাক। ভিডিও ডিটেকটর থেকে ভিডিও সিগন্যাল গিয়ে পৌঁছোয় ভিডিও অ্যাম্‌প্লিফায়ারে (Video amplifier)। ভিডিও অ্যাম্‌প্লিফায়ারও ভিডিও সিগন্যালকে সম্প্রসারিত করে। এইবার, এখান থেকে সিগন্যাল চলে যায় দু'টো পথে ঃ একটা অটোমেটিক গেইন কণ্ট্রোল বা এজিসি (Automatic gain Control or AGC)-তে এবং অন্যটা সিঙ্ক সেপারেটর (Sync Separator) অংশে।

এই এজিসি অংশ কিন্তু টেলিভিশন রিসিভারের একটা ভীষণ মুখ্য অংশ। একাধারে ছবি এবং শব্দকে এ নিয়ন্ত্রণ করে, এবং তা' স্বয়ংক্রিয় ভাবেই করে। প্রধানতঃ এজিসি, আর এফ অ্যাম্‌প্লিফায়ার এবং প্রথম আই এফ অ্যাম্‌প্লিফায়ারকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে যে ইনপুট সিগন্যাল খুব দুর্বল হলে তাকে অনেক বেশী সম্প্রসারিত করে এবং অল্প দুর্বল হলে তা'কে অল্প সম্প্রসারিত করে—দু'টোর মধ্যেই আনে সামঞ্জস্য। যার ফলে ছবির কনট্রাস্ট (contrast)

এবং শব্দের স্পিকারেও আসে একটা নিখুঁত ধারাবাহিকতা। এ্যান্টেনা যখন সিগন্যাল ধরে তখন সেখানে একই ধারাবাহিকতা থাকবে, তেমন কোনো কথা নেই। আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে প্রতিনিয়ত বায়ুমণ্ডল পরিবর্তিত হয়। তবুও ওঠানামাহীন নিখুঁত ছবি ও শব্দের জন্য যে অংশটা কাজ করে সেটারই নাম—অটোমেটিক গেইন কন্ট্রোল।

ট্রান্সমিশন কেন্দ্রে সিগন্যালের সাথে সাথে ভার্টিকাল এবং হরাইজেন্টাল সিঙ্ক পালস্ পাঠানো হয়। সেটা ভিডিও সিগন্যালের সাথে মিশ্র অবস্থায় থাকে। সিঙ্ক সেপারেটর অংশে ভিডিও সিগন্যাল থেকে সিঙ্ক পালস্ (Sync pulse)-গুলোকে আলাদা করে ফেলা হয়। এই পালস্গুলো বিভিন্ন অসিলেটরে তৈরী করে দোলন বা অসিলেশন। প্রথমে এই পালসগুলোকে পাঠানো হয় ডিফারেনশিয়েটর (Differentiator) এবং ইনটিগ্রেটর (Integrator) সার্কিটে। ইনটিগ্রেটর সার্কিটের আউটপুটে পাওয়া যায় 50Hz একত্রিত ভার্টিকাল বা উল্লম্ব (Integrated vertical) সিঙ্ক পালস্, যা ভার্টিকাল অসিলেটর (Vertical oscillator)-কে চালানোর পক্ষে যথেষ্ট।

টেলিভিশন ট্রান্সমিশন কেন্দ্রতে লম্বভাবে ছবিকে ধরে রাখার জন্য সিগন্যালের সঙ্গে এই ভার্টিকাল সিঙ্ক পালস্ পাঠানো হয়। রিসিভার সেটের সিঙ্ক পালস্‌কে সেই অনুযায়ী পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার কাজটি করে ভার্টিকাল অসিলেটর।

ডিফারেন্শিয়েটরের আউটপুটে পাওয়া যায় 15,625Hz পিক্ টাইপ পালস, যা পাঠিয়ে দেওয়া হয় অটোমেটিক ফ্রিকোয়েন্সি কন্ট্রোল বা এ এফ সি (Automatic Frequency Control or AFC) এবং হরাইজেন্টাল বা অনুভূমিক অসিলেটর (Horizontal oscillator) অংশে। এই অংশ দু'টো, ট্রান্সমিটার কেন্দ্র থেকে সিগন্যালের মধ্যে পাঠানো হরাইজেন্টাল সিঙ্ক পালস্ এর সঙ্গে রিসিভার সেটের মধ্যে তৈরী সিঙ্ক পালস্-এর সামঞ্জস্য আনে।

তাহলে বলা যায় যে, যদি ভার্টিকাল অসিলেটর রিসিভার সেটে সঠিক ভার্টিকাল সিঙ্ক পালস তৈরী না করে তা'হলে পিকচার টিউবে আমরা ছবিকে লম্বভাবে ঘুরতে বা 'রোল' (Roll) করতে দেখবো এবং হরাইজেন্টাল অসিলেটর যদি ঠিকভাবে কাজ না করে তাহলে ছবি অনুভূমিকভাবে 'রোল' করবে।

এখন হরাইজেন্টাল অসিলেটরের 15,625Hz হরাইজেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় হরাইজেন্টাল আউটপুট (Horizontal output) অংশে। সেখানে সম্প্রসারিত হয়ে সেই ফ্রিকোয়েন্সি যায় হরাইজেন্টাল ডিফ্লেকশন কয়েল (Horizontal deflection coil)-এ। এখানে তৈরী হয় চৌম্বক ক্ষেত্র, যা পিকচার টিউবের ইলেকট্রন বীম (Electron Beam)কে হরাইজেন্টালি চলতে বাধ্য করে। এছাড়াও হরাইজেন্টাল আউটপুট অংশ তৈরী করে 18 কিলো ভোল্ট, যা পিকচার টিউবের, সঠিকভাবে যাকে বলা হয় ক্যাথোড-রে টিউব বা সি আর টি (Cathode Ray Tube or CRT)-র ফাইনাল অ্যানোডে পৌঁছোয়। 'হরাইজেন্টাল আউটপুট' অংশে তৈরী হয় আরো একটা প্রধান সাপ্লাই। যাকে বলা হয় বুস্ট (Boost) সাপ্লাই। এর কাজ হলো সি আর টি'র এ্যাকসেলেরেটিং গ্রিড এবং ফোকাস গ্রিড-এ সাপ্লাই ভোল্টেজ দেওয়া।

ভার্টিকাল অসিলেটরে 50Hz তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং তা' ভার্টিকাল আউটপুট (Vertical output) অংশে সম্প্রসারিত হয়ে, অবশেষে পাঠানো হয় ভার্টিকাল ডিফ্লেকশন কয়েল (Vertical deflection coil) এ। কয়েলের মধ্যে তৈরী হয় চৌম্বক ক্ষেত্র এবং তা' সি আর টি'র ইলেকট্রন বীমকে ভার্টিকালি চলতে বাধ্য করে।

এই সমস্ত অংশ ছাড়াও থাকে একটা প্রধান অংশ, যা রিসিভার সেটের প্রাণ—সেটা হলো 'পাওয়ার সাপ্লাই' (Power Supply) অংশ। একটা রিসিভার সেটের বিভিন্ন অংশের জন্য দরকার হয় বিভিন্ন ডিসি ভোল্টেজ। প্রধান সাপ্লাই থেকে ভোল্টেজ কমিয়ে বিভিন্ন অংশে, সেই অংশের কার্যকরী ভোল্টেজ পাঠায় এই 'পাওয়ার সাপ্লাই' অংশ।

টেলিভিশন সিগন্যাল ষ্ট্যাণ্ডার্ড

ভারতের ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট টেলিভিশনের জন্য আন্তর্জাতিক রেডিও কন্সালটেটিভ কমিটি (CCIR) দ্বারা অনুমোদিত সিগন্যাল ষ্ট্যাণ্ডার্ড	
প্রতিটা ছবির জন্য মোট লাইন নাম্বার (ফ্রেম)	625
ফিল্ড ফ্রিকোয়েন্সি	50
ফ্রেম ফ্রিকোয়েন্সি	25
ইণ্টারলেস অনুপাত	2 : 1
স্ক্যানিং সিকোয়েন্স	(1) লাইন : বাঁ থেকে ডানদিকে (2) ফিল্ড : ওপর থেকে নিচে
ভিডিও ব্যাণ্ডউইড্‌থ (MHz)	5
রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ব্যাণ্ডউইড্‌থ (MHz)	7
সাউণ্ড ক্যারিয়ার, ভিডিও ক্যারিয়ার সাপেক্ষে (MHz)	5·5
ভিশন মড্যুলেশনের টাইপ ও পোলারিটি	নেগেটিভ
পিক্‌ ক্যারিয়ার অনুযায়ী ব্ল্যাক লেভেল এবং ব্ল্যাকিং লেভেলের পার্থক্য	0—7
ছবি এবং শব্দের কার্য্যকরী রেডিয়েটেড পাওয়ারের অনুপাত	5 : 1 থেকে 10 : 1
সম্পূর্ণ রেডিয়েটেড সাইডব্যাণ্ড	আপার
পিক্‌ ক্যারিয়ারের শতকরা হার অনুযায়ী সিংক্রোনাইজিং লেভেল	100

১

সার্ভিসিং-এর আগে কিছু কথা

টেলিভিশন এখন বেশীরভাগ বাড়ীতেই নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী। শহরে, এমন কি গ্রামেও এর জনপ্রিয়তা বর্তমানে ক্রমবর্ধমান। কিন্তু রেডিও, টেপ রেকর্ডার ইত্যাদি ছোট ছোট ইলেকট্রনিক সামগ্রীর সাথে টেলিভিশনের একটা প্রধান পার্থক্য হলো আয়তন ও ওজন। এই কারণে রেডিও ও টেপের মতো ছোট সেটগুলো খারাপ হয়ে গেলে, সেগুলো টেকনিশিয়ানের কাছে বহন করে নিয়ে আসা যায় কিন্তু টেলিভিশন সেট খারাপ হলে, প্রথমেই টেকনিশিয়ানকে খবর দেওয়া হয়, যা'তে সে গ্রাহকের বাড়ী গিয়ে সেটটা একবার পরীক্ষা করে আসে। এখানেই টেলিভিশন টেকনিশিয়ানের পার্থক্য। টিভি টেকনিশিয়ানকে স্বশরীরে গ্রাহকদের বাড়ীতে যেতে হয়, সেখানে বসে অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও কাজ করতে হয়, সরাসরি গ্রাহকদের সঙ্গে কথা বলতে হয়।

'টেলিভিশন সার্ভিসিং' অংশটুকু লেখার আগে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রসূত কিছু 'টিপস্' বা নির্দেশ দেওয়াটা খুব জরুরী মনে হচ্ছে। এ কথা সত্যি, প্রত্যেকেই যে একই ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হবে এমন কোনো কথা নেই, তবু যারা নতুন করে এই পথটাকে জীবিকা হিসেবে বেছে নেওয়ার কথা ভেবেছে, তাদের মানসিক প্রস্তুতির জন্য এই অংশটা কিছুটা সাহায্য অবশ্যই করবে।

টেলিভিশন সার্ভিসিং, স্বাধীন জীবিকা হিসেবে একজন মানুষকে যথেষ্ট স্বনির্ভরতা দিতে পারে। এই জীবিকার পথে পা বাড়ালে প্রথমেই দরকার তিনটে জিনিষ; যথেষ্ট পরিশ্রম করার ইচ্ছে, মানসিক স্থিরতা ও ধৈর্য্য এবং পেশাদারী মনোভাব। এই তিনটের কোনো একটাও যদি কম থাকে, তা'হলে তার পক্ষে স্বাধীনভাবে দীর্ঘদিন টিকে থাকা কষ্টকর। এই তিনটে জিনিষের সাথে যদি যুক্ত হয় ব্যক্তিত্ব, সাবলীলভাবে সুন্দর কথা বলার সহজাত গুণ তাহলে এই পথে তার উন্নতি প্রায় আবশ্যম্ভাবী।

টিভি টেকনিশিয়ানদের সাথে ডাক্তারদের তুলনা চলতে পারে। ডাক্তারদের উপস্থিতি এবং আকর্ষণীয় আশ্বাসসূচক কথাবার্তাই যেমন রোগীকে অর্ধেক ভালো করে দেয় ঠিক তেমনই টেকনিশিয়ানদের কথাবার্তা এবং আশ্বাসবানী গ্রাহকদেরও দুশ্চিন্তাকে অর্ধেক করে দিতে সাহায্য করে।

'সার্ভিসিং কল' এলে প্রথমেই যেগুলো জেনে নেওয়া প্রয়োজন, তা' নিচে দেওয়া হলো।

প্রথমেই জানতে হবে কোন্ কোম্পানীর টিভি, কোন্ মডেল, কত বছরের পুরোনো সেট।

দ্বিতীয়তঃ জানতে হবে ফল্ট কী, অর্থাৎ কী কী অসুবিধা আছে।

তৃতীয়তঃ জানতে হবে এর আগে কখনো টিভিটা সারানো হয়েছিলো কী না, উল্লেখিত ফল্ট আগেও হয়েছিলো কী না, হয়ে থাকলে কত বছর বা মাস আগে সারানো হয়েছিলো।

নতুন যারা এ পথে এসেছে তাদের মধ্যে উৎসাহ বেশী থাকে। অনেকে উৎসাহের বশবর্তী হয়ে তখনই সেট

দেখতে গ্রাহকের সঙ্গে ছোটে। এটা কক্ষনো করা উচিৎ নয়। একটা নির্দিষ্ট দিন এবং সময়ে টিভিটা দেখতে যাবার কথা বলে, একটা নির্দিষ্ট ডাইরীতে গ্রাহকের ঠিকানা এবং ওপরে উল্লেখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর লিপিবদ্ধ করে নিতে হয়। এতে নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে প্রস্তুত করে নেওয়ারও সময় পাওয়া যায়। গ্রাহক চলে গেলে, সেই ফল্ট বা ফল্টগুলো নিয়ে ভাবনা চিন্তা, সার্কিট দেখা, কোন্ কোন্ অংশগুলো পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং কীভাবে, সেটা দরকার হলে ঐ ডাইরীতে লিপিবদ্ধ করে নেওয়া—এইসব কাজগুলো বাড়ীতে বসেই করে নেওয়া উচিৎ।

ব্যক্তিত্বের প্রথম প্রকাশ অবশ্যই বেশভূষা। গ্রাহকের বাড়ীতে যাওয়ার আগে অবশ্যই নিজের পোষাক সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার। পায়ে অবশ্যই যেন থাকে রবার সোলের জুতো। এটা নিরাপত্তার সাথে সাথে স্মার্টনেস বাড়ায়। টিভি টেকনিশিয়ানকে উচ্চ ভোল্টের হাই-টেনশন লাইনে কাজ করতে হয়, তাই কখনোই রবার সোলের জুতো ছাড়া সেট-এ হাত দেওয়া উচিৎ নয়।

গ্রাহকের বাড়ীতে পৌঁছে সেট সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করার থাকলে সেটা করে নেওয়া দরকার। সেটে হাত দেওয়ার আগে আত্মবিশ্বাসটাও বাড়িয়ে নেওয়া দরকার। অনেকে ফল্ট নিয়ে অযথা গ্রাহকের বাড়ীর লোকের সাথে আলাপ-আলোচনা শুরু করে দেয়। এটা যতটা সম্ভব কম করা উচিৎ। গ্রাহকদের কাছে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই, ইলেকট্রনিক্স একটা অচেনা জগত। ভারী ভারী শব্দে 'আপনার এটা খারাপ হয়েছে, ঐ পার্টসটা বদলাতে হবে' ইত্যাদি না বলে, যদি কেউ বলে, 'খুব একটা বড় ফল্ট নয়, দু'একটা পার্টস বদলালেই ঠিক হয়ে যাবে' ধরনের কথা তা'হলে তা' গ্রাহকদের মনে অনেক বেশী রেখাপাত করে।

টেলিভিশন সেটে অনেক ফল্টই পরীক্ষালব্ধ ফল থেকে সংশোধনী অর্থাৎ 'ট্রায়াল এণ্ড এরর' ধরে এগোতে হয়। আগে থেকেই ঠিক করা এমনই তিনটে বা চারটে পরীক্ষার পরও যদি 'ফল্ট'কে ধরা না যায়, তাহলে তখনই পরীক্ষা বন্ধ করে দেওয়া উচিৎ। গ্রাহকের বাড়ীতে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা যদি একের পর এক পরীক্ষা করার পরও 'ফল্ট'কে দূর করা না যায়, তাহলে গ্রাহকের মনে, টেকনিশয়ানের কর্মদক্ষতার প্রতি সন্দেহ জাগে। এটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। একটা ছোট্ট 'ড্রাই সোল্ডার'ও যে কত ক্ষতিকারক হতে পারে এবং সেটা বা'র করা মাঝে মাঝে কী কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়, এটা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা মুশকিল। তাই প্রথমেই টেকনিশয়ানকে ঠিক করে নিতে হয় কোন্ কোন্ অংশ থেকে এই ধরনের ফল্ট হয়। সেইসব অংশ পরীক্ষা করেও যদি দেখা যায় 'ফল্ট' ঠিক হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে টিভি সেটটা নিজের ওয়ার্কশপে নিয়ে আসতে হয়। এইসব ক্ষেত্রে, গ্রাহককে বোঝাতে হয় যে, এই ফল্টটা খুব বেশীক্ষণ পর্যবেক্ষণে রাখা দরকার, যেটা এখানে সম্ভব নয় কারণ এই ফল্টটা ঠিক করার সময় অন্য অনেকগুলো পাশাপাশি পার্টস খারাপ হয়ে যেতে পারে। তাই টিভি সেটটা ওয়ার্কশপে নিয়ে যেতে হবে। মোটকথা, কখনই যেন গ্রাহক না ভেবে বসেন যে টিভি সেটের ফল্টটা খুবই বড় এবং মারাত্মক ধরনের কোনো ফল্ট। প্রথমেই বলেছি, এই জীবিকায় আসতে গেলে পেশাদারী মনোভাব দরকার। কোনো ফল্ট সারিয়ে তোলার পর একটা অর্থকরী লেনদেন থেকেই যায়। অনেকেই দেখেছি এই টাকা পয়সার ব্যাপারে ভীষণ লজ্জিত হয়ে ওঠে। অনেকে তো এমনও বলেন, 'আমার এই টাকা খরচা হয়েছে। এবার আপনি যা ইচ্ছে হয় দিন—এই ধরনের কথা। এটা অত্যন্ত অন্যায়। টেলিভিশন শিক্ষা অন্য পাঁচটা শিক্ষার থেকে মোটেই আলাদা নয়। অনেক খাটনি এবং বুদ্ধির মাধ্যমে সেটা আয়ত্ব করে, তার দ্বারা পরিশ্রম করে যে কাজটা করা হলো তার বিনিময়ে পারিশ্রমিক চাওয়াটা মোটেই লজ্জার নয়। এ ব্যাপারে সবচেয়ে সহজপন্থা হলো, নিজের নাম ঠিকানা লেখা একটা ছাপানো বিল্ (Bill)-এ সমস্ত হিসেবটা গ্রাহককে দেওয়া। তবে সবার আগে নিজের একটা

'সার্ভিসিং চার্জ' ঠিক করে নেওয়া উচিৎ। একটা অসুবিধার মধ্যে প্রায় সব টেকনিশিয়ানরাই পড়ে, সেটাও এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করছি। অনেকে কল দিয়ে টেকনিশিয়ানকে ডাকেন, তাকে দিয়ে সেট পরীক্ষা করান, 'এষ্টিমেট্' নেন তারপর বলেন, পরে খবর দেবো এবং তারপর যথারীতি অন্য কোনো টেকনিশয়ানদের দিয়ে কাজটা করিয়ে নেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, কোনো গ্রাহক যদি 'পরে খবর দেবো' বলেন তাহলে সাথে সাথে সেট পরীক্ষা করাবার জন্য তার কাছে 'সার্ভিসিং চার্জ'টা দাবী করা উচিৎ। সেক্ষেত্রে বলা উচিৎ, পরে যখন খবর দেবেন এবং আমি কাজটা করবো তখন 'সার্ভিসিং চার্জ'টা বাদ দিয়ে দেবো।

একটা বইয়ের মধ্যে সব ধরনের 'টিপস্' দেওয়ার চেষ্টা কল্পনা বিলাস মাত্র। সে চেষ্টাও করছি না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোতেই পৃথিবীকে চেনার চেষ্টা করতে হবে। এটা প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসার ক্ষেত্র, যার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত গ্রাহকরা, নানান মানসিক চিন্তাধারার নানান ধরনের মানুষ। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, মধুর ও প্রয়োজনীয় ব্যবহার এবং সর্বোপরি টিভি সার্ভিসিং-এ দক্ষতা দিয়েই জয় করতে হবে এই আকর্ষণীয় এবং লাভজনক জগতটাকে, যাকে সহজ বাংলায় বলে ঠেকে শেখা—সেই শিক্ষাই একজন টেকনিশিয়ানকে করে তুলবে দক্ষ ও অভিজ্ঞ।

টেলিভিশন সার্ভিসিং-এ যাওয়ার আগে দরকার একটা টুল বকস্ (Tool Box)। একটা মাঝারি, মজবুত এ্যাটাচী কিনে নিচের দেওয়া তালিকা অনুযায়ী সাজিয়ে নিয়ে, তারপর না হয় 'টেলিভিশন সার্ভিসিং' জগতে ঢোকা যাবে।

(1) একটা মাল্টিমিটার (ইলেকট্রনিক বা সাধারণ ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক)।

(2) একটা 35 ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন সোল্ডারিং আয়রন।

(3) বেশ কিছুটা সোল্ডার মেটেরিয়াল (60% ; 40%), রজন বা পেষ্ট (Paste)।

(4) ডিসোল্ডারিং পাম্প ((Desoldering pump ; এর সাহায্যে সোল্ডার মেটেরিয়াল টেনে নিয়ে একটা সোল্ডার জয়েণ্ট খোলা যায়)।

(5) তিনটে তিন ধরনের প্লায়ার (Pliers), কাটিং (Cutting), নোজ (Nose), ফ্ল্যাট (Flat)।

(6) একটা ছোট্ট চিমটে (Twiser)।

(7) এক সেট স্ক্রু-ড্রাইভার (Screw driver) এবং একটা বড় স্ক্রু-ড্রাইভার।

(8) দু'টো ফাইল (File) ; ফ্ল্যাট (Flat) এবং সরু রাউণ্ড (Round)।

(9) একটা টেষ্টার (Tester)।

(10) কিছু বিভিন্ন ধরনের ওয়াশার সমেত স্ক্রু। (এটা একটা ছোট বাক্সতে রাখলে ভালো হয়)

এবার যে প্রয়োজনীয় পার্টসগুলো সঙ্গে রাখা জরুরী, তারও একটা তালিকা দেওয়া হলো।

রেজিষ্টর—কার্বন ফিল্ম রেজিষ্টর ও ওয়ারউণ্ড রেজিষ্টর ; 1Ω থেকে 3·3MΩ অবধি সমস্ত ষ্ট্যাণ্ডার্ড মান। কার্বন ফিল্ম রেজিষ্টরগুলো একটা পিচবোর্ডে, তলায় মান লিখে গেঁথে রাখলে জায়গা কম লাগবে।

ক্যাপাসিটর—ইলেকট্রোলাইটিক (Mf) = 25/16V, 50/16V, 100/25V, 200/350V, 1000/25V, 2000/50V।

সেরামিক (pf)—2·2, 6·8, 15, 33, 39, 56, 68, 100, 330, 1K, 2·2K, 22K, 47K, 100K, 220K, 470K, 10K/30V, 10K/1KV।

পলিয়েস্টর (pf)—3·3K/400V, 180K/400V।

ট্র্যানজিস্টর—BC 147, BC 148, BF 195, BC 157, BC 158, BEL 187, BEL 188, BU 205, BD 115, AC 187, AC 188, 2N 5296, 2N 6110, BUT 56।

ইনটিগ্রেটেড সার্কিট (I C)—CA 3068, CA 120S, CA 920, CA 810, TDA 1044, TDA 2654, CA 1034।

ডায়োড—OA 79, IN 4148, IN 4007, BY 127।

জেনার ডায়োড—6V, 12V, 15V, 24V, 120V।

গ্লাস ফিউজ—0·05mA, 0·075mA, 1 Amp, 2 Amp, 250 mA।

এছাড়াও প্রয়োজনীয় ফিউজ বেস, আই সি বেস, হিট সিঙ্ক, প্রয়োজনীয় ট্র্যানজিস্টর এবং আই সি'র ভোল্টেজ চার্ট এগুলোও এ্যাটাচীতে রাখা উচিৎ।

টেলিভিশন রিসিভার পরীক্ষার কিছু সাধারণ সূত্র

প্রথমেই জানতে হবে টেলিভিশন সেটের ফল্টটা হঠাৎই হয়েছে না ধীরে ধীরে অবস্থার অবনতি ঘটেছে। যে কোনো ফল্টকে নির্ধারণ করার জন্য সাধারণ কিছু সূত্র নিচে দেওয়া হলো,

(1) সেটের ব্যাককভারটা খুলে একটা নরম ব্রাশ এর সাহায্যে হালকাভাবে ধুলো ঝেড়ে নিতে হবে।

(2) সমস্ত তারগুলোকে, পিকচার টিউবের বেস এবং ফিউজকে এক নজরে দেখে নিতে হবে। তার এর ঝালাই, ঢিলে পিকচার টিউব বেস এবং পুড়ে যাওয়া ফিউজ থাকলে তা'কে সঠিক করে দিতে হবে। যদি কোনো তার বা পার্টস্ পুড়ে গিয়ে থাকে তা'হলে বদলে দিতে হবে।

(3) সুইচ অন করে সেট চালিয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে কোনো পার্টস্ বা ফিউজ পুড়ে যাচ্ছে কি না অথবা স্ক্রীনে কোনো আলো আসছে কিনা। সঠিক পদ্ধতি মেনে এইবার বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করতে হবে।

(4) চেসিস ছোঁয়ার আগেই টেস্টার দিয়ে দেখে নিতে হবে চেসিস লাইভ (Live) হয়ে গেছে কিনা অর্থাৎ তড়িৎ-প্রবাহ আছে কি না। পায়ে অবশ্যই যেন থাকে রবার সোলের জুতো। সাধারণতঃ চেসিস নেগেটিভ হয়।

(5) সেটের পেছনে কাজ করার সময় সামনের স্ক্রীনে কী হচ্ছে সেটা দেখতে অসুবিধা হয়। স্ক্রীনের সামনে একটা আয়না রেখে দিলে কাজ করতে সুবিধা হয়।

(6) পিকচার টিউবের চারপাশে কাজ করার সময় খুব সাবধানে নড়াচড়া করতে হবে। একটু অসাবধান হলে পিকচার টিউবটা ফেটে যেতে পারে, যা আর্থিক ক্ষতির সাথে সাথে শারীরিক ক্ষতিও করতে পারে।

(7) হাই ভোল্টেজ ক্যাপাসিটর অনেকক্ষণ চার্জ ধরে রাখে। পরীক্ষা করার আগে অবশ্যই ক্যাপাসিটরকে ডিসচার্জ করে নিতে হবে।

তাহলে এবার আমরা তৈরী এ্যাটাচী হাতে। এরপর তা'হলে এগোনো যাক বিভিন্ন ফল্ট আর তার প্রতিকার-এর দিকে।

২

সাদা-কালো টেলিভিশনের ছবিসহ কিছু সাধারণ ফল্ট

টেলিভিশন সেটে বিভিন্ন ধরনের ফল্টের সম্মুখীন হতে হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের বিভিন্ন নামকরণও করা হয়েছে। তাই 'গোস্ট পিকচার' বা 'স্নো পিকচার' বললেই এককথায় বোঝা যায় ফল্টটা কী ধরনের। এই ভাষা আয়ত্বে আনতেই হয়। না হলে প্রতি ক্ষেত্রে ফল্টকে বুঝতে বা কাউকে বোঝাতে ব্যবহার করতে হয় অনেক অনেক কথা।

এখানে কিছু সাধারণ এবং খুব বেশী মাত্রায় হয় এমন ফল্টের ছবি ও নাম দেওয়া হলো। সঙ্গে সুবিধার জন্য সাধারণতঃ কোন অংশের জন্য এই ধরনের ফল্ট হয় তারও একটা সাধারণ ধারণা দিয়ে দেওয়া হলো। এটাই কিন্তু ফল্টের সাথে আমাদের প্রাথমিক পরিচয়।

(1) ছবি দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে ছোট হয়ে গেছে।

পাওয়ার সাপ্লাই, হরাইজেন্টাল আউটপুট, 200V (A) সাপ্লাই দেখতে হবে। লাইন আউটপুট ট্রানজিস্টর এর ভোল্টেজ দেখতে হবে। সবশেষে হরাইজেন্টাল এ ভার্টিকাল ইয়োক কয়েল দেখতে হবে।

(2) হাম্ বার (Hum bar)—ছবির ওপর দিয়ে একটা ওপর-নিচে চলমান চওড়া কালো বার।

পাওয়ার সাপ্লাই। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ফিলটার ক্যাপাসিটর দেখতে হবে। অকজুলারী পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ফিলটার ক্যাপাসিটরও দেখতে হবে।

(3) ব্লুমিং ছবি (Blooming picture)—ব্রাইটনেস্ কন্ট্রোল ঘোরালে ছবি বড়-ছোট হচ্ছে।

EHT-র হাইভোল্টেজ দূর্বল (18KV)। ডায়োড TV 20-কে দেখতে হবে।

(4) ভার্টিকাল লাইন (Vertical line)—উলম্বভাবে স্ক্রীনের মাঝামাঝি একটা লাইন।

হরাইজেন্টাল সুইপ সার্কিট। LOT থেকে হরাইজেন্টাল ইয়োক কয়েলের মধ্যবর্তী অংশ দেখতে হবে।

(5) হরাইজেন্টাল লাইন (Horizontal line)—আড়াআড়িভাবে স্ক্রীনের মাঝখানে একটা লাইন।

ভার্টিকাল সুইপ সার্কিট। ভার্টিকাল সেকশনের বিভিন্ন পিন বা লেগ ভোল্টেজ মাপতে হবে।

(6) জেব্রা লাইন (Zebra line)—ছবির ওপর সাদা-কালো কোনাকুনি লাইন।

হরাইজেন্টাল সিঙ্ক সেপারেটর, এ এফ সি। এই সেকশন পরীক্ষা করতে হবে।

(7) ওপর ও নিচ থেকে ছবি ছোট হয়ে গেছে।

ভার্টিকাল অসিলেটর ও আউটপুট। ভার্টিকাল অসিলেটর ও আউটপুট সেকশনকে ভালোভাবে দেখতে হবে।

1
2
3
4
5
6
7
8
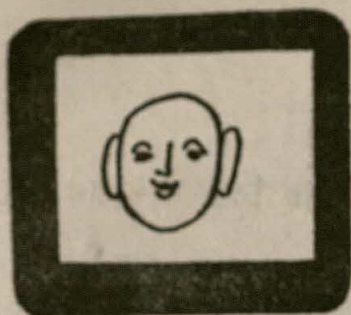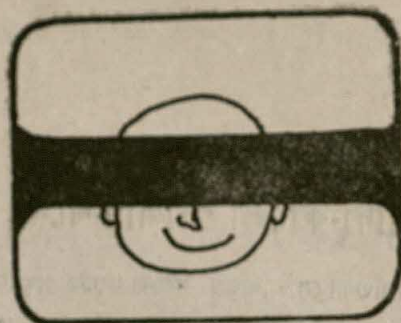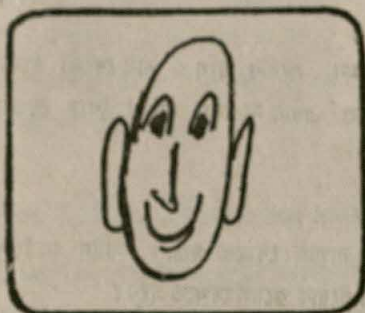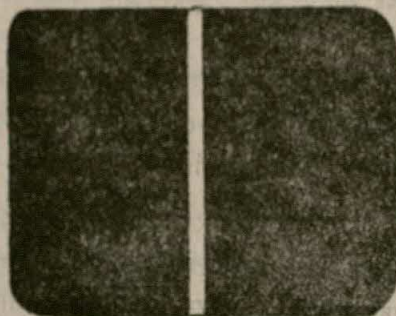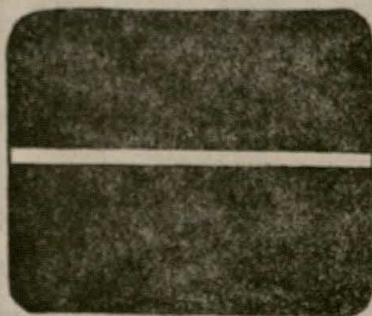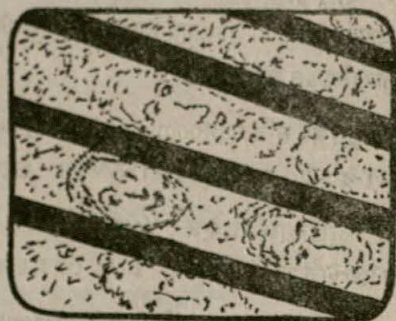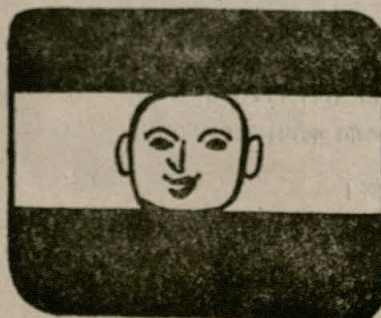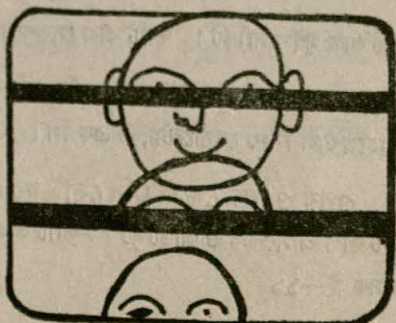
(8) ভার্টিকাল রোলিং (Vertical Rolling)—ছবি ওপর থেকে নিচে বা নিচে থেকে ওপরে দ্রুত ঘুরে যাচ্ছে।

ভার্টিকাল অসিলেটর, ভার্টিকাল সিঙ্ক সেকশন। এই দু'টো সেকশন ও ভার্টিকাল হোল্ড কন্ট্রোলকে দেখতে হবে।

(9) পুলিং (Pulling) ছবি—ছবি বেঁকে বা কুঁচো হয়ে যাচ্ছে।

সিঙ্ক সেপারেটর, ভার্টিকাল সিঙ্ক সেপারেটর, এ এফ সি, এই তিনটে সেকশনকেই ভালো করে পরীক্ষা করতে হবে।

(10) হরাইজেন্টাল পুলিং—ছবিকে যে কোনো একদিকে অনুভূমিক ভাবে টানছে।

এক্ষেত্রেও 9 নং অনুযায়ীই পরীক্ষা করতে হবে।

(11) স্লো ভার্টিকাল রোলিং—ছবি ওপর থেকে নিচে ধীরে ধীরে ঘুরে যাচ্ছে।

ভার্টিকাল সিঙ্ক সেকশন। ভার্টিকাল ইনটিগ্রেটেড সার্কিটকে পরীক্ষা করতে হবে ও ভার্টিকাল হোল্ড কন্ট্রোলকে পরীক্ষা করতে হবে।

(12) গোষ্ট (Ghost) ছবি—ছবির বাঁদিকে এক বা একাধিক আবছা ছবি আসছে।

এ্যান্টেনা। এ্যান্টেনার দিক্‌টা ঠিক আছে কী না দেখতে হবে।

(13) একত্রে হরাইজেন্টাল ও ভার্টিকাল রোলিং।

সিঙ্ক সেপারেটর, ভার্টিকাল সেকশন। সিঙ্ক সেপারেটর সার্কিট এবং ভার্টিকাল অসিলেটর ও আউটপুট সেকশনের সমস্ত পিন ভোল্টেজ দেখতে হবে।

(14) স্মীয়ারড্‌ ছবি (Smeared Picture)—ছবির চারপাশে কাঁপা কাঁপা হালকা দাগ।

ভিডিও আই এফ, ভিডিও অ্যাম্প্লিফায়ার ও আউটপুট সেকশন। এই দু'টো সেকশনকে পরীক্ষা করতে হবে। পিকিং (Peaking) কয়েল ও পিকচার টিউবের ক্যাথোডের সার্কিট (Beam limiting circuit) টা দেখতে হবে।

(15) রিট্রেস লাইন (Retrace lines)—র‍্যাষ্টারের ওপর রিট্রেস লাইন।

ভিডিও অ্যাম্প্লিফায়ার ও আউটপুট সেকশন, পিকচার টিউব। এই দু'টো অংশকে ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে। পিকচার টিউবের বেস ভোল্টেজগুলো মাপতে হবে।

(16) ভার্টিকাল ব্ল্যাঙ্কিং (Blanking) লাইন-ছবির ওপরে সাদা সরু সরু কিছু লাইন দেখা যাচ্ছে।

ভার্টিকাল ব্ল্যাঙ্কিং, ভিডিও আউটপুট সেকশন। ভার্টিকাল ব্ল্যাঙ্কিং সার্কিট ও ট্রানজিস্টর BD 115-এর বায়াসিং দেখতে হবে।

(17) ছবির ডানদিকে কালো, চওড়া বার।

হরাইজেন্টাল এ এফ সি, হরাইজেন্টাল ড্রাইভার। এই দু'টো সার্কিটকে ভালোভাবে দেখতে হবে।

(18) ছবির মাঝখানে একটা সাদা বার ছবিকে দু'টো ভাগে ভাগ করে দিয়েছে।

এক্ষেত্রে 17নং অনুযায়ী পরীক্ষা করতে হবে।
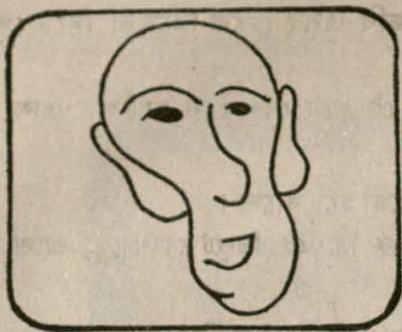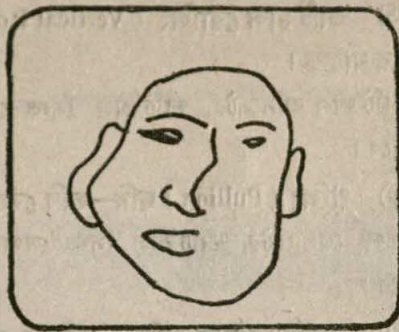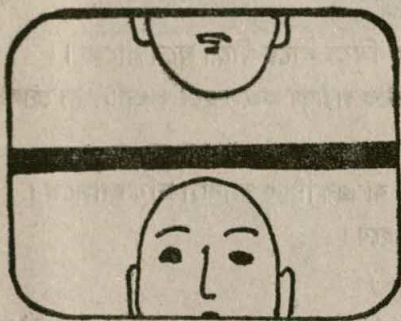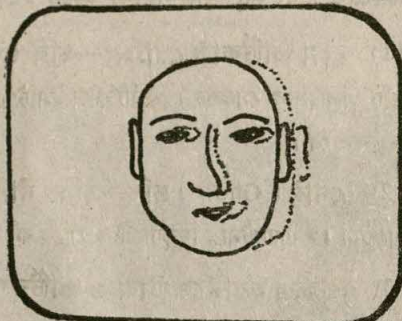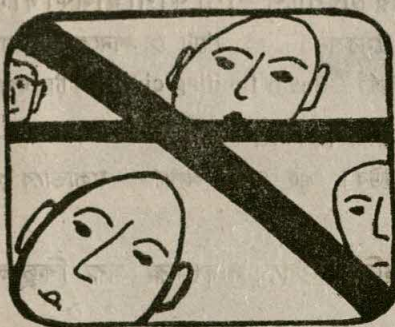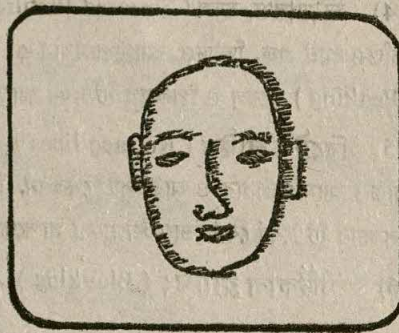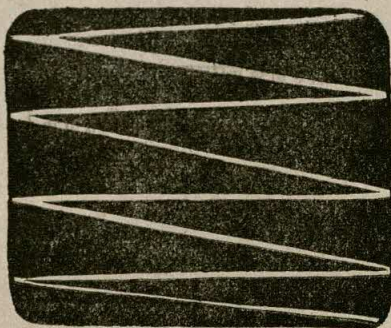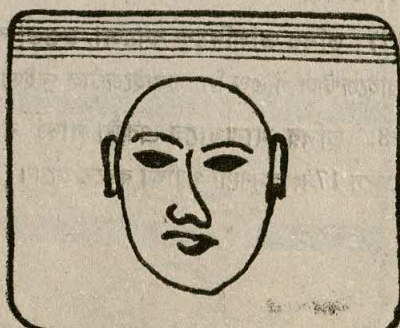
9
10
11
12
13
14
15
16

(19) ছবির এক কোনায় কালো দাগ (Patch) দেখা যাচ্ছে।

ভার্টিকাল ইয়োক কয়েল সেকশন। ভার্টিকাল ইয়োক কয়েলের সমান্তরালে ক্যাপাসিটর 0·1Mfd/400V ও রেজিস্টর 4·7K-র জন্যই এই ফল্ট হয়। এই ফল্ট শুধুমাত্র আপট্রন সার্কিটেই হয়।

(20) রিগলিং (Wriggling) বা কগহুইল (Cogwheel) ছবি—ছবি ওপর থেকে নিচে এবং পাশাপাশি ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

হরাইজেন্টাল এ এফ সি। এই সার্কিটটা ভালো করে দেখতে হবে।

(21) স্নো ছবি (Snow Picture)—ছবিতে অসংখ্য সাদা কালো দানা।

এ্যান্টেনা থেকে ডিটেকটর, এজিসি। এই অংশটা ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

(22) বটম ফোল্ড ওভার (Bottom fold over) বা ক্র্যাম্পিং (Cramping)—ছবির তলা থেকে ভাঁজ হয়ে গেছে আর ছবিটা লম্বা হয়ে গেছে।

ভার্টিকাল সুইপ সেকশন। এই সেকশনটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করতে হবে।

(23) ছবির ওপর আবছা কালো বার।

এ্যান্টেনা ফিডারওয়ার, বেলুন ট্রান্সফরমার, টিউনার, হরাইজেন্টাল ড্রাইভার ও আউটপুট ট্রান্সফরমার। বিশেষ করে টিউনারের চেসিস পয়েন্ট ঠিক আছে কী না দেখতে হবে।

(24) ছবির দু'ধারে ঢেউখেলানো কালো বার।

পাওয়ার সাপ্লাই, ইয়োক কয়েল। A সাপ্লাই ঠিক আছে কী না দেখতে হবে। ইয়োক কয়েলের সাথে যুক্ত বার ম্যাগনেট ও সেন্টারিং ম্যাগনেটকে নিয়ন্ত্রণ করে দেখতে হবে।

একমাত্র 19 নং ফল্ট ছাড়া, অন্য সব ফল্টই সাধারণ ফল্ট—যা সব সার্কিটের টিভি সেটেই হয়ে থাকে। 19 নং এর ফল্টটা একমাত্র আপট্রন সার্কিটেই হয়। খুব সাধারণ ধারণা জন্মাবার জন্যই এখানে সেকশনকে উল্লেখ করে দেওয়া হলো। এ ছাড়াও অন্যান্য সেকশনের জন্যও অনেকসময় সেই ফল্ট হয়। পরবর্তী ক্ষেত্রে এই ফল্টগুলোকে নিয়েই বিভিন্ন সেকশন ধরে ফল্টের আলোচনা করা হয়েছে।

20 নং ফল্টের ক্ষেত্রে, বোঝানোর সুবিধার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে চেকার বোর্ড প্যাটার্ন। গোটা স্ক্রীন জুড়ে হরাইজেন্টালি ও ভার্টিকালি ঢেউ খেলে যাওয়া বোঝানোর জন্যই এই স্ক্রীন জুড়ে থাকা প্যাটার্ন ব্যবহার করা হয়েছে।
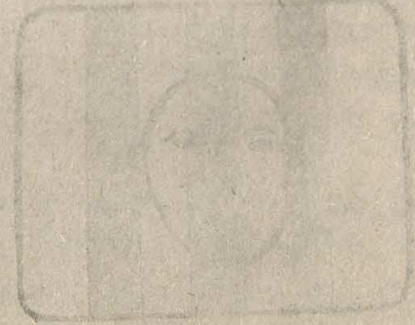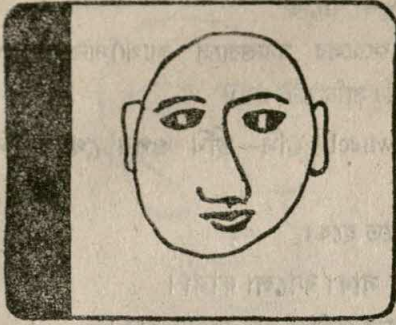
17
18
19
20
21
22
23
24

৩
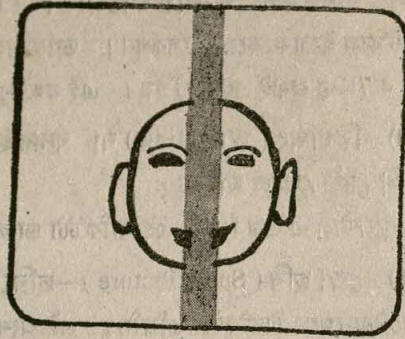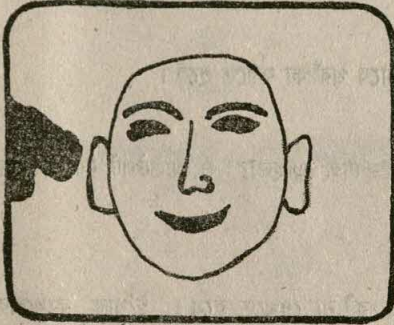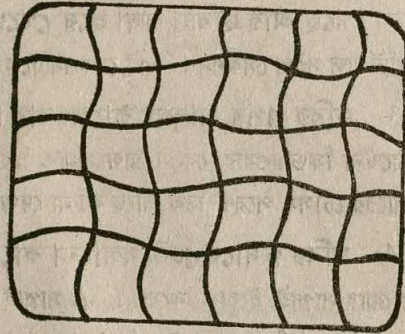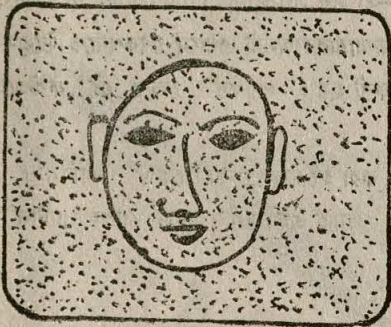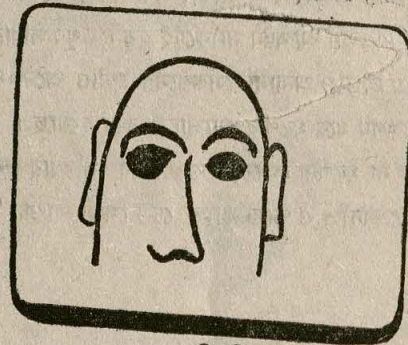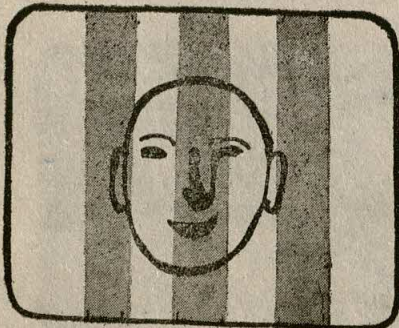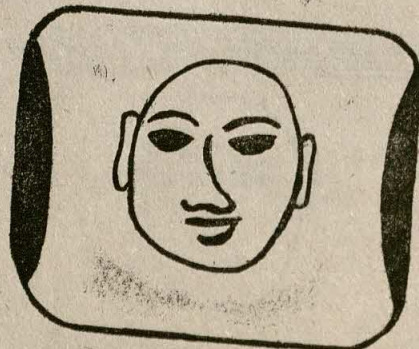
এ্যাণ্টেনা

বাড়ীর ছাদে বা বারান্দায় যে অ্যালুমিনিয়ামের চকচকে কিছু পাইপ সুন্দর সামঞ্জস্যে লাগানো থাকে এবং যার ওপরে রাজ্যের কাকেরা জড়ো হয়ে মাঝে মাঝেই মিটিং বসায়—সেটা যে আসলে টেলিভিশন এ্যাণ্টেনা তা' এখন আর কাউকে আলাদা করে চিনিয়ে দিতে হয় না। কিন্তু ওই এ্যাণ্টেনাটির গুরুত্বর প্রশ্নে বেশীর ভাগ মানুষই যথেষ্ট উদাসীন। ছাদের এক কোনায় পড়ে থেকে যে মহান ভূমিকা এই এ্যাণ্টেনা পালন করে সে ব্যাপারে সাধারণ মানুষ তো বিশেষ ভাবেই না, কিন্তু টেলিভিশন নিয়ে যাদের সবচেয়ে বেশী নাড়াচাড়া করতে হয়—সেই টেকনিশানরাও অনেক সময় এ্যাণ্টেনাকে গুরুত্ব দেয় না। সামান্য দু'টো তারবিশিষ্ট ঐ সরু সরু নলগুলোর আর কী এমন ভূমিকা আছে ; সোজা দাঁড়িয়ে থাকলেই হলো—এইরকম ভাবনাচিন্তা অনেক টেকনিশিয়ানের মধ্যেই দেখা যায়। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় অনেক সময় এমনও দেখা গেছে, টিভির জটিল সার্কিটের মধ্যে অনেক তারের জটে হারিয়ে গিয়ে টেকনিশিয়ানের যখন গলদঘর্ম অবস্থা তখন ফল্ট লুকিয়ে বসে আছে ঐ এ্যাণ্টেনার মাত্র দু'টো তারে।

এ্যাণ্টেনা নিয়ে আলোচনার আগে, বুঝতে হবে এ্যাণ্টেনার কাজ কী? বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সির বেতার তরঙ্গ, এ্যাণ্টেনার কাজ হলো সেই বায়ুমণ্ডল থেকে টেলিভিশনের জন্য নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি ধরে দু'টো তারের সাহায্যে তা' সরাসরি টিউনারে পাঠিয়ে দেওয়া।

বিভিন্ন এ্যাণ্টেনা নিয়ে আলোচনা করার আগে একটু জটিলতায় যাওয়া যাক। প্রথমেই কিছু কঠিন জিনিস জেনে নিয়ে সহজতর বিষয়ে পরে যাওয়া যাবে। চলমান তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ, যাকে রেডিও তরঙ্গ বলা হয়—এর মধ্যে থাকে দু'টো ক্ষেত্র বা ফিল্ড (Field)। প্রথমটা হলো ট্র্যান্সমিটার এ্যাণ্টেনার (যা ট্রান্সমিটার কেন্দ্রে লাগানো থাকে) তড়িৎজনিত চৌম্বক ক্ষেত্র (Magnetic field) এবং দ্বিতীয়টা হলো তড়িৎক্ষেত্র (Electric field)। এই দুই ক্ষেত্র বায়ুমণ্ডলে একে অন্যের সঙ্গে লম্বভাবে (Perpendicular) থাকে এবং তরঙ্গ বিস্তারের ক্ষেত্রেও এরা একে অন্যের সঙ্গে লম্বভাবে থেকেই এগোয়। যখন চৌম্বক ক্ষেত্র রিসিভিং এ্যাণ্টেনার (যা বাড়ীতে টেলিভিশন সেটের সঙ্গে লাগানো থাকে) ওপর দিয়ে যায়, তখন তা এ্যাণ্টেনাকে কিছুটা আবেশিত করে।

এখন, তরঙ্গকে নির্দিষ্ট অভিমুখী তড়িৎ আকর্ষিত (Wave polarization) করার জন্য প্রাথমিকভাবে তড়িৎ ক্ষেত্রের দিকমুখিতাকেই দায়বদ্ধ করা যায়। সেইজন্য এ্যাণ্টেনা কোন্ অভিমুখী এবং কীভাবে আছে অর্থাৎ তার ডায়পোল কীভাবে আছে সেটা খুবই জরুরী প্রশ্ন। অনুভূমিক (Horizontal) ডায়পোল সবসময় অনুভূমিকভাবেই তড়িৎ আকর্ষিত হবে। তাহলে বলা যায় কনডাকটারগুলোর চারপাশে তরঙ্গের চৌম্বক ক্ষেত্রগুলো লম্বভাবে থাকবে এবং তড়িৎ ক্ষেত্রগুলো অনুভূমিকভাবে থাকবে।

ফ্রিকোয়েন্সিকে পরিবর্তিত করে টেলিভিশন সম্প্রসারিত করা হয়, যাকে বলে ফ্রিকোয়েন্সি মডিউল্যা (FM) এবং তা' হয় অনুভূমিকভাবে (Horizontal polarization)—এটা আন্তর্জাতিক নিয়ম। সেই কারণে রিসিভিং এ্যাণ্টেনাকে অনুভূমিকভাবে, কিছুটা উঁচুতে লাগাতে হয় যাতে তা' সর্বোৎকৃষ্টভাবে অনুভূমিক তরঙ্গগুলো ধরতে পারে।

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই অনুভূমিক পোলারাইজেশন মেনে নেওয়া হয়েছে কারণ এক্ষেত্রে সিগন্যাল সামর্থ্য বাড়ে, ফ্রিকোয়েন্সির প্রতিফলনজনিত ক্ষয় কম হয় এবং সর্বোপরি এর দ্বারা ভৌতিক ছবি (Ghost pictures)র মাত্রা অনেকাংশে কমে। অনেকের মনেই নিশ্চয়ই ডায়পোল, কন্ডাকটার ইত্যাদি শব্দগুলো নতুন লাগছে। একটু পরেই এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে।
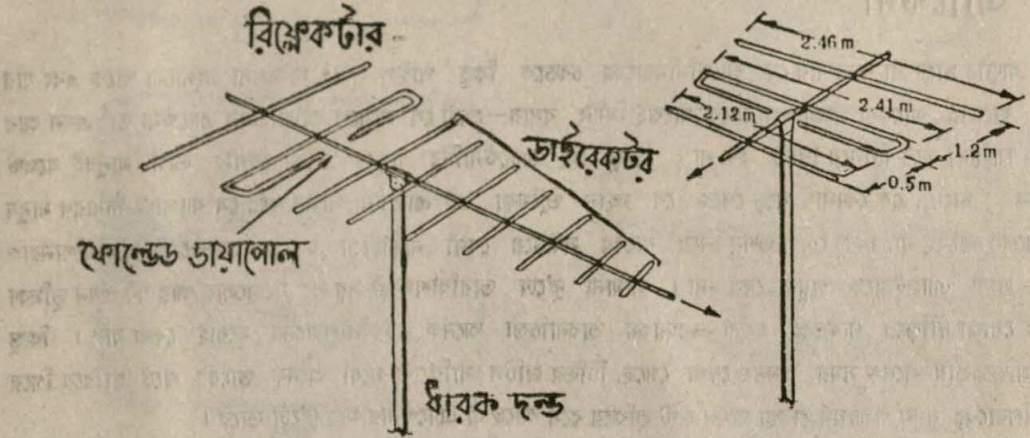
চিত্র ৩.১

একটা প্রয়োজনীয় সূত্র ঃ

তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (Wave length) এবং বায়ুমণ্ডলের তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গর ফ্রিকোয়েন্সি একে অপরের সাথে ব্যাস্তানুপাতে (Inversely proportional) পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ যদি ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ে, তাহলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কমে যায় এবং বিপরীতক্রমে যদি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাড়ে, তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি কমে যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই তরঙ্গদৈর্ঘ্য কিন্তু তরঙ্গ বিস্তারের বেগ, যা রেডিও ওয়েভের ক্ষেত্রে আলোকগতির সমান, তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

এখন যদি তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে ল্যাম্বডা (Lambda—যাকে বলা হয় λ এইভাবে) এবং ফ্রিকোয়েন্সিকে f ধরা হয় তাহলে ওপরের সূত্রানুযায়ী,

$$\lambda \propto \frac{1}{f}$$

অথবা $\lambda = V \times \frac{1}{f}$ [যখন V একটা ধ্রুবক]

এই V হলো রেডিও তরঙ্গর বেগ (Velocity) এর মান 3×10^{10}Cm/Sec.

তাহলে সম্পূর্ণ সূত্রটা দাঁড়ালো,

$$\lambda = \frac{3 \times 10^{10}\text{cm/sec}}{f\ (\text{Hz})} = \frac{186{,}000 \text{ miles/sec}}{f\ (\text{Hz})}$$

f-কে সবসময় হাৎর্স (Hz)এ পরিবর্তিত করে নিতে হয়।

এ্যান্টেনার দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই ল্যাম্বডার ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ফুট অথবা মিটারে এই দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সিগন্যাল ফ্রিকোয়েন্সির পরিপ্রেক্ষিতে তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনুযায়ী সমাধান করতে হয়।

ডায়পোল (Dipole)

অ্যান্টেনার প্রধান অংশ হলো ডায়পোল (Dipole), যা তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গকে বাধা দেয় এবং আবেশিত তড়িৎকে, যাকে সিগন্যাল কারেন্ট বলে, কনডাকটারের মধ্যে দিয়ে টিউনারে পাঠিয়ে দেয়। টেলিভিশনের রিসিভিং এ্যান্টেনা কিন্তু ছবি এবং শব্দ—এই দু'টো সিগন্যালকেই ধরে এবং সেটা একটা এ্যান্টেনার মাধ্যমেই।

ডায়পোল অনেক ধরনের হয়, যেমন হাফ-ওয়েভ ডায়পোল, ফোল্ডেড ডায়পোল। বিভিন্ন সিগন্যাল এরিয়ার উপর নির্ভর করে সেখানে কী ধরনের এ্যান্টেনা লাগানো হবে। হাফ-ওয়েভ ডায়পোল সাধারণতঃ দু'টো ভিন্ন, একে অন্যের থেকে কুপরিবাহী পদার্থের দ্বারা পৃথক করা কোয়ার্টার-ওয়েভ কনডাক্টার দিয়ে গঠিত। ফোল্ডেড ডায়পোল দু'টো হাফ-ওয়েভ ডায়পোলকে দু' মাথায় যুক্ত করে এবং তলার কনডাকটারটা মধ্যেখানে আলাদা করে বানানো হয়। বস্তুতঃ এটা একটা দু'পাশে ভাঁজ করা দুই স্তরের একটাই কনডাকটার।

হাফ-ওয়েভ ডায়পোলের দৈর্ঘ্য বার করার সহজ সূত্র হলো,

$$\text{দৈর্ঘ্য, L (ফুট)} = \frac{462}{f\ (MHz)}$$

হাফ-ওয়েভ ডায়পোল এ্যান্টেনার ইমপিডেন্স (Impedance) হলো 72Ω থেকে 75Ω। স্বাভাবিকভাবেই ফোল্ডেড ডায়পোল এ্যান্টেনার ইমপিডেন্স 288Ω থেকে 300Ω। এই ইমপিডেন্স (Za) এ্যান্টেনার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মানে পাওয়া যায়। ওপরের মানগুলো সবই ডায়পোলের কেন্দ্রে পাওয়া যায়। এই মানগুলো অবশ্য ওহ্‌ম মিটারে মাপা যায় না।

অনেকরকম গঠনের এ্যান্টেনা পাওয়া যায়। আমরা এখানে আলোচনা করবো প্রধানতঃ তিনটে এ্যান্টেনাকে নিয়ে। সেগুলো হলো।

(1) ইয়াগী এ্যান্টেনা (Yagi Antenna)

(2) ফ্রিঞ্জ এরিয়া এ্যান্টেনা (Fringe area Antenna)

(3) ইনডোর এ্যান্টেনা (Indoor Antenna)

ইয়াগী এ্যান্টেনা

সবচেয়ে বেশী যে এ্যান্টেনা ব্যবহৃত হয় সেটা হলো এই ইয়াগী-উদা বা সহজভাবে ইয়াগী এ্যান্টেনা।

ইয়াগী এ্যান্টেনার ডায়পোলকে মাঝখানে ধরলে, যেদিকে দৈর্ঘ্যে সবচেয়ে বড় একটাই এলিমেন্ট থাকে সেটাকে বলে রিফ্লেক্টর (Reflector)। এটা কিন্তু এ্যান্টেনার পেছন দিক। এই রিফ্লেক্টরের কাজ পেছনে চলে আসা সিগন্যালগুলোকে তাড়িয়ে দেওয়া। ডায়পোলের অন্যদিকে থাকে ডাইরেকটর (Director)। এটার সংখ্যা নির্ভর করে এ্যান্টেনা কতটা শক্তিসম্পন্ন সিগন্যাল এরিয়া'য় বসানো হচ্ছে বা হয়েছে তার ওপর। এটাই এ্যান্টেনার সামনের দিক অর্থাৎ এই দিকটাই টিভি ট্রান্সমিটার-এর এ্যান্টেনাভিমুখী রাখতে হয়। এই ডাইরেকটরের কাজ সিগন্যালকে ডায়পোলের দিকে ঠেলে পাঠানো বা কেন্দ্রীভূত করা। ডায়পোল থেকে দু'টো তার নেমে রিসিভার সেটের টিউনারে যায়। এই তারকে বলে ফিডার ওয়ার (Feeder wire)।

আমরা জানি, টিভি ট্রান্সমিশনের জন্য অত্যন্ত উচ্চ মেগাহাৎস্ ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করা হয়। এই ফ্রিকোয়েন্সি চ্যানেলগুলোকে বলে ভেরি হাই ফ্রিকোয়েন্সি চ্যানেল (VHF channels) এবং এর চেয়েও উচ্চ মেগা হাৎস্ ফ্রিকোয়েন্সিও ব্যবহার করা হয়। সেই ফ্রিকোয়েন্সিগুলোকে বলে আলট্রা হাই ফ্রিকোয়েন্সি চ্যানেল (UHF Channels).

VHF চ্যানেল (30 থেকে 300MHz) প্রধানতঃ টেলিভিশনে ব্যবহৃত হয়। UHF চ্যানেল (300 থেকে 3,000 MHz) তৈরী হয়েছে টেলিভিশনে আরো চ্যানেল বাড়াবার জন্য। বিভিন্ন ব্যাণ্ড অনুযায়ী এই চ্যানেলগুলোর একটা তালিকা 'তরঙ্গ বিস্তার' অংশে দেওয়া হয়েছে।

এই ইয়াগী-এ্যান্টেনা VHF চ্যানেলের জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজনীয় এ্যান্টেনা সিগন্যাল শক্তি 100 থেকে 2000 মাইক্রোভোল্টের মধ্যে থাকে।

সাধারণতঃ একটা রিফ্লেক্টর ও একটা ডাইরেকটর ইয়াগী এ্যান্টেনাতে ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজনে ডাইরেক্টরের সংখ্যা বাড়াতে হয়। এই এ্যান্টেনার গেইন 5 থেকে 7 ডেসিবল্ (db)এর মধ্যে থাকে।

ইনডোর এ্যান্টেনা

ট্র্যান্সমিশন সেন্টারের কাছাকাছি, খুব শক্তিশালী সিগন্যাল এরিয়ায় এই ইনডোর এ্যান্টেনা ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন আকৃতির ইনডোর এ্যান্টেনা বাজারে পাওয়া যায়। বেশীর ভাগ ইনডোর এ্যান্টেনাতেই টেলিস্কোপিক (Telescopic) ডায়পোল দণ্ড থাকে, যাকে বিভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে ছবি এবং শব্দ ধরা হয় এবং যখন ব্যবহৃত হয় না তখন ভাঁজ করে ঢুকিয়ে ছোট করে ফেলা যায়।

ফ্রিঞ্জ এরিয়া এ্যান্টেনা

যেখানে সিগন্যাল খুবই কম, সেখানে দরকার একটা উচ্চ গেইনসম্পন্ন এ্যান্টেনা। একটা ইয়াগী এ্যান্টেনাতে অনেকগুলো ডাইরেকটর লাগিয়ে সাধারণতঃ এই VHF চ্যানেলের গেইনকে বাড়ানো হয়। এই এ্যান্টেনা ব্যবহার করে 10 ডেসিবল্ এর চেয়েও বেশী গেইন পাওয়া সম্ভব।

একটা 9 এলিমেন্ট ফ্রিঞ্জ এরিয়া ইয়াগী এ্যান্টেনার ছবি (চিত্র ৩.১) দেওয়া হলো। এই এ্যান্টেনাগুলোতে সাধারণতঃ রিফ্লেক্টরের দৈর্ঘ্য, ডায়পোলের দৈর্ঘ্য থেকে 5% বড় হয়।

অনেক জায়গায় খুব দুর্বল সিগন্যাল ধরার জন্য 'বুষ্টার (Booster) ব্যবহার করা হয়। বুষ্টার, সিগন্যালকে ট্রানজিষ্টর সার্কিটের মাধ্যমে সম্প্রসারিত করে।

ইয়াগী এ্যান্টেনা ডিজাইন

$$\text{ডায়পোলের দৈর্ঘ্য (মিটারে)} \approx \frac{143}{f}$$

$$\text{রিফ্লেক্টরের দৈর্ঘ্য (মিটারে)} \approx \frac{152}{f}$$

$$\text{ডাইরেকটরের দৈর্ঘ্য (মিটারে)} \approx \frac{137}{f}$$

অতিরিক্ত ডাইরেক্টার 2·5 শতাংশ হারে পরবর্তী ক্ষেত্রগুলোতে কমতে থাকবে।

$$\text{রিফ্লেক্টর ও ডায়পোলের মাঝে দূরত্ব} = 0{\cdot}25\lambda = \frac{75}{f}$$

$$\text{ডাইরেকটর ও ডায়পোলের মাঝে দূরত্ব} = 0{\cdot}13\lambda = \frac{40}{f}$$

$$\text{ডাইরেকটর থেকে পরবর্তী ডাইরেকটরের দূরত্ব} = 0{\cdot}13\lambda = \frac{39}{f}$$

এখানে f হলো সেই চ্যানেলের ফ্রিকোয়েন্সি মাত্রার গড় মান।

অর্থাৎ ব্যাণ্ড I, চ্যানেল 4 হলে, f-এর মান 64·5 MHz [যেহেতু এই চ্যানেলটা 61 থেকে 68 MHz অবধি বিস্তৃত] এখানে মনে রাখতে হবে f-এর মান যেন অবশ্যই MHz-এ থাকে। না হলে MHz-এ পরিবর্তিত করে নিতে হবে।

ইন-লাইন এ্যান্টেনা

একটা ডায়পোলের মাধ্যমে উচ্চ এবং নীচু মাত্রার VHF ব্যাণ্ড ধরা সম্ভব নয়। এইজন্য অনেক সময় দু'টো ডায়পোল ব্যবহার করা হয়। ইন-লাইন এ্যান্টেনায় একটা হাফ-ওয়েভ ফোল্ডেড ডায়পোল এবং রিফ্লেক্টর ব্যবহার করা
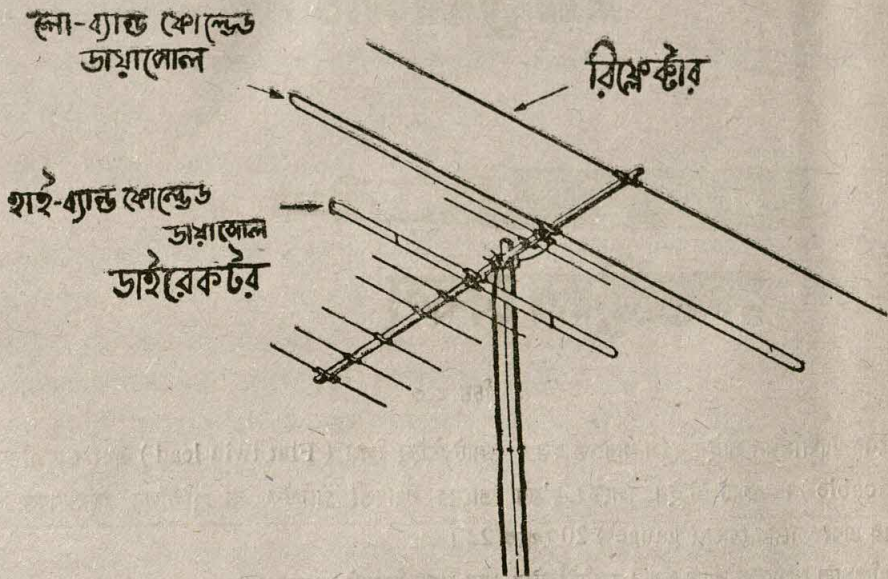
চিত্র ৩.২

হয় নীচু মাত্রার VHF ব্যাণ্ডের জন্য (54 থেকে 88 MHz) এবং একটু ছোট আর একটা হাফ-ওয়েভ ফোল্ডেড ডায়পোল ব্যবহার করা হয় উচ্চ VHF ব্যাণ্ড (174 থেকে 216 MHz) ধরার জন্য। এই ডায়পোল দু'টোর মধ্যবর্তী দূরত্ব, উচ্চ

ব্যাণ্ড-এর ফ্রিকোয়েন্সি অনুযায়ী, এক চতুর্থাংশ ওয়েভলেংগথ্-এর সমান হয়। এই এ্যান্টেনার ইনপুট রেজিস্টেন্স 150Ω। চিত্র ৩.২ তে একটা ইন-লাইন ইয়াগী এ্যান্টেনা দেখানো হলো।

ট্র্যান্সমিশন লাইন

এই ট্র্যান্সমিশন লাইনের মাধ্যমে এ্যান্টেনা সিগন্যালকে রিসিভারে পোঁছে দেওয়া হয়। যে প্রয়োজনীয় গুণগুলো এই ট্র্যান্সমিশন লাইনে থাকা দরকার, সেগুলো হলো।

(1) এই লাইনের মাধ্যমে যেন সিগন্যাল সর্বাপেক্ষা কম নষ্ট হয়।

(2) এই লাইনে যেন সিগন্যালের কোনো প্রতিফলন না ঘটে।

(3) এই লাইন যেন অন্য কোন বিপথগামী সিগন্যালকে না ধরে। এই জন্য খুব ভালো ধরনের রক্ষাকারী আবরণ দিয়ে এই তার ঢেকে দেওয়া উচিৎ।
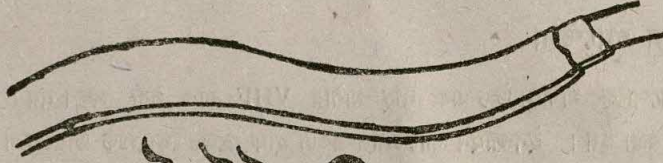
চিত্র ৩.৩

দু'ধরনের ট্র্যান্সমিশন লাইন বহুল ব্যবহৃত হয়। ফ্ল্যাট টুইন লিড (Flat twin lead) এবং কোএক্সিয়াল কেবল্ (Coaxial cable)। ফ্ল্যাট টুইন লিডের দু'টো তারের মধ্যবর্তী প্লাস্টিক বা পলিথিন আবরণযুক্ত দূরত্ব থাকে 1 সেন্টিমিটার এবং তারের গেজ (gauge) 20 থেকে 22।

কোএক্সিয়াল কেবলের ব্যাস হয় 1 সেন্টিমিটার, যার মধ্যে তিনটে আবরণ থাকে।

এ্যান্টেনার ফল্ট ও প্রতিকারের উপায়:

(1) স্ক্রীনে ছবির উপর হেলানো বা বাঁকা বার (Bar) আসছে।

প্রতিকার: অনেক সময় দু'টো টিভি-র এ্যান্টেনা বা ট্র্যান্সমিশন লাইন খুব কাছাকাছি থাকলে এই ফল্ট দেখা

যায়। সেক্ষেত্রে একটা সেটের অ্যান্টেনা খুলে, অপর সেটটা চালিয়ে দেখতে হবে। একটা অ্যান্টেনাকে কিছুটা সরিয়ে এবং দিক পরিবর্তন করেও চেষ্টা করা উচিৎ।

(2) ছবির 'কনট্রাস্ট' যথেষ্ট হচ্ছে না। কনট্রাস্ট কন্ট্রোলকে পুরো ঘোরালেও ছবি কেমন সাদা সাদা এবং ম্যাড়মেড়ে।

(3) ছবি স্থির নয়, রোল করছে। এমনকি সিঙ্ক কন্ট্রোল (Sync Control)-গুলো অ্যাডজাষ্ট করেও রোলিং বন্ধ হচ্ছে না।

(4) ছবি পাশাপাশি 'হরাইজেন্টাল রোল' করছে সঙ্গে কালো-সাদা হরাইজেন্টাল বার আসছে।

(5) ছবি, ওপর থেকে নিচে বা নিচে থেকে ওপরে ভার্টিকাল রোল করছে।

(6) স্ক্রীনে 'স্নো' আসছে। ছবি ও শব্দ নেই।

(7) স্ক্রীনে রাষ্টার আছে। ছবি ও শব্দ নেই।

(8) স্ক্রীনে অসংখ্য সাদা ছোট ছোট বিন্দু সঙ্গে ঝলক আসছে। মাঝে মাঝে হরাইজেন্টাল সরু সরু লাইন আসছে।

প্রতিকার ঃ প্রতিটা ক্ষেত্রেই অ্যান্টেনার দিক ঠিক আছে কী না দেখতে হবে। সেই সাথে ট্র্যান্সমিশন লাইনের তার গায়ে গায়ে লেগে গেছে বা কাটা আছে বা 'লুজ কানেকশন' আছে কী না দেখতে হবে।

(9) স্ক্রীনে সাদা আলোর ঝলক আসছে এবং ছবি রোল করছে।

প্রতিকার ঃ—ডায়পোলের কানেকশন লুজ বা খুলে গেছে কী না দেখতে হবে। ট্র্যান্সমিশন লাইনও 'লুজ কানেকশন' কী না দেখতে হবে।

(10) ছবির পাশে একটা ছবি তৈরী হচ্ছে বা পরপর অনেকগুলো 'গোষ্ট' (Ghost) তৈরী হচ্ছে।

প্রতিকার ঃ—ট্র্যান্সমিশন লাইনের 'লুজ কানেকশন' থাকতে পারে। অনেক সময়ই ট্র্যান্সমিশন ওয়ার অনেক বড় থাকে এবং সে'টা গুটিয়ে কয়েল করে তারপর প্রান্তটা রিসিভারে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে ন্যূনতম প্রয়োজন অনুযায়ী রেখে বাকীটা কেটে দৈর্ঘ্য ছোট করে ফেলতে হবে।

(11) স্ক্রীনে ছবি পরিস্কার আসছে না। আবছা ছবি (out of focus)।

(12) ছবি একটা হালকা কালো লাইনের মাধ্যমে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে।

প্রতিকার ঃ—অ্যান্টেনাকে ঘুরিয়ে সঠিক দিকে আছে কী না দেখতে হবে।

(13) ছবির কিছু অংশ পিকচার টিউবের থেকে কেটে যাচ্ছে।

প্রতিকার ঃ—অ্যান্টেনা এবং ট্র্যান্সমিশন লাইনের মধ্যে 'লুজ কানেকশন' পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

(14) ছবির মধ্যে কালো সাদা বার আসছে অথবা একটা হরাইজেন্টাল বার ক্রমাগত ছবির মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছে।

(15) শব্দের সাথে সাথে একাধিক কালো বার স্ক্রীনে আসছে। যখন শব্দ হচ্ছে না তখন এই বার থাকছে না। একে বলে সাউণ্ড বার (Sound bar)।

প্রতিকার ঃ—এ্যান্টেনা সঠিক দিক আছে কী না দেখতে হবে। দরকার হলে এ্যান্টেনাকে বর্তমান জায়গা থেকে খুলে অন্য একটা ভালো জায়গায় লাগাতে হবে।

ওপরের এই ফল্টগুলো অন্য কারণেও হয়। কিন্তু প্রথমেই এ্যান্টেনাটাকে পরীক্ষা করে নিয়ে টিভির অন্য অংশে হাত দেওয়া উচিৎ। টেলিভিশন শিক্ষার প্রাথমিক শর্ত হলো, সেটে হাত দেওয়ার আগে এ্যান্টেনার অবস্থান এবং অবস্থা পরীক্ষা করে নেওয়া। অনেক সময় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এ্যান্টেনা দেখা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সেক্ষেত্রে ন্যূনতম 'রোধ পরীক্ষা'টা অবশ্যই করে নেওয়া উচিৎ।

এ্যান্টেনার রোধ 3 থেকে 5 Ω-এর মধ্যে থাকে। এর চেয়ে বেশী বা কম রোধ পাওয়া গেলেই এ্যান্টেনায় কোনো ফল্ট আছে, ভাবতে হবে। এই রোধ আমরা এ্যান্টেনা লাগা অবস্থায় ট্রান্সমিশন ওয়ারের দু'প্রান্তে মিটার লাগিয়েই পেতে পারি। যদি মিটার কোনো রোধই না দেখায় তাহলে বুঝতে হবে তারের কোনো প্রান্ত খোলা বা কাটা (open or short) আছে।

সবসময় মনে রাখতে হবে, এ্যান্টেনা, টেলিভিশন রিসিভার সেটের একটা প্রধান অংশ এবং অধিকাংশ ফল্টের ক্ষেত্রে এ্যান্টেনার অবহেলাই কারণ।

টউনার লাগানো হয়.

এর্জিস মাত্রা হলো

তৈরী হয়। যাকে
(চিত্র—৪' .)-এর

রর কাজ এ্যাণ্টেনায়
ারিত করে লোকাল
নাথে মিশিয়ে একটা

আইএফ
খারে

৪

আর এফ টিউনার

টেলিভিশন সেটে, VHF মাত্রার 3 থেকে 12 চ্যানেল ধরার জন্য যে দু' ধরনের টিউনার লাগানো হয়, সেগুলো হলো,

(1) টারেট টিউনার (Turret Tuner)

(2) ওয়াফার টিউনার (Wafer Tuner)

টিউনারকে সক্রিয় করার জন্য +B সাপ্লাই ভোল্টেজ (12V) দরকার এবং এর কার্যকরী এজিসি মাত্রা হলো 50 ডেসিবল্ ।

আর এফ এ্যামপ্লিফায়ার, লোকাল অসিলেটর আর মিক্সার মিলে আর এফ টিউনিং সেকশন তৈরী হয়। যাকে সাধারণতঃ বলা হয় 'টিউনার' বা 'ফ্রন্ট এণ্ড' (Front end)। টিউনারের একটা ব্লক ডায়াগ্রাম (চিত্র—৪ .) -এর সাহায্যে দেখানো হয়েছে যে একটা টিউনার সার্কিট কীভাবে কাজ করে।

আমরা জানি, এ্যান্টেনা থেকে সিগন্যাল ধরার পর প্রথমেই দেওয়া হয় টিউনারে। এই টিউনারের কাজ এ্যান্টেনায় ধরা অনেক সিগন্যাল থেকে নির্দিষ্ট একটা চ্যানেল সিগন্যাল বেছে নেওয়া, তারপর তাকে সম্প্রসারিত করে লোকাল অসিলেটরের কনটিনিউয়াস ওয়েভ (continuous wave) বা ক্রমাগত নির্গত তরঙ্গ আউটপুটের সাথে মিশিয়ে একটা মধ্যবর্তী ফ্রিকোয়েন্সি তৈরী করে পরবর্তী অংশে পাঠিয়ে দেওয়া।

টিউনারের মধ্যে থাকে তিনটে অংশ। সেগুলো হলো,

(1) আর এফ এ্যাম্‌প্লিফায়ার (RF amplifier)

(2) লোকাল অসিলেটর (Local oscillator)

(3) মিক্সার (Mixer).
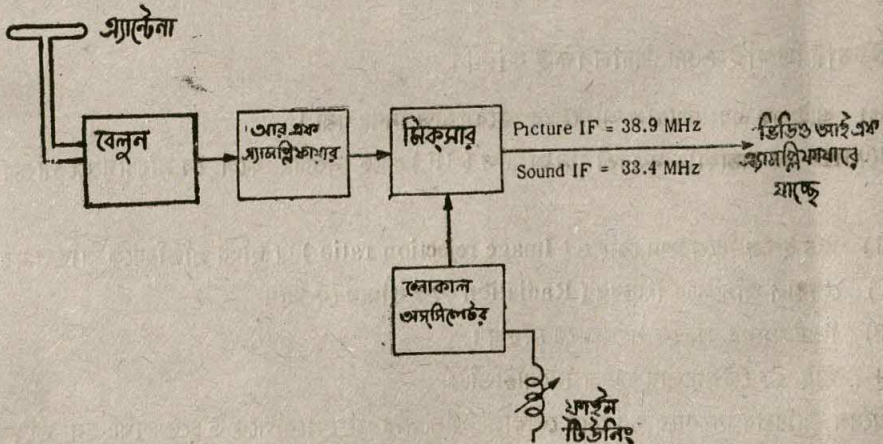
চিত্র ৪.১

লোকাল অসিলেটর সমস্ত প্রয়োজনীয় ষ্টেশনকে টিউন্ (Tune) করে। এর ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিটা চ্যানেলের জন্যই খুব কার্যকরী, যা আর এফ ফ্রিকোয়েন্সিগুলোকে স্থির করে এবং আই এফ সেকশনের পাস্-ব্যাণ্ড (Pass-band) এ সঠিক ফ্রিকোয়েন্সিগুলো পাঠিয়ে দেয়।

টিউনারের কার্যপ্রণালী

টিউনারের ব্লক ডায়াগ্রামে (চিত্র—৪.১) দেখানো হয়েছে যে সঠিক চ্যানেলকে বেছে নেওয়ার কাজ, তিনটে অংশের বা ষ্টেজের সমস্ত টিউনড্ সার্কিটের ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

যে চারটে টিউনড্ সার্কিট ট্রানজিষ্টর চালিত টিউনারগুলোতে পাওয়া যায়, সেগুলো হলো

(1) ইনপুট টিউনড্ সার্কিট যা আর এফ এ্যামপ্লিফায়ারে যাচ্ছে।

(2) আর এফ এ্যামপ্লিফায়ার অংশের আউটপুট টিউনড্ সার্কিট।

(3) ইনপুট টিউনড্ সার্কিট, যা মিক্সারে যাচ্ছে।

(4) লোকাল অসিলেটর টিউনড্ সার্কিট।

প্রতিটা টিউনড্ সার্কিটেই আছে একটা কয়েল এবং একটা ক্যাপাসিটর। ফাইন টিউনিং কণ্ট্রোলকে পরিবর্তিত করে, টিভি রিসিভার অনুযায়ী সঠিক ছবি ও শব্দের জন্য আলাদা আলাদা মধ্যবর্তী ফ্রিকোয়েন্সি পাওয়া যায়। স্ক্রীনে সুন্দর ছবি আসার অর্থই হলো লোকাল অসিলেটর ফ্রিকোয়েন্সি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত আছে।

টিউনার থেকে বেরোনো আই এফ সিগন্যাল, একটা ছোট কোএক্সিয়াল কেবল্ (Coaxial Cable) এর মাধ্যমে প্রথম পিক্চার আই এফ এ্যাম্প্লিফায়ারে দেওয়া হয়। এই টিউনার অন্য একটা ছোট চেসিসের সাথে লাগানো থাকে। এই সাব চেসিসে (sub-chesis) রাখা টিউনারের সাথে প্রধান চেসিসের এজিসি ও +B সাপ্লাই যুক্ত থাকে।

টিউনার সার্কিট একটা মজবুত ও সুরক্ষিত বাক্সের মধ্যে ঢোকানো থাকে এবং সাধারণতঃ টিউনারের যাবতীয় কানেকশন, টিউনারের ওপরের অংশে থাকে। টিউনার ডিজাইন টেকনিক, UHF-এর জন্য এতোটাই পরিবর্তিত হয় যে, সমস্ত মাল্টি চ্যানেল টিভি রিসিভারকেই VHF ও UHF-এর জন্য আলাদা আলাদা টিউনার লাগাতে হয়।

টিউনার ডিজাইন-এর প্রধান কিছু কারণ।

(ক) আই এফ এবং লোকাল অসিলেটর ফ্রিকোয়েন্সি নির্ণয় করা।

40MHz এর কাছাকাছি মধ্যবর্তী ফ্রিকোয়েন্সি (IF) বেছে নেওয়ার ফলে যে সুবিধাগুলো পাওয়া যায় সেগুলো হলো,

(1) উচ্চ ইমেজ রিজেকশন রেশিও (Image rejection ratio) বা ছবির প্রতিবিম্বকে বাতিল করার হার।

(2) লোকাল অসিলেটর বিচ্ছুরণ (Radiation)-কে কমিয়ে দেওয়া।

(3) ডিটেকশনের কাজকে সহজ করে দেওয়া।

(4) আই এফ ষ্টেজগুলোয় ভালো সিলেক্টিভিটি*

চ্যানেল ক্যারিয়ার ফ্রিকোয়েন্সির চেয়ে লোকাল অসিলেটর ফ্রিকোয়েন্সিকে উঁচুতে রাখা হয় তবে এই অসিলেটর

* সিলেক্টিভিটির অর্থ হলো ট্রান্সমিশন কেন্দ্র থেকে বিনা বাধায় সিগন্যাল গ্রহণের শক্তি।

ফ্রিকোয়েন্সির মাত্রা অপেক্ষাকৃত খুবই অল্পমাত্রার মধ্যে বেঁধে ফেলা হয়, যার ফলে সমস্ত ফ্রিকোয়েন্সি মাত্রাতেই একটা ধ্রুবক ও স্থায়ী আউটপুট সমৃদ্ধ অসিলেটর ডিজাইন করা অনেক সহজ হয়ে যায়।

মধ্যবর্তী ফ্রিকোয়েন্সিগুলো, বিভিন্ন টিভি সিস্টেমের প্রতিটা চ্যানেলের সমস্ত ব্যাণ্ডউইডথ্ অনুযায়ী পরিমাপের ভিত্তি হিসেবে রাখা হয়। ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট মোনোক্রোম সিস্টেমে এই ছবির আই এফ = 38·9 MHz ও শব্দের আই এফ = 33·4 MHz।

(খ) আর এফ এ্যাম্‌প্লিফায়ার ষ্টেজের প্রয়োজনীয়তা।

এমনিতে আর এফ এ্যাম্‌প্লিফায়ারে না দিয়ে, সরাসরি সিগন্যালকে মিক্সারের টিউনড্ ইনপুট সার্কিটে দিয়ে দেওয়া যেতো তবে ইমেজ সিগন্যালের অসুবিধা, লোকাল অসিলেটর থেকে বিচ্ছুরণ এবং মিক্সারে পরিবর্তনজনিত ক্ষতি (conversion loss)-কে দূর করার জন্য আর এফ এ্যাম্‌প্লিফায়ার স্টেজ ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কারণ হলো, এই এ্যাম্‌প্লিফায়ার স্টেজের ফলে যথেষ্ট আর এফ সিগন্যাল মিক্সারে পৌঁছোয়, যার ফলে পরিষ্কার ছবি পাওয়া যায়, ছবিতে কোনো 'স্নো' থাকে না। ভিডিও সিগন্যালে প্রচুর নয়েজ সিগন্যাল (Noise Signal) থাকলে এই স্নো হয়। সিগন্যালকে মেশানোর ফলে মিক্সার সার্কিটে প্রচুর নয়েজ উৎপন্ন হয়। একমাত্র যে স্থানগুলো ট্রান্সমিটার থেকে খুব কাছে আছে সেখানে সিগন্যাল যথেষ্ট ভালো থাকে এবং নীচু নয়েজ আর এফ এ্যামপ্লিফায়ার স্টেজ (যার গেইন 25 ডেসিবল্) দরকার হয়, যাতে সিগন্যাল-নয়েজ অনুপাত 30 : 1। ফ্রিঞ্জ এরিয়ায়, যেখানে সিগন্যাল খুবই অল্প ও দুর্বল, সেখানে একটা অতিরিক্ত আর এফ এ্যামপ্লিফায়ার লাগিয়ে সিগন্যাল-নয়েজ অনুপাতে সঙ্গতি আনা হয়। এই অতিরিক্ত এ্যামপ্লিফায়ারকে বলে বুস্টার (Booster)।

সমস্ত টিউনার ডিজাইনেই, আর এফ এ্যামপ্লিফায়ারের গেইনকে নিয়ন্ত্রিত করে এজিসি ভোল্টেজ এবং তার ফলে ইনপুট সিগন্যালের যে কোনো রকম পরিবর্তনই বাধাপ্রাপ্ত হয়। 400 মাইক্রো ভোল্টের ইনপুট সিগন্যালই স্নো মুক্ত ছবির পক্ষে যথেষ্ট।

(গ) কাপলিং নেটওয়ার্ক

আর এফ এবং আই এফ সেকশনে প্রয়োজনীয় সিলেক্টিভিটি পাওয়ার জন্য সমান্তরাল টিউনড্ নেটওয়ার্ককে ব্যবহার করা হয়। সবচেয়ে কম শক্তির ক্ষয় (Power loss)-এর জন্য, কাপলিং নেটওয়ার্ককে একটা স্টেজের আউটপুট ইম্পিডেন্স এবং পরবর্তী স্টেজের ইনপুট ইম্পিডেন্স-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিৎ।

ট্রানজিস্টর এ্যাম্‌প্লিফায়ার, যেখানে ইনপুট সার্কিটও কিছু শক্তি নিয়ে নেয়, সেখানে দু'টো স্টেজের মধ্যে কাপলিং নেটওয়ার্ককে এমনভাবে ডিজাইন করতে হয় যেন একটা স্টেজের আউটপুট ও পরবর্তী স্টেজের ইনপুটের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী শক্তি স্থানান্তরিত (Transfer) হয়। তবে কাপলিং ডিজাইন বাস্তবে বেশ জটিল হয়ে যায় কারণ ট্রানজিস্টরে আউটপুট ও ইনপুট ইম্পিডেন্সের মধ্যে তফাৎটা বেশ বড় থাকে, যেটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 'কমন বেস কনফিগারেশন'এ উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সিতে ইনপুট ইম্পিডেন্স ওহমের কিছু দশকের ঘরে থাকে, কিন্তু আউটপুটে সেটাই দাঁড়ায় অনেক দশক কিলো ওহমে।

টিউনার সার্কিট

ট্র্যানজিস্টর দিয়ে তৈরী টিউনারে, সাধারণতঃ তিনটে ট্র্যানজিস্টর ব্যবহার করা হয়, প্রতিটা অংশে অর্থাৎ, আর এফ এ্যাম্‌প্লিফায়ার, লোকাল অসিলেটর আর মিক্সার সার্কিট—প্রতিটাতে একটা করে।

প্রতিটা টিউনারেই একটা সিঙ্গল টিউনড্‌ সার্কিটকে এ্যান্টেনা ও আর এফ এ্যামপ্লিফায়ার-এর মাঝে কাপলিং করা হয় এবং ডবল টিউনড্‌ সার্কিট ব্যবহার করা হয় আর এফ এ্যামপ্লিয়ার ও মিক্সারের মধ্যে।

(ক) প্রশমিতকরণ (Neutralization)

অবাঞ্ছিত ফিডব্যাক-এর কারণে ইলেকট্রোডের মধ্যে ক্যাপাসিটেন্স, ট্র্যানজিস্টর সার্কিটে খুব বেশী হয়। এটা প্রশমিত হওয়া প্রয়োজন। একটা ট্র্যানজিস্টর এ্যামপ্লিফায়ার সার্কিটে, সিগন্যালকে যখন কালেকটর-বেস জাংশনের মধ্যে দিয়ে কালেকটর থেকে বেস-এ পাঠানো হয়, তখন কালেকটর-বেস জাংশন ক্যাপাসিটেন্স, হয় পুনরুৎপাদক (Regenerative) হয় নতুবা উৎপাদকহীন (Degenerative) হয়—সেটা নির্ভর করে কালেকটর লোডের চরিত্র ও সিগন্যাল ফ্রিকোয়েন্সির ওপর। তাই, কালেকটর থেকে বেস-এ তৈরী করা হয় নিউট্রালাইজিং সিগন্যাল, যা অপ্রয়োজনীয় ফিডব্যাককে বাতিল করে দেয়।

বিভিন্ন ধরনের টিউনার

চিত্র ৪.২
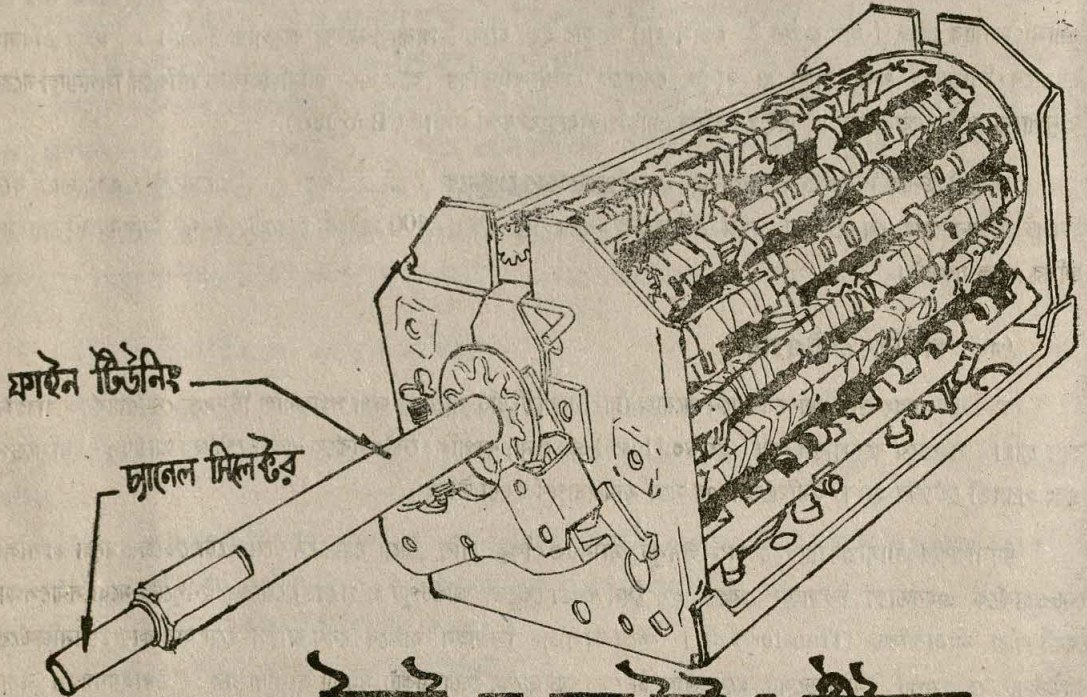
প্রতিটা টিভি রিসিভারেরই আলাদা আলাদা VHF ও UHF টিউনার থাকে, তবে UHF দরকার লাগে না বলে VHF টিউনারই বেশী প্রচলিত। VHF টিউনার সিঙ্গল চ্যানেল বা মাল্টি চ্যানেল হতে পারে, যাতে সে একসাথে ব্যাণ্ড I এবং ব্যাণ্ড III-র সমস্ত চ্যানেল ধরতে পারে। VHF টিউনার টারেট টাইপ অথবা রোটারি-ওয়াফার টাইপের হয়।

টারেট বা ড্রাম টাইপ টিউনার (Turret or drum type Tuner)

বিভিন্ন চ্যানেলের জন্য কয়েলগুলো একটা সরু ছিদ্রযুক্ত ড্রাম-এর সাথে যুক্ত থাকে বলে এই টিউনারকে টারেট অথবা ড্রাম টাইপ টিউনার বলা হয়। চ্যানেল সিলেকটর এই ড্রামকে ঘোরায়। টিউনড্ সার্কিটগুলো বিভিন্ন চ্যানেলের জন্য আলাদা আলাদা স্ট্রিপ (Strip)-এর সাথে যুক্ত থাকে। এই চ্যানেলগুলোকে সঠিকভাবে বেছে নেওয়ার জন্য টারেটকে ঘোরাতে হয়, যা আসলে যুক্ত বিভিন্ন চ্যানেলের জন্য নির্দিষ্ট স্ট্রীপের কয়েলগুলোর সাথে। প্রতিটা স্ট্রীপেই আর এফ এ্যামপ্লিফায়ার, মিক্সার ও লোকাল অসিলেটরের জন্য কয়েল আছে। চিত্র—৪.২-তে একটা টারেট বা ড্রাম টাইপ টিউনারের আইসোমেট্রিক (Isometric) ছবি দেওয়া হলো।

ওয়াফার বা ইনক্রিমেন্টাল টিউনার (Wafer or Incremental Tuner)

এই টিউনার ওয়াফার সুইচ গঠন-সমৃদ্ধ, যেখানে সমান্তরাল সারিতে গ্যালারির মতো ওয়াফার সুইচগুলোর সাহায্যে সঠিক আর এফ, মিক্সার এবং অসিলেটর কয়েলগুলো নির্বাচন করা হয়। এই কয়েলগুলো সাধারণতঃ সুইচ-এর বাইরের রিম (Rim)-এর সঙ্গে জড়ানো থাকে। নীচু ফ্রিকোয়েন্সির চ্যানলের জন্য অল্প পাক, যা ক্রমশঃ উচ্চ
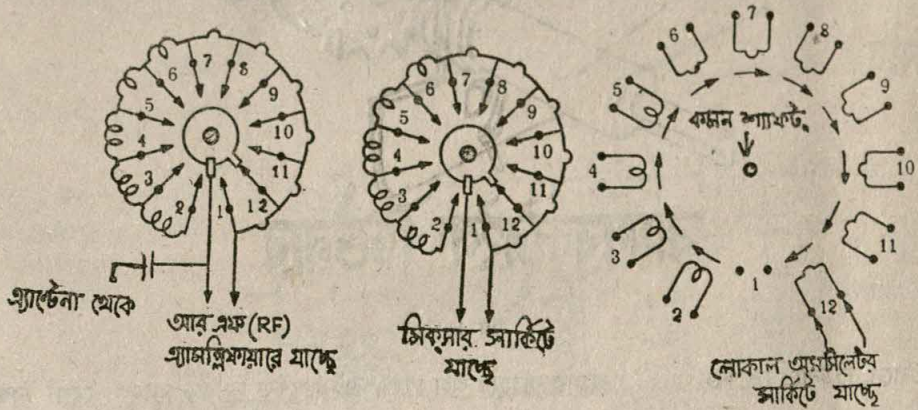
চিত্র ৪.৩ বিভিন্ন ওয়াফার সুইচ

ফ্রিকোয়েন্সির চ্যানেলের জন্য ধীরে ধীরে আরো কমতে থাকে। ওয়াফার সুইচ্‌কে প্রতিটা চ্যানেলের আর এফ, মিক্সার এবং অসিলেটর কয়েলের সেটের সাথে কানেকশনের জন্য ঘোরানো হয়। চিত্র—৪.৩-তে একটা স্কিমেটিক (Schematic) ছবির মাধ্যমে VHF টিউনার-ওয়াফার সুইচগুলো দেখানো হয়েছে।

এটা অবশ্যই লক্ষ্য করার বিষয় যে, আর এফ এ্যামপ্লিফায়ার, লোকাল অসিলেটর এবং মিক্সার স্টেজ—প্রতিটাই

আলাদা আলাদা ওয়াফার সুইচ, যা একটা শ্যাফট্ (Shaft)-এই একত্রে থাকে। প্রথম অংশেই থাকে অসিলেটর কয়েলগুলো কারণ তা'তে ইন্ ্কটেন্সকে সুবিন্যস্ত করে ফ্রিকোয়েন্সিকে সেট করা সুবিধাজনক হয়।

এই টিউনারকে ইনক্রিমেন্টাল টিউনারও বলে কারণ এতে চ্যানেলের পরিবর্তন ঘটে, সমস্ত ইনডাক্টেন্সের সেকশনগুলোকে অগ্রগামী বেছে নেওয়ার মাধ্যমে। চিত্র ৪.৪-এ এই ধরনের টিউনারের ছবি দেওয়া হলো।
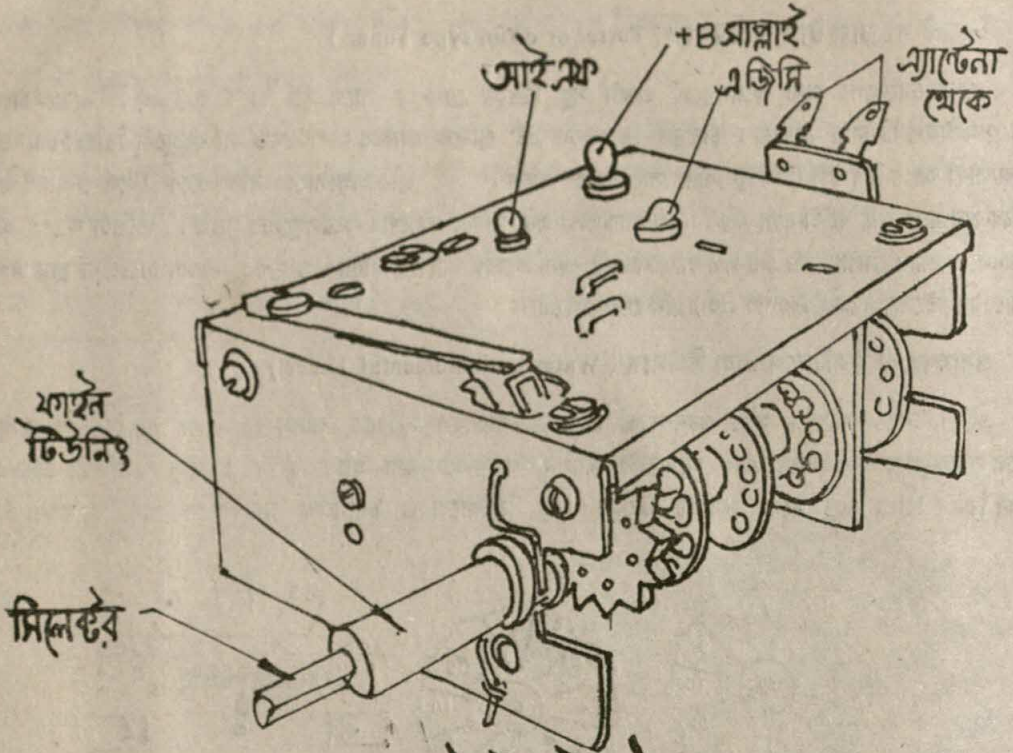
চিত্র ৪.৪

বর্তমানে, টিউনারে প্রিন্টেড্ সার্কিট ওয়াফার ব্যবহার করা হচ্ছে, এই প্রিন্টেড সার্কিড অনেক বেশী বিশ্বাসযোগ্য, একরেখীকরণ (Alignment) এর ক্ষেত্রে মসৃন এবং সর্বোপরি অনেক অল্প উৎপাদন মূল্যর কারণে বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে।

চ্যানেল টিউনিং (Channel Tuning)

এই টিউনারে প্রতিটা চ্যানেলের জন্য আলাদা এ্যাডজাষ্টমেন্টের দরকার। ফাইন টিউনিং-এর জন্য, অসিলেটর কয়েল তৈরীর সময় সাধারণতঃ এ্যালুমিনিয়াম বা পেতলের স্ক্রু'কে কোর (Core) হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই কোরকে জড়িয়ে থাকে প্লাস্টিকের গিয়ার-হুইল। যখন ফাইন কন্ট্রোলকে হোল্ডিং স্প্রিং-এর বিপক্ষে ঠেলে দেওয়া হয়, তখন

এই প্লাস্টিক গিয়ার হুইল কার্যকরী হয়। যখন ফাইন টিউনিং কন্ট্রোলকে ঘোরানো হয় তখন কোর, কয়েলের ভেতরে ঢুকে যায় এবং প্রয়োজনীয় চ্যানেলটাকে সুবিন্যস্ত করে, যার ফলে ছবি ও শব্দ পরিষ্কার হয়।

এখন টিভি রিসিভারে, স্বয়ংক্রিয় ফ্রিকোয়েন্সি টিউনিং বা এ এফ টি (Automatic frequency Tuning or AFT) টিউনারের লোকাল অসিলেটরের সঙ্গে লাগানো হচ্ছে।

VHF টিউনারের বিভিন্ন সেকশন

(ক) বেলুন-ইনপুট ট্রান্সফরমার

এ্যান্টেনার ইমপিডেন্সের সাথে টিউনারের ইনপুট ইমপিডেন্সের সামঞ্জস্য থাকা খুবই জরুরী। এই ম্যাচিং থাকলে এ্যান্টেনা থেকে টিউনারে সবচেয়ে বেশী সিগন্যাল পৌঁছোয় এবং সিগন্যালের প্রতিফলনকেও বন্ধ করা যায়। বেলুন, এই 'ফিডার ওয়ার' বা ট্রান্সমিশন লাইন-এর 300Ω ইমপিডেন্সের এবং টিউনারের আর এফ এ্যামপ্লিফায়ারের 75Ω ইনপুট ইমপিডেন্সের মধ্যে ম্যাচিং ঘটায়।

বেলুন ট্রান্সফরমারে একটা ফেরিট কোর-এর ওপরে দুটো 150Ω কোয়ার্টার-ওয়েভ সেকশন (Quarter-wave section) তার জড়ানো থাকে। চিত্র—৪.৫ দেখলে ব্যাপারটা সহজ হবে।

এই ট্রান্সফরমারের একটা প্রান্তে সমান্তরালে দু'টো কোয়ার্টার-ওয়েভ লাইন থাকায় 75Ω ইমপিডেন্স দিচ্ছে এবং অপর প্রান্তে দু'টো লাইন সিরিজে থেকে দিচ্ছে 300Ω ইমপিডেন্স। যদি ট্রান্সমিশন তার হিসেবে এ্যান্টেনাতে কোএক্সিয়াল (Coaxial) তার ব্যবহার করা হয়, তাহলে ম্যাচিং-এর জন্য বেলুন ট্রান্সফরমারের উভয় প্রান্তেই সমান্তরাল কানেকশন-এর ব্যবস্থা করতে হয়।

দু'টো (200pf) ক্যাপাসিটর C1 ও C2-কে এ্যান্টেনা থেকে চেসিসকে আলাদা করার কাজে নিরাপত্তার কারণে
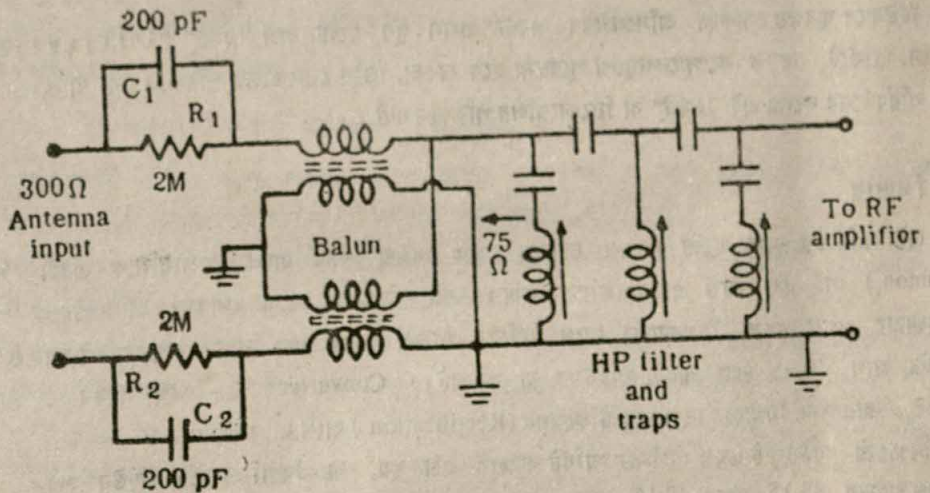
চিত্র ৪.৫ বেলুন ট্রান্সফরমার সার্কিট

ব্যবহার করা হয়। হঠাৎ এ্যান্টেনার ওপর বাজ পড়লে এটা টিভি রিসিভারকে বাঁচাতে সাহায্য করে। সান্ট

রেজিষ্টর R1 ও R2 (2MΩ), ক্যাপাসিটরের মধ্যে ধরে রাখা কোনো ষ্ট্যাটিক চার্জ থাকলে, সেটাকে ডিসচার্জ করে দেয়।

আর এফ এ্যাম্প্লিফায়ার

যথেষ্ট দুর্বল সিগন্যালকেও প্রয়োজনীয় 'গেইন' দেয় এই আর এফ এ্যাম্প্লিফায়ার অংশ। এছাড়াও লোকাল অসিলেটর থেকে সিগন্যালের বিকীরণ বন্ধ করতে এবং অন্যান্য সিগন্যালকে তাড়াতে এই অংশ যথেষ্ট সাহায্য করে। এই অংশের সিগন্যাল বিস্তার (Amplitude) খুব ছোট হওয়ার জন্য এবং এই সিগন্যালের বিকৃতি কম হওয়ার কারণে এজিসি (Automatic gain control)-র পক্ষে এটা খুবই কার্যকরী। বস্তুতঃ আর এফ এ্যাম্প্লিফায়ার দিয়ে এজিসির ব্যবহারকে দেরী করানো হয় কারণ এর ফলে দুর্বল সিগন্যালের ক্ষেত্রেও সিগন্যাল/নয়েজ (Signal/noise) হারকে যথেষ্ট ভালো রাখা যায়।

লোকাল অসিলেটর

লোকাল অসিলেটর একটা অপরিবর্তিত ক্রমাগত তরঙ্গ-ভোল্টেজ, যাকে সিনুসয়ডাল (Sinusoidal) ভোল্টেজ বলা হয়, তৈরী করে মিক্সার-এ পাঠায়, যেখানে আগত আর এফ সিগন্যালের সাথে মিশে, ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তিত হয়ে আই এফ ব্যাণ্ড হয়ে যায়। যখনই কোনো অন্য চ্যানেল ধরা হয়, তখনই লোকাল অসিলেটর ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তিত হয় এবং সেই পরিবর্তিত লোকাল অসিলেটর ফ্রিকোয়েন্সি এবং টিউনড্ চ্যানেল ক্যারিয়ার ফ্রিকোয়েন্সির মধ্যবর্তী ফ্রিকোয়েন্সিও পরিবর্তিত হয়। ফাইন টিউনিং কন্ট্রোল শুধুমাত্র অসিলেটর ফ্রিকোয়েন্সিকে অল্প হারে পরিবর্তিত করতে পারে।

টিউনারে ব্যবহৃত লোকাল অসিলেটরের একটা প্রধান গুণ হলো, এটা 'ড্রিফট্' (Drift) মুক্ত। তাপমাত্রার পরিবর্তন, সার্কিটে ব্যবহৃত কম্পোনেন্টগুলো পুরোনো হয়ে যাওয়া, ডিসি ভোল্টেজের পরিবর্তন এবং অসিলেটর লোডের হারের পরিবর্তনের ফলের এই 'ড্রিফট্' বা ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তন ঘটে।

মিক্সার

এই সার্কিটের কাজ হলো বিভিন্ন চ্যানেল থেকে আগত আর এফ ফ্রিকোয়েন্সিকে একটা সার্বজনীন (Common) আই এফ ব্যাণ্ড এ রূপান্তরিত করা। এটা মিক্সারের মধ্যে লোকাল অসিলেটরকে আর এফ এ্যাম্প্লিফায়ার থেকে পাওয়া সিগন্যালের সাথে মিশিয়ে পাওয়া যায়। এক কথায় বলা যায় মিক্সার ও লোকাল অসিলেটর অংশ মিলে, প্রায় একটা পরিবর্তক বা কনভার্টার (Converter) এর কাজ করে। ফ্রিকোয়েন্সিকে পরিবর্তিত করার জন্য, মিক্সারের মধ্যে রেকটিফিকেশন (Rectification) অংশ থাকা প্রয়োজন।

মিক্সারের আউটপুটে ডবল টিউনড্ সার্কিট ব্যবহার করা হয়, যা বিস্তারিত ভাবে টিউন করা। যারফলে এই অংশ শুধুমাত্র 33·15 থেকে 40·15 MHz এর মধ্যবর্তী ব্যাণ্ডগুলোই ধরে রাখে এবং বাকী ফ্রিকোয়েন্সির ব্যাণ্ডগুলোকে বর্জন করে। ট্রানজিষ্টর ব্যবহৃত মিক্সারে বেশীর ভাগ VHF চ্যানেলের ক্ষেত্রে 15 থেকে 20 ডেসিবল্ পাওয়ার গেইন পাওয়া যায়।

টিউনারের কিছু সাধারণ ফল্ট

(1) রাষ্টারের মধ্যে স্নো রয়েছে। শব্দ ঠিকই আছে কিন্তু ছবি নেই।

আর এফ এ্যামপ্লিফায়ার বা লোকাল অসিলেটর স্টেজ অথবা এ্যান্টেনা সার্কিটের মধ্যে ফল্ট আছে। এই ফল্টকে দূর করার জন্য নিম্নলিখিত উপায়ে এগোতে হবে।

(ক) এ্যান্টেনার ট্রান্সমিশন ওয়ারকে খুলে ফেলে, একটা স্ক্রু-ড্রাইভার-এর ব্লেড দিয়ে ঐ এ্যান্টেনা টার্মিনালকে শর্ট করে দিতে হবে। যদি স্ক্রীনে একটা ফ্লাশ হয় অর্থাৎ শর্ট করার সঙ্গে সঙ্গে গোটা স্ক্রীনে সাদা আলোর ঝলক আসে, তাহলে বুঝতে হবে আর এফ এ্যামপ্লিফায়ার অংশ ঠিক চলছে এবং ফল্ট রয়েছে এ্যান্টেনা সার্কিটে।

(খ) ট্রান্সমিশন ওয়ার বা ফিডার ওয়ারের কনটিনিউইটি দেখতে হবে। এ্যান্টেনা অংশের সোল্ডারিং পয়েন্টটা ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে এবং অবশ্যই দেখতে হবে এ্যান্টেনার দিক্ (Direction) সঠিক আছে কী না।

(গ) যদি এই দু'টো পরীক্ষার পরও ফল্ট থেকেই যায়, সেক্ষেত্রে বেলুন সার্কিট'টা দেখতে হবে। এবং +B ভোল্টেজ ও এজিসি ভোল্টেজটাও দেখতে হবে।

(2) রাষ্টার সাদা হয়ে গেছে এবং শব্দ ও ছবি নেই।

এ্যান্টেনা থেকে ডিটেক্টর অংশের মধ্যে বিভিন্ন কারণে এই ফল্ট হতে পারে। এ্যান্টেনার এবং মিক্সার স্টেজের মধ্যে ফল্ট হলেও এ ধরনের উপসর্গ পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে +B ভোল্টেজ ও এজিসি ভোল্টেজ দেখতে হবে। যদি এ'দুটো ভোল্টেজ ঠিক থাকে তাহলে ভিডিও আই এফ অংশটা পরীক্ষা করতে হবে।

(ক) প্রথমে স্ক্রু-ডাইভারের ব্লেড দিয়ে আই সি CA 3068-এর 6 নং পিনকে স্পর্শ করলে যদি স্নো না আসে তাহলে বুঝতে হবে টিউনারের মিক্সার স্টেজেই ফল্ট আছে। সেক্ষেত্রে টিউনারের ঢাকনা বা কভারটা খুলে মিক্সার ট্রানজিস্টরের বেসটাকে স্পর্শ করলে যদি স্ক্রীনে আলোর কিছু আঁকাবাঁকা দাগ ফুটে ওঠে তাহলে টিউনারটা বদলে একটা ভালো টিউনার লাগাতে হবে।

(3) শব্দ ঠিক আছে কিন্তু ছবি আবছা বা স্নোযুক্ত।

টিউনারের ফাইন টিউনিং অংশ পরীক্ষা করতে হবে। প্রথমে বাইরে থেকে ফাইন টিউনিং নব্ ঘুরিয়ে দেখতে হবে। যদি ছবির কোনো পরিবর্তন না হয় তা'হলে টিউনারটা বদলে দিতে হবে।

টিউনার আসলে একটা ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল (Electro mechanical) যন্ত্র। তাই ইলেকট্রিক্যাল অংশের সাথে সাথে মেকানিক্যাল বা যান্ত্রিক অংশটাও অনেক সময় ফল্ট সৃষ্টি করে।

টিউনারের মেকানিক্যাল অংশের মধ্যে আছে ব্যাণ্ড সিলেকটর সুইচ্, যার মধ্যে থাকে অনেকগুলো ওয়াফার (wafer) এবং স্লাইডিং কনট্যাক্ট (Sliding Contact)। এগুলোকে পরিস্কার করার দরকার হয়। বাজারে 'টিউনার ক্লিনিং সলভেন্ট' পাওয়া যায়। টিউনারের মধ্যে স্প্রে (Spray) করে চ্যানেল সিলেকশন নব্ কে আস্তে আস্তে ঘোরালেই এই যান্ত্রিক অংশটা পরিস্কার হয়ে যায়।

অনেক সময় ওয়াফারগুলোর ওপরে কার্বনের দানা জমে যায়। দীর্ঘদিন ধরে জমতে থাকলে এই কার্বনের দানাগুলোই কালো ছিট্ ছিট্ দাগে পরিণত হয়। যার ফলে ইলেকট্রিক্যাল কনট্যাক্টগুলো দুর্বল হয়ে যায়।

এক্ষেত্রে টিউনারের কভারটা খুলে একটা নরম ব্রাশ দিয়ে আস্তে আস্তে ঐ কালো দাগগুলো তুলে ফেলে 'টিউনার ক্লিনিং সলভেন্ট' স্প্রে করে দিতে হয়।

৫

পিকচার টিউব

টেলিভিশনের একটা প্রধান অংশ অংশ হলো পিকচার টিউব। এটা আসলে একটা ক্যাথোড রে টিউব, যার সংক্ষিপ্ত নাম সি আর টি (Cathode Ray Tube or CRT)। এই পিকচার টিউবই হলো একটা টেলিভিশন রিসিভার সেটে, ছবির শেষ বা ফাইনাল আউটপুট কারণ এই পিকচার টিউবই ট্রান্সমিশন কেন্দ্র থেকে পাঠানো ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালকে সমমাপের ছবিতে রূপান্তরিত করে। আধুনিক ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট টেলিভিশনে, যা'কে মোনোক্রোম
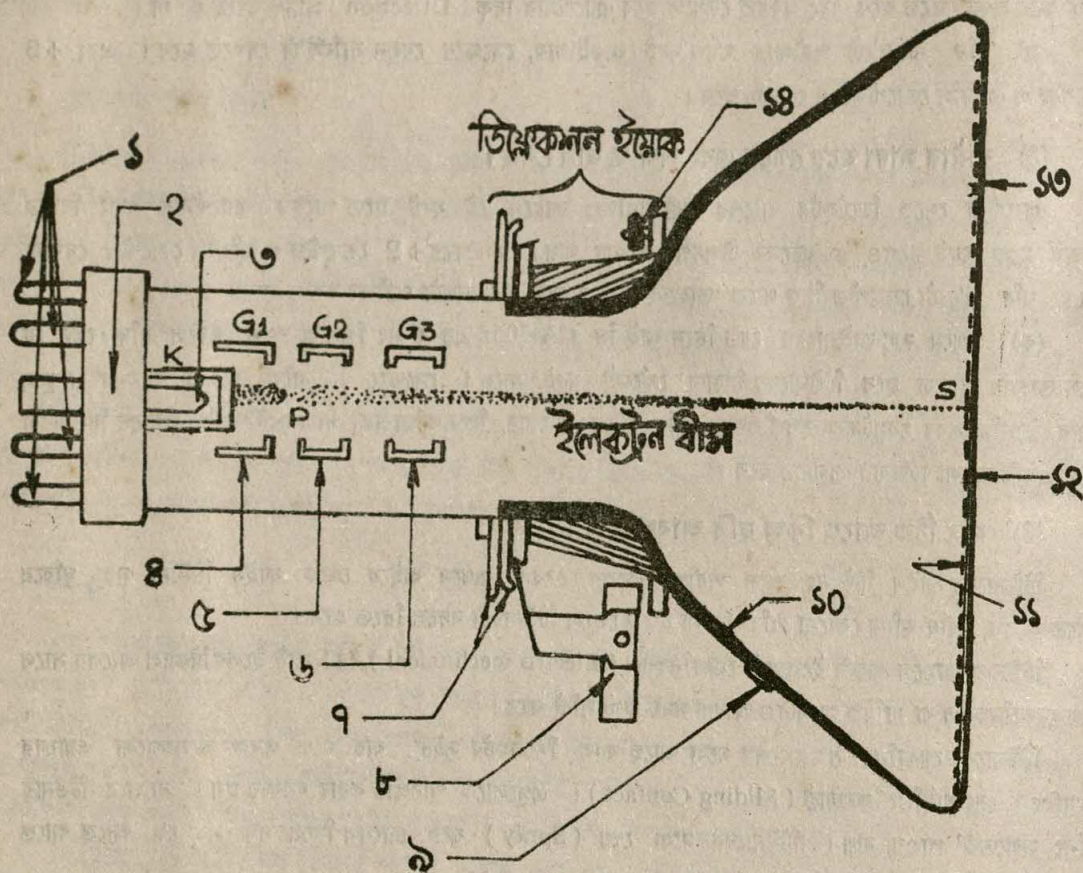
চিত্র ৫.১ (১) বেস পিন, (২) টিউব বেস, (৩) হিটার, (৪) কণ্ট্রোল গ্রিড, (৫) স্ক্রীন গ্রিড, (৬) ফোকাসিং গ্রিড, (৭) সেণ্টারিং ম্যাগনেট, (৮) বার ম্যাগনেট, (৯) হাই টেনশন কানেকশন, (১০) ফাইনাল অ্যানোড, (১১) অ্যালুমিনিয়াম প্রলেপ, (১২) ফেসপ্লেট, (১৩) ফসফর প্রলেপ, (১৪) পিন-কুশন ম্যাগনেট, (P) ক্রস-ওভার বিন্দু, (K) ক্যাথোড।

(Monochrome) টেলিভিশনও বলে, স্থিরতড়িৎ বা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক* ফোকাসিং (Electrostatic focussing) ও তড়িৎচৌম্বকীয় ডিফ্লেক্শন (Electromagnetic deflection)-কে ব্যবহার কর হয়।

পিকচার টিউব একটা প্রায় ফাঁকা, সামনের দিকে ছড়ানো এবং ক্রমশঃ সরু হয়ে আসা কাঁচের বাল্ব (চিত্র ৫.১), যার ঐ সরু অংশটা, যেটাকে গলা বা নেক্ (Neck) বলা হয়, তার মধ্যে থাকে একটা ইলেকট্রন গান (Electron gun), যা থেকে বে'র হয় ইলেকট্রন বীম। এই ইলেকট্রন গানটাই হলো ক্যাথোড। পজেটিভ অ্যানোড ভোল্টেজের জন্যই এই ইলেকট্রন বীম গতিপ্রাপ্ত হয় এবং স্ক্রীনের দিকে ধাবিত হয়। স্ক্রীনের ভেতর দিকে থাকে ফসফর (Phosphor) এর প্রলেপ। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ (যা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোকাসিং-এর কারণে ঘটে) এবং দ্রুত ধাবমান এই ইলেকট্রন বীম যখন এই প্রলেপের গায়ে আঘাত করে তখন সৃষ্টি হয় আলো। এই আলোই স্ক্রীনে ছবির আকারে দেখ দেয়।

টিউবের নেক'এ, বাইরে থেকে লাগানো থাকে দু'টো ডিফ্লেকশন কয়েল বা ইয়োক (Yoke) [চিত্র ৫.২ দেখো।] হরাইজেন্টাল ও ভার্টিকাল কয়েল দু'টোর তড়িৎপ্রবাহ বিস্তার (Amplitude) নির্দিষ্টভাবে স্থির করে, এই কয়েলের সাহায্যে যখন ক্রমাগত ভার্টিকাল ও হরাইজেন্টাল স্ক্যানিং (Scanning) কারেন্টের মাধ্যমে, দ্রুতহারে ইলেকট্রন বীমকে সরল পথ থেকে ছড়িয়ে দেওয়া হয় তখন তা' গোটা স্ক্রীন জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে, যাকে রাস্টার (Raster) বলে।

ভিডিও সিগন্যালকে সম্প্রসারিত করে ভিডিও আউটপুট অংশ থেকে পিকচার টিউবের ক্যাথোড গ্রিডে দেওয়া হয় এবং পরোক্ষভাবে হিটার বা ফিলামেন্টের সাহায্যে এই ক্যাথোড গ্রিডকে গরম করা হয়। নির্গমক পদার্থ দিয়ে তৈরী ক্যাথোড গরম হলেই, উচ্চ ভোল্টের অ্যানোড ও অন্যান্য গ্রিডের জন্য ইলেকট্রন মুক্ত করা শুরু করে এবং তার ফলে টিউবের অভ্যন্তরে তৈরী হয় একটা ইলেকট্রনের ধারা। ক্যাথোডের পাশে থাকে আরো তিনটে গ্রিড—কন্ট্রোল গ্রিড (Control grid), এ্যাকসেলেরেটিং বা স্ক্রীন গ্রিড (Accelerating or Screen grid) এবং ফোকাসিং গ্রিড (Focusing grid)। ক্যাথোড গ্রিড সাপেক্ষে কন্ট্রোল গ্রিডকে নেগেটিভ মেরুধর্মী রাখা হয় কারণ এই গ্রিডের সাহায্যেই ইলেকট্রন ধারাকে নিয়ন্ত্রণ কর হয়। কন্ট্রোল গ্রিডের পাশেই থাকা স্ক্রীন গ্রিড ও ফোকাসিং গ্রিড, অ্যানোডের মতই পজেটিভ মেরুধর্মী। এদের সাহায্যে ইলেকট্রন বীম গতিপ্রাপ্ত হয়ে উচ্চ পজেটিভ ভোল্টেজ সমৃদ্ধ ফাইনাল অ্যানোডের দিকে ছুটে যায়। লক্ষ্য করার বিষয় হলো, স্ক্রীন গ্রিড কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে একটা স্প্রিং ক্লিপের সাহায্যে যুক্ত থাকে ফাইনাল অ্যানোডের সাথে।

ফাইনাল অ্যানোড ছাড়া, ক্যাথোড ও গ্রিডগুলো যুক্ত থাকে বেস পিন এর সাথে। বেস পিনই হলো বাইরের সাথে ভেতরের যোগাযোগ মাধ্যম। এই বেস পিনেই অন্যান্য অংশ থেকে বিভিন্ন ভোল্টেজ, বেস সকেট বা বেস বোর্ডের মাধ্যমে পিকচার টিউবে এসে পৌঁছোয়।

টিউবের অভ্যন্তরে, ঘন্টাকৃতি চওড়া অংশের ভেতরের দেওয়ালে গ্রাফাইটের প্রলেপ দিয়ে তৈরী হয় অ্যানোড, যাকে সাধারণতঃ বলে এ্যাকুয়াডাগ (Aquadag)। এই গ্রাফাইট প্রলেপ ফেসপ্লেটের থেকে গলার সরু অংশের মাঝামাঝি অবধি ছড়ানো থাকে। এই অ্যানোডে, ই এইচ টি (EHT) থেকে উচ্চ ভোল্টেজ (18 কিলো ভোল্ট) এসে পৌঁছোয়।

* যে কোনো তড়িৎ প্রবাহিত হলেই যেমন তৈরী হয় তড়িৎ চৌম্বকক্ষেত্র তেমন ভোল্টেজেরও আছে তড়িৎক্ষেত্র। যখন ভোল্টেজের একটা স্থির ও নির্দিষ্ট মান থাকে, তখন তার ক্ষেত্রটা হলো স্থির তড়িৎ (Electrostatic) যার সরল অর্থ হলো, এই ক্ষেত্র সময়সাপেক্ষে কখনই পরিবর্তিত হয় না।

সাধারণতঃ চওড়া অংশের তলা বা ওপরের দিকে বিশেষ তারের সাহায্যে এই ভোল্টেজ আসে। অ্যানোডে এই ভোল্টেজ যে পথ বা তার দিয়ে আসে সেটাকে বলে হাই টেনশন বা সংক্ষেপে এইচ টি লাইন (High tension or HT line)।

ফসফর (Phosphor)

মোনোক্রোম পিকচার টিউবের জন্য সাদা ফসফর P_4 ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ উজ্জ্বল এই ফসফর তৈরী হয় জিঙ্ক সালফাইড, ক্যাডমিয়াম সালফাইড অথবা জিঙ্ক সিলিকেট দিয়ে। যেহেতু কোনো ফসফরই সাদা তৈরী করতে পারে না তাই হল্‌দে এবং নীলকে মিশিয়ে এই সাদা ফসফর P_4 তৈরী করা হয়। এই ফসফর পদার্থকে অত্যন্ত মিহিগুঁড়ো করে, কাঁচের ফেসপ্লেটের ভেতর দিকে প্রলেপাকারে লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই প্রলেপকে সর্বত্র সমানভাবে এবং খুব পাতলা করে লাগনো হয়।

এখন, সমস্ত আধুনিক পিকচার টিউবেই, ফসফর-এর ওপরে একটা পাতলা এ্যাল্‌মিনিয়ামের প্রলেপ দেওয়া হয়। উচ্চ অ্যানোড ভোল্টেজের কারণে প্রচণ্ড গতিশীল ইলেকট্রন বীম এই পাতলা এ্যাল্‌মিনিয়াম প্রলেপকে ভেদ করে ফসফরকে আঘাত করে এবং ফসফরকে কার্যকরী করে। তাহলে এই এ্যাল্‌মিনিয়াম প্রলেপের কী দরকার ? অনেকগুলো জরুরী ভূমিকা পালন করে এই এ্যাল্‌মিনিয়াম প্রলেপ।

প্রথমতঃ এই এ্যাল্‌মিনিয়াম প্রলেপ ফেসপ্লেট থেকে বেরিয়ে আসা আলোকে আবার প্রতিফলিত করে স্ক্রীনে। আবার, বীমের মধ্যে থাকা কিছু নেগেটিভ আয়নকেও এই প্রলেপ ফসফরের ধারে কাছে ঘেঁসতে দেয় না কারণ ওজনে ভারী এই নেগেটিভ আয়নগুলো সেই বেগ (Velocity) এ আসে না যার দ্বারা এ্যাল্‌মিনিয়াম প্রলেপকে ভেদ করা যায়। সর্বোপরি, এই এ্যাল্‌মিনিয়াম প্রলেপের সাথে যুক্ত থাকে ফাইনাল অ্যানোড, যার ফলে ফাইনাল অ্যানোডের উচ্চ ভোল্টেজ ছড়িয়ে পড়ে গোটা স্ক্রীনের ফসফর-এ।

ইলেকট্রোষ্ট্যাটিক ফোকাসিং (Electrostatic focusing)

ক্যাথোড থেকে বেরোনো ইলেকট্রনগুলোর ইচ্ছা বা প্রবণতা থাকে চারপাশে ছড়িয়ে পড়া কারণ ওরা একে অপরকে বিকর্ষিত করে। কিন্তু, ইলেকট্রনদের একটা তড়িৎ অথবা চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে এনে সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ বীমের আকার দেওয়া যায়। পিকচার টিউবে ইলেকট্রোষ্ট্যাটিক ফোকাসিং-এর মাধ্যমে এই ছড়ানো ইলেকট্রনকে সূক্ষ্ম বীমে রূপান্তরিত করা হয়। এই ক্ষেত্র তৈরী হয় ক্যাথোড ও কন্ট্রোল গ্রিডের বিপরীত মেরু'র সাহায্যে এবং এর ফলে ইলেকট্রন বীম একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে এসে ছোট্ট ফুট্‌কি (Spot)-র আকার ধারণ করে। ঐ বিন্দুকে বলা হয় ক্রস ওভার বিন্দু (Cross over point)। এরপর আবার ইলেকট্রনগুলো ছড়াতে চাইলেও ফোকাসিং গ্রিডের ইলেকট্রোষ্ট্যাটিক ক্ষেত্র তা' হতে দেয় না। এই দুই ইলেকট্রোষ্ট্যাটিক ক্ষেত্রর মধ্যে পড়ে অবাধ্য ইলেকট্রনগুলোও বাধ্য ছেলের মতো তীক্ষ্ণ ও সরু ধারায় স্ক্রীনের ওপর পড়ে। ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট পিকচার টিউবে সাধারণতঃ নীচু ভোল্টের ফোকাসিং করা হয়। এর ফোকাসিং গ্রিডের ভোল্টেজ 0 থেকে 300 ভোল্টের মধ্যে থাকে।

তড়িৎ চৌম্বকীয় বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ডিফ্লেকশন (Electromagnetic deflection)

দু'জোড়া ডিফ্লেকশন কয়েল, পিকচার টিউবের গলা যেখানে শেষ এবং চওড়া অংশ শুরু, সেইখানে লাগানো থাকে। ওপর এবং নিচে লাগানো একজোড়া কয়েল দিয়ে হরাইজেন্টাল ডিফ্লেকশন এবং ডান ও বাঁদিকের জোড়া কয়েল দিয়ে ভার্টিকাল ডিফ্লেকশন করানো হয়। ডিফ্লেকশনের আক্ষরিক বাংলা অর্থ হলো, সরল পথ থেকে ছড়িয়ে দেওয়া।

এই ডিফ্লেকশন কয়েলগুলোর মাধ্যমে সরু ও তীক্ষ্ণ ইলেকট্রন বীমকে স্ক্রীনের ওপরে, নিচে এবং দু'পাশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এখন, এই দু'জোড়া কয়েলের মাধ্যমে ডিফ্লেকশন হয় কারণ প্রতিটা কয়েলেরই একটা চৌম্বক ক্ষেত্র আছে, যা ইলেকট্রন বীমের চৌম্বক ক্ষেত্রর সাথে প্রতিক্রিয়া (React) ঘটায়। যার ফলে জন্ম নেয়া একটা বল বা ফোর্স (Force), যা ইলেকট্রনগুলোকে বীম অক্ষরেখা (Beam axis) এবং ডিফ্লেকশন ক্ষেত্র—উভয়েরই সমকোণে ছড়িয়ে দেয়।

সেন্টারিং নিয়ন্ত্রণকরণ (Centering adjustments)

পিকচার টিউবের গলায় ডিফ্লেকশন কয়েলের সাথে দুটো স্থায়ী চুম্বকের রিং পড়ানো থাকে, যার সাহায্যে স্ক্রীনে ছবিকে সেন্টারিং করা হয়। যখন এই রিং দু'টোর প্রান্তদেশ (Tab) গায়ে গায়ে লাগানো থাকে তখন চৌম্বক মেরুদ্বয় একে অপরকে বিকর্ষিত করে। তার ফলে কোনো চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরী হয় না যা বীমকে সরাতে পারে, যখন দু'টো রিং-এর ট্যাবকে সরিয়ে দেওয়া হয় তখন চৌম্বক ক্ষেত্রর শক্তি বৃদ্ধি ঘটে। তার ফলে বীম হরাইজেন্টাল, ভার্টিকাল অথবা এমন কোণ (angle) এ সরে যায়, যা'তে ছবি ঠিক সেন্টারিং হয়।

ডিফ্লেকশন কোণ (Deflection angle)

ডিফ্লেকশন কোণ হলো সর্বাপেক্ষা বড় কোণ, যতটা অবধি ইলেকট্রন বীম একটা নির্দিষ্ট মাপের পিকচার টিউবের মধ্যে ছড়াতে পারে। বিভিন্ন ডিফ্লেকশন কোণগুলো হলো 70°, 90°, 110° এবং 114° ডিগ্রী। এই কোণ দু'পাশে সমানভাবে ছড়ানো থাকে। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা সহজ হবে। যদি বলা হয় যে ডিফ্লেকশন কোণ 114° ডিগ্রী তাহলে বুঝতে হবে, কেন্দ্র বা সেন্টার থেকে ওপরে ও নিচে 57° অবধি ইলেকট্রন বীম ছড়াতে পারে।

একটা পিকচার টিউবের ডিফ্লেকশন কোণকে যত ছোট করা যায়, ততই পিকচার টিউবকে দৈর্ঘ্যে ছোট করে ফেলা যায়। পিকচার টিউবে এই কোণ আগে থেকেই স্থির করে বানানো হয়। তবে, ডিফ্লেকশন কোণ বড় হলে, সে ডিফ্লেকশন সার্কিট থেকে বেশী শক্তিও নিয়ে নেয়। বিভিন্ন স্ক্রীন সাইজের পিকচার টিউবের ডিফ্লেকশন কোণ একই হতে পারে।

যদি ইয়োককে নেক-এর অনেকটা পেছনে লাগানো হয় তাহলে এই ডিফ্লেকশন কোণ বেড়ে যায়। এর ফলে বীম, পিকচার টিউবের ভেতরে ধাক্কা খায় এবং স্ক্রীনের একটা কোণ অথবা চারটে কোণই কালো অথবা আবছা হয়ে যেতে পারে।

ইয়োক, পিকচার টিউবে লাগিয়ে যতটা সম্ভব এগিয়ে দিতে হয়। এরপর ছবি বা রাস্টার দেখে সম্পূর্ণ স্ক্রীনের আলো ঠিক করতে হয়।

পিকচার টিউবের বাইরের দিকেও কিন্তু গ্রাফাইটের একটা প্রলেপ চওড়া অংশে লাগানো থাকে। বাইরের এই প্রলেপ, চেসিসে গ্রাউণ্ড (Ground) করা থাকে। এই প্রলেপ এবং টিউবের ভেতরের অ্যানোড প্রলেপ মিলে উচ্চ ভোল্টেজের অ্যানোডের জন্য একটা ফিলটার ক্যাপাসিটরের কাজ করে, যার মান প্রায় 2000pf। অ্যানোড ভোল্টেজকে অফ করে দিলেও ক্যাপাসিটর অনেকক্ষণ চার্জকে ধরে রাখতে পারে। একটা পিকচার টিউবে

কাজ করার আগে তাই অ্যানোডের সঙ্গে বাইরের প্রলেপকে শর্ট করে নিশ্চিত হয়ে নেওয়া উচিৎ যে এটা আর চার্জ ধরে নেই।
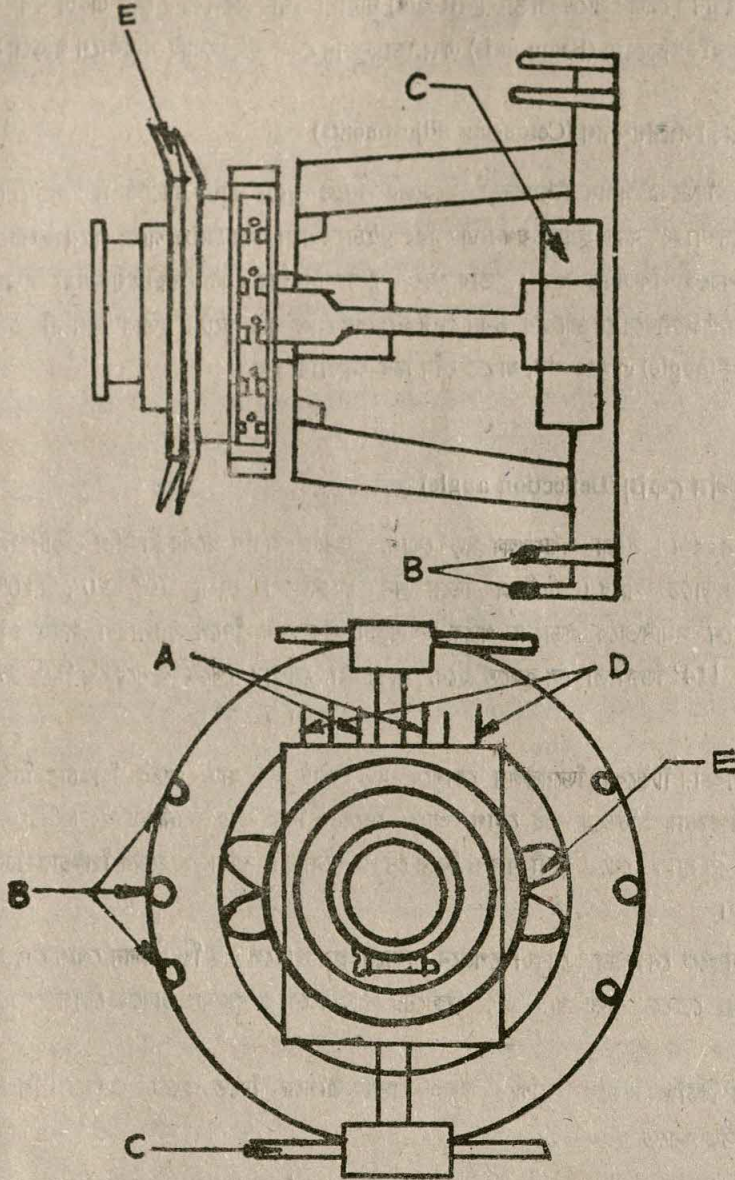
চিত্র ৫.২ (A) হরাইজেণ্টাল কানেকশন পয়েণ্ট, (B) পিন-কুশন ম্যাগনেট, (C) বার ম্যাগনেট, (D) ভার্টিকাল কানেকশন পয়েণ্ট, (E) সেণ্টারিং ম্যাগনেট।

স্ক্যানিং (Scanning)

স্ক্যানিং-এর আভিধানিক বাংলা হলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা। আসলে স্ক্রীনের আয়তাকার ক্ষেত্রকে

ইলেকট্রন বীম যখন স্ক্যান করে, তখন সে প্রতিটি কোণায় পৌঁছোয় এবং এর ফলেই তৈরী হয় রাস্টার। রাস্টারের ক্ষেত্রে হরাইজেন্টাল ও ভার্টিকাল বিক্ষেপ বা ডিফ্লেকশনের ভূমিকা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না।

হরাইজেন্টাল স্ক্যানিং (Horizontal Scanning)
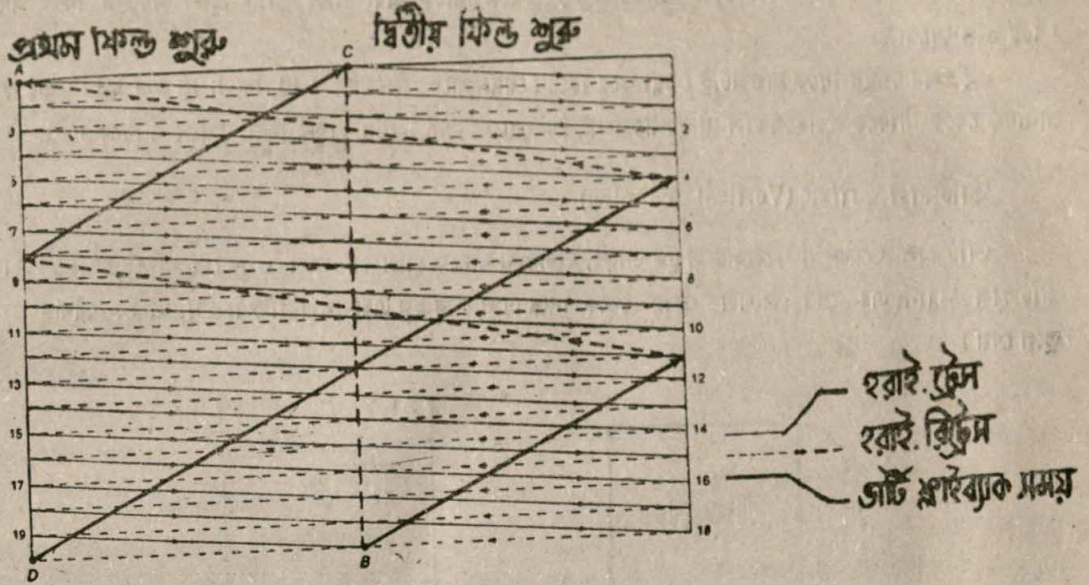
চিত্র ৫.৩

চিত্র নং ৫.৩ দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো হরাইজেন্টাল ট্রেস (Trace) ও রিট্রেস (Retrace) রেখা। হরাইজেন্টাল
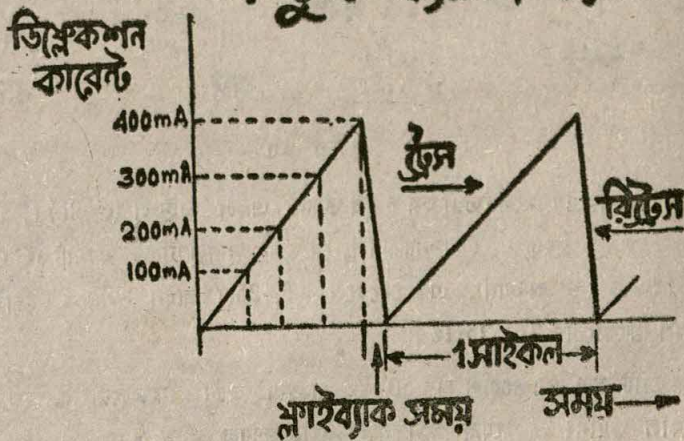
চিত্র ৫.৪

ডিফ্লেকশন কয়েলে তড়িতের সরল রৈখিক বৃদ্ধির ফলে ইলেকট্রন বীমে ডিফ্লেকশন ঘটে এবং এর ফলে বাঁদিক থেকে ডানদিকে ক্রমাগত ও সমগতিতে ট্রেস লাইন তৈরী হতে থাকে। যখন এই তড়িৎবৃদ্ধি, সর্বোচ্চ বিন্দু (Peak) তে পৌঁছোয়, তখন এর তরঙ্গ, যার রেখা চিত্রটা করাতের ব্লেডের দাঁতের মতো দেখতে বলে 'স'-টুথ্ (Saw tooth) তরঙ্গ বলে, সেই তরঙ্গটা পেছন দিকে (Reverse direction) কমতে থাকে এবং ধীরে ধীরে প্রথম অবস্থায় ফিরে আসে। [চিত্র ৫.৪ দেখো]

এই প্রথম পেছন দিকে যাওয়াটাই তৈরী করে রিট্রেস রেখা, যাকে ফ্লাইব্যাক (Flyback)ও বলা হয়। এর ফলে, ডানদিক থেকে বাঁদিকে হরাইজেন্টাল ট্রেস পৌঁছোলেই ফ্লাইব্যাকের জন্য রিট্রেস আবার ফিরে আসে বাঁদিকে।

ভার্টিকাল স্ক্যানিং (Vertical Scanning)

ভার্টিকাল ডিফ্লেকশন কয়েলের স-টুথ তড়িৎ, ইলেকট্রন বীমকে রাস্টারের মধ্যে ওপর থেকে নিচে চলাচল করায়। ভার্টিকাল স্ক্যানিং-এর ট্রেস অংশটা ওপর থেকে নিচে এসে শেষ হয় এবং যথারীতি রিট্রেস, বীমকে আবার ওপরে তুলে দেয়।
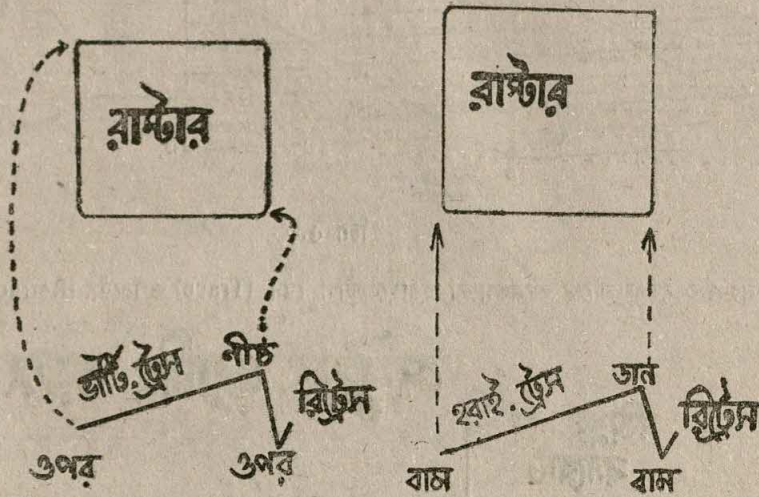
চিত্র ৫.৫

এভাবেই ট্রেস এবং রিট্রেস মিলে তৈরী হয় স টুথ তরঙ্গর একটা সাইকল্ (cycle)। বিভিন্ন দেশে এই তরঙ্গকে বিভিন্নভাবে নেওয়া হয়। ভারতবর্ষ, ইন্টারন্যাশনাল রেডিও কন্‌সালটেটিভ কমিটি (C.C.I.R)র কাছ থেকে যে সিগন্যাল ষ্ট্যাণ্ডার্ড নিয়েছে সেই অনুযায়ী, এক সেকেণ্ডে 15,625টা লাইন, স্ক্রীনকে হরাইজেন্টালি স্ক্যান করবে। অতএব, হরাইজেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি 15,625Hz।

সেই তুলনায় ভার্টিকাল ফ্রিকোয়েন্সি মাত্র 50 Hz, যা হরাইজেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সির চেয়ে অনেক কম। তার ফলে এক সাইকল্ ভার্টিকাল স্ক্যানিং এর মধ্যেই অনেকগুলো হরাইজেন্টাল লাইন স্ক্যান করে চলে যায়। তবে আমরা তো জানি, হরাইজেন্টাল লাইনের মাঝখানে ওপর থেকে নিচের অংশ ভরাট করার কাজটাই করে ভার্টিকাল লাইন।

ফ্লিকার (Flicker)

প্রথমেই জানতে হবে ঠিক কতগুলো স্ক্যানিং লাইন দিয়ে একটা টিভি স্ক্রীনকে ঢেকে ফেললে চলমান ছবিকে আমরা সঠিকভাবে দেখতে পাবো, এই লাইনগুলো দিয়ে তৈরী হবে কালো-সাদা কিছু বার। যদি স্ক্যানিং বীমের পুরুত্ব (Thickness) সাথে কালো-সাদা বারগুলোর প্রস্থ (Width) সমান হয় এবং বারের সংখ্যার সাথে, স্ক্যানিং লাইনও সমান করে নেওয়া হয়, তাহলে যাবতীয় তড়িৎ সিগন্যালকে সঠিকভাবে স্ক্যানিং পদ্ধতির সাহায্যে পুনরায় পেশ করা সম্ভব। তবে, এই স্ক্যানিং লাইন বেছে নেওয়ার সময় অবশ্যই মনে রাখা হয়, একটা সুস্থ মানুষের চোখ, ন্যূনতম দূরত্ব থেকে কতগুলো লাইনকে সহ্য করতে পারে। এটা দেখা গেছে, মানুষ একটা চলমান ছবির জন্য 800 স্ক্যানিং লাইন সহ্য করতে পারে। তবে নিরাপত্তার কারণে 500 লাইন খুবই উপযোগী।

অনেক ভাবনা চিন্তা করে এবং ভার্টিকাল রিট্রেসের সময় কিছু লাইনের ক্ষতির হিসেব করে 625 লাইন ভারতবর্ষ গ্রহণ করেছে। পৃথিবীতে এই 625 লাইনই বেশী চলে, আমেরিকায় অবশ্য 525 লাইন ব্যবহার করা হয়।

চলমান ছবি মানেই কিন্তু আমাদের চোখ আর ব্রেনকে বোকা বানানো। সিনেমার ক্ষেত্রে 24টা ছবি এক সেকেণ্ডে পরপর চলে যায় আর টেলিভিশনে এই সংখ্যা 25টা। এগুলোকে ফ্রেম বলা হয়। এই 25টা ফ্রেম যখন পরপর যায় তখন একটা ফ্রেম থেকে পরবর্তী ফ্রেমে যাওয়ার মাঝখানে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়, যা অবশ্যম্ভাবী করে তোলে, একটা খুব অল্পসময়, যখন স্ক্রীন জুড়ে শুধুই কালো (অর্থাৎ কোনো আলো নেই)। এই পরপর কালো ও সাদা হওয়ার দরুণ ছবি কাঁপতে থাকে, যাকে বলে ফ্লিকার (Flicker)। দর্শকের কাছে এটা বেশ বিরক্তিজনক হয়ে দাঁড়ায়।

টেলিভিশনে এই ফ্লিকারকে দূর করার জন্য প্রতি সেকেণ্ডে 50টা ভার্টিকাল স্ক্যান ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের স্ক্যানিংকে বলা হয় ইন্টারলেসড্ স্ক্যানিং (Interlaced Scanning)। এই স্ক্যানিংটা বেশ মজার, একটা ছোট উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করছি। ধরা যাক, একটা বইয়ের একটা পৃষ্ঠার মোট লাইনের সংখ্যা 625টা। এবার আমরা প্রথমে পড়তে শুরু করলাম সমস্ত বেজোড় (odd) লাইনগুলো অর্থাৎ 1, 3, 5, 7, এভাবে 625 অবধি পৌঁছে আবার নিচে থেকে ওপরে এসে এবার সব জোড় (even) লাইনগুলো পড়লাম অর্থাৎ 2, 4, 6, 8 করে 624 লাইন অবধি। বাস্তবে যদিও এভাবে বই কেউ পড়ে না কিন্তু ইন্টারলেসড্ স্ক্যানিং এভাবেই হয়। টিভি স্ক্রীনের ওপর থেকে নিচে, প্রথমে জোড় সংখ্যার লাইনগুলো স্ক্যান করে, ভার্টিকাল রিট্রেস দ্রুত আবার ইলেকট্রন বীমকে ওপরে তুলে দেয়। পরবর্তী ক্ষেত্রে আবার বেজোড় লাইনকে স্ক্যান করে এই বীম। যার ফলে প্রতিটা ফ্রেমই দু'টো ক্ষেত্রে বা ফিল্ডে ভাগ হয়ে যায়। এর ফলে মোট 25টা ফ্রেমকে প্রতি সেকেণ্ডে স্ক্যান করার জন্য, দু'বার স্ক্যান করে ভার্টিকাল স্ক্যানিং ফ্রিকোয়েন্সি স্থির করা হয়েছে $(25 \times 2) = 50$Hz। চিত্র ৫.৩এ ব্যাপারটা সহজভাবে বোঝানো হয়েছে।

এখন 625টা লাইনকে দু'ভাগে ভাগ করার ফলে সংখ্যাটা দাঁড়ায় $625 \div 2 = 312{\cdot}5$টা লাইন। এই সংখ্যক হরাইজেন্টাল লাইনকে প্রতি ফ্রেমে স্ক্যান করার জন্য, হরাইজেন্টাল সুইপ অসিলেটরকে $(312{\cdot}5 \times 2 \times 25) =$ 15,625Hz ফ্রিকোয়েন্সি তৈরী করতে হয়। এটা অবশ্যই লক্ষ্য করার বিষয় যে, যদিও এখন বীম অর্ধেক সময়ে ওপর থেকে নিচে স্ক্যান করে আসে এবং হরাইজেন্টাল অসিলেটর তখন 15,625Hz ফ্রিকোয়েন্সি তৈরী করছে, তবু প্রতিটা ভার্টিকাল সুইপে মাত্র অর্ধেক লাইন স্ক্যান হতে পারে। যদিও প্রথম ফিল্ডের শেষটা একটা অর্ধেক লাইন (312·5) এবং দ্বিতীয় ফিল্ডও শুরু হয় স্ক্রীনের মধ্যভাগ থেকে, তবুও বীম বাকি 312·5টা লাইনকে, নিচের দিকে যাওয়ার সময় স্ক্যান করে ফেলে। হরাইজেন্টাল স্ক্যানিং-এ সময় লাগে 64 মাইক্রো সেকেণ্ড, যার মধ্যে 52 মাইক্রো সেকেণ্ড হলো কার্যকরী লাইনের সময় ও বাকী 12 মাইক্রো সেকেণ্ড লাইন

ব্ল্যাঙ্কিং সময়। এই 12 মাইক্রো সেকেণ্ড সময়ে বীম একদম বাঁ দিকে ফিরে আসে এবং পরবর্তী ফ্রেমের লাইনকে খোঁজে।

একইভাবে ভার্টিকাল স্ক্যানিং-এ সময় লাগে 20 মিলি সেকেণ্ড। যার মধ্যে 18·720 মিলি সেকেণ্ড কার্যকরী ও বাকী 1·280 মিলি সেকেণ্ড বীমকে আবার ওপরে এসে পরবর্তী সাইকল্-এর জন্য ব্যয় করতে হয়।

যেহেতু ভার্টিকাল ও হরাইজেণ্টাল সুইপ অসিলেটর একসাথেই চলে, ফলে 20টা হরাইজেণ্টাল লাইন*কে ভার্টিকাল রিট্রেস সময়ের মধ্যে স্ক্যান করা যায়। তবুও প্রতি ফ্রেমে 40টা স্ক্যানিং লাইন নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে 625—40 =585টা লাইন বাস্তবিক ক্ষেত্রে স্ক্যানিং-এর জন্য পাওয়া যায়।

সিঙ্ক্রোনাইজিং পালস্ (Synchronizing Pulse)

সিঙ্ক্রোনাইজিং এর বাংলা অর্থ হলো সমকালবর্তী করা। আরো সহজ বাংলায় বলা যায় একাধিক ঘটনাকে একসঙ্গে ঘটানো। আগেই জেনেছি স্ক্যানিং বীমের মাধ্যমে ট্র্যান্সমিশন কেন্দ্রের ক্যামেরা টিউব (যেখান থেকে ছবিকে সিগন্যাল করে বায়ু মাধ্যমে পাঠানো হয়) থেকে পাঠানো হরাইজেণ্টাল ও ভার্টিকাল স্ক্যানিং লাইনগুলোকে, রিসিভারের স্ক্রীনে ঠিক সেভাবেই সাজিয়ে ক্যামেরা টিউব অনুসারী ছবি পাওয়া যায়। তবে, এই হরাইজেণ্টাল ও ভার্টিকাল লাইন স্ক্যানিংকে একসঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঘটানোর জন্য পিকচার সিগন্যালের সঙ্গে মিশিয়ে পাঠানো হয় সিঙ্ক্রোনাইজিং পালস্ বা সংক্ষেপে সিঙ্ক পালস্। প্রতিটা হরাইজেণ্টাল লাইনের সঙ্গে হরাইজেণ্টাল সিঙ্ক পালস্ পাঠানো হয় যা'তে হরাইজেণ্টাল স্ক্যানিং একসঙ্গে ঘটতে পারে এবং ভার্টিকাল ফিল্ডের সাথে পাঠানো হয় ভার্টিকাল সিঙ্ক পালস্, যাতে স্ক্যানিং এর গতি ঠিক থাকে।

এই সিঙ্ক পালসের ফ্রিকোয়েন্সি হরাইজেণ্টালের ক্ষেত্রে 15,625Hz এবং ভার্টিকালের ক্ষেত্রে 50Hz তবে এই সিঙ্ক সিগন্যাল কিন্তু স্ক্যানিং করে না। স-টুথ জেনারেটর সার্কিটের মাধ্যমেই ঘটে ডিফ্লেকশন এবং তার ফলেই পাওয়া যায় স্ক্যানিং রাষ্টার। যদিও সিঙ্ক পালস, রাষ্টারের উপর ছবির সিগন্যালকে পুনরায় স্ক্রীনে ফিরিয়ে আনতে এবং সেই ছবিকে সঠিক অবস্থানে ধরে রাখতে সমর্থ হয়।

ভার্টিকাল সিঙ্ক পালসের অনুপস্থিতিতে ছবি ওপর থেকে নিচে অথবা নিচে থেকে ওপরে 'রোল' করে এবং হরাইজেণ্টাল সিঙ্ক পালসের অনুপস্থিতিতে ছবি বাঁদিক থেকে ডানদিকে সরে যেতে থাকে। এর ফলে সমস্ত লাইন-এর গঠন কোনাকুনি হয়ে যায়।

ব্ল্যাঙ্কিং এর সময়, যখন কোনো ছবির সিগন্যাল আসে না তখনই সিঙ্ক সিগন্যাল পাঠানো হয় কারণ সিঙ্ক পালসগুলোই রিট্রেস লাইন আনে। হরাইজেণ্টাল ও ভার্টিকাল, উভয় ক্ষেত্রেই তাই রিট্রেস সময়ে (যখন স্ক্রীন ফাঁকা বা ব্ল্যাঙ্ক থাকে কিন্তু অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্য চোখ বুঝতে পারে না) সিঙ্ক পালস কার্যকরী হয়।

---

* 1·280 মিলি সেকেণ্ড=1280 মাইক্রো সেকেণ্ড

$\therefore \dfrac{1280 \text{ মাইক্রো সেকেণ্ড}}{64 \text{ মাইক্রো সেকেণ্ড}} = 20\text{টা লাইন}$

কালো-সাদা পিকচার টিউবের ফল্ট ঃ

(1) পিকচার টিউবের নেক-এর ভেতর নীল রঙের স্ফুলিঙ্গ বা স্পার্ক (Spark)।

প্রতিকার ঃ (ক) পিকচার টিউবে কোনোভাবে বায়ু (Air) ঢুকে গেছে। এই বায়ু ঢোকে তখনই, যখন পিকচার টিউবের বেস-এ সুক্ষ চুলের মতো ফাটল ধরে। একটা আতস কাঁচ (Magnifying glass) দিয়ে পরীক্ষা করলে এই ফাটল ধরা যায়।

(খ) খুব নিম্নমানের পিকচার টিউব সকেট থাকলেও অনেক সময় এই ফাটল ধরে, কারণ তা'হলে পিকচার টিউবে একটা বিরূদ্ধ আকর্ষক বল তৈরী হয়।

(2) রাষ্টারের ওপর রিট্রেস লাইন, যা' ছবি না থাকলে পাওয়া যায়।

প্রতিকার ঃ কণ্ট্রোল গ্রিড এবং ক্যাথোড অভ্যন্তরীণভাবে শর্ট হয়ে গেছে। নিম্নমানের সকেটের জন্য বাইরের থেকেও এই শর্ট হতে পারে।

(3) ছবি থাকাকালীন রিট্রেস লাইন পাওয়া যাচ্ছে।

প্রতিকার ঃ কণ্ট্রোল গ্রিড এবং ক্যাথোডের মধ্যে উচ্চহারে লিকেজ্ (Leakage) হচ্ছে। নিম্নমানের সকেটের জন্যও হতে পারে।

(4) পিকচার টিউবের ফিলামেণ্ট জ্বলছে না।

প্রতিকার ঃ হিটার ওপেন হয়ে গেছে। মাল্টিমিটার দিয়ে হিটারের রোধের মান (টিউবের 1 ও 8 নং পিন এবং পোর্টেবল পিকচার টিউবের ক্ষেত্রে 3 ও 4 নং পিন হলো হিটারের ফিলামেণ্ট) দেখতে হবে। একটা নতুন পিকচার টিউবের সাথে মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, পরীক্ষণীয় পিকচার টিউবটা ভালো না খারাপ। এই রোধের মান 4 থেকে 5Ω এর মধ্যে থাকে।

(5) ছবির ওপর কালো অথবা সাদা কতগুলো বার দেখা যাচ্ছে। যেটাকে হাম ব্যাণ্ড (Hum band) বলে।

প্রতিকার ঃ হিটার এবং ক্যাথোড অভ্যন্তরীণভাবে শর্ট অথবা লিক আছে। এই হাম ব্যাণ্ডটা, 50 সাইকলস্-এ এসি রিপলস্ (Ripples) চলে আসলেও হয়। এক্ষেত্রে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের 50 সাইকলস্-এর ফিলটার ক্যাপাসিটরটা পরীক্ষা ক'রে দেখতে হবে।

(6) পিকচার টিউবের ফিলামেণ্ট খুব উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে।

প্রতিকার ঃ হিটারটা শর্ট আছে। এক্ষেত্রে মাল্টিমিটার দিয়ে হিটারের রোধ মাপতে হবে।

(7) রাষ্টারের ওপর কতগুলো ফুটকি বা স্পট (spot) আসছে।

প্রতিকার ঃ এটা সাধারণতঃ হয় যদি পিকচার টিউবের ভেতরে কোনো গুঁড়ো বা খণ্ড পড়ে। সাধারণ ক্ষেত্রে এগুলোকে সরানোর জন্য ফেসপ্লেট অঞ্চলে (Faceplate area) একটা রবারের হাতুড়ি দিয়ে আস্তে করে আঘাত করলে এই গুঁড়ো বা খণ্ড সরে যায়।

(8) নীল, চারধারে দৃশ্যমান (যেমন চাঁদ বা সূর্যের গ্রহণের সময় চারপাশে দৃষ্ট আলোকমণ্ডল) আলো (corona) LOT-র কর্ডটা যেখানে ফাইনাল অ্যানোডের সাথে যুক্ত হয়েছে, তার চারপাশে দেখা যাচ্ছে এবং সঙ্গে হিস হিস (Hissing) শব্দ হচ্ছে।

প্রতিকার : পিকচার টিউবের ঐ জায়গাটা ধুলো এবং আর্দ্রতার জন্য কলুষিত (Contaminated) হয়ে গেছে। ঐ জায়গাটা শুকনো কাপড় দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে দিতে হবে।

(9) রাষ্টারের উপর কালো লাইন, যাকে ইনটারমিটেন্ট ষ্ট্রীকস্ (Intermittant Streaks) বলে, সেটা পাওয়া যাচ্ছে।

প্রতিকার : টিউবের ভেতরে অভ্যন্তরীণ স্পার্ক হচ্ছে। খুব ভালো করে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে EHT কর্ড এবং ফাইনাল অ্যানোডের সংযোগের ভেতরের অংশে স্পার্ক হচ্ছে। এক্ষেত্রে এই অংশটা পরিষ্কার করে দিতে হবে।

(10) রাষ্টার খুব আবছা, যদিও ব্রাইটনেস ও কনট্রাষ্ট কণ্ট্রোলকে পুরো করে দেওয়া হয়েছে।

প্রতিকার : পিকচার টিউবের এমিশন কমে গেছে। অনেকক্ষেত্রে পিকচার টিউবের পিন ভোল্টেজ কমে গেলেও এই ফল্ট হতে পারে।

(11) দুর্বল ফোকাস।

প্রতিকার : পিকচার টিউবের পিন ভোল্টেজ ঠিক নেই। সাধারণতঃ কণ্ট্রোল গ্রিড, এ্যাকসেলেরেটিং গ্রিড-এ ভোল্টেজ ঠিক না থাকলেই এই ফল্ট হয়।

পিকচার টিউবের পিন কানেকশন

20″ পিকচার টিউব—পিন নং 1 ও 8 = ফিলামেন্ট বা হিটার
2 = কণ্ট্রোল গ্রিড
3 = এ্যাকসেলেরেটিং গ্রিড
4 = ফোকাসিং গ্রিড
5 = কোনো কানেকশন নেই
6 = কণ্ট্রোল গ্রিড
7 = ক্যাথোড

12″ বা 14″ পিকচার টিউব—পিন নং 3 ও 4 = ফিলামেন্ট বা হিটার
2 = ক্যাথোড
5 = কণ্ট্রোল গ্রিড
6 = এ্যাকসেলেরেটিং গ্রিড
7 = ফোকাস গ্রিড।

৬

পাওয়ার সাপ্লাই

মানুষের শরীরে যেমন অক্সিজেনের প্রয়োজন, ঠিক সেরকম টেলিভিশন রিসিভারের প্রয়োজন পাওয়ার সাপ্লাই। সবল, নিখুঁতভাবে চলমান হার্ট, লাংস, কিডনী সমৃদ্ধ মানুষও যেমন একটু অক্সিজেনের অভাব ঘটলেই ছট্‌ফট্‌ করে, একটা টেলিভিশন সেটও পাওয়ার সাপ্লাইয়ের একটু তারতম্য ঘটলেই অদ্ভুত আচরণ শুরু করে দেয়। শরীরে রক্তের প্রবাহকে বজায় রাখে এই অক্সিজেন। টেলিভিশন সেটের মধ্যেও প্রবাহিত হয় তড়িৎ। বিভিন্ন অংশের জন্য দরকার হয় বিভিন্ন ভোল্টেজ, তা' সরবরাহ করে এই পাওয়ার সাপ্লাই অংশ এবং বিভিন্ন অংশকে সক্রিয় রাখে। অতএব বোঝাই যাচ্ছে, এই পাওয়ার সাপ্লাই কাজ না করলে অনেক রকম ফল্ট হতে পারে।

সাধারণতঃ ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট টেলিভিশনে 'পাওয়ার সাপ্লাই' চারটে পদ্ধতিতে বিভক্ত।

(১) লো টেনশন পাওয়ার সাপ্লাই বা রেজিস্টেন্স পাওয়ার সাপ্লাই

(২) এস সি আর পাওয়ার সাপ্লাই

(৩) ট্র্যান্সফরমার পাওয়ার সাপ্লাই

(৪) সুইচ্‌ মোড্‌ পাওয়ার সাপ্লাই

(১) লো টেনশন বা রেজিস্টেন্স পাওয়ার সাপ্লাই (Low tension or Resistance Power Supply)

ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট টেলিভিশন সেটে এই পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহৃত হয়। এখন নতুন নতুন মডেলে এই পদ্ধতি বিশেষ ব্যবহৃত হয় না কারণ এতে জায়গা একটু বেশী লাগে। এসি এবং ডিসি—উভয় ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি কার্যকরী।
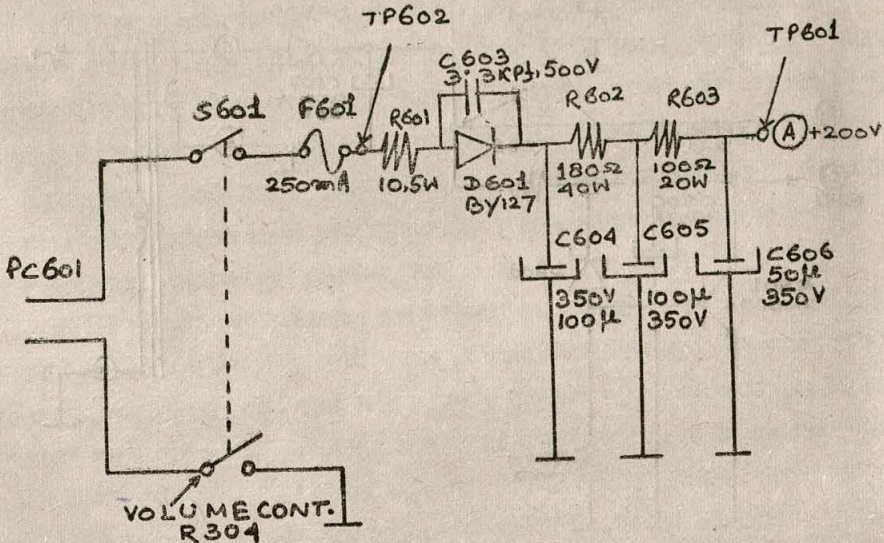
চিত্র ৬.১ রেজিস্টেন্স পাওয়ার সাপ্লাই (বেলটেক)

চিত্র ৬.১এ একটা রেজিস্টেন্স পাওয়ার সাপ্লাই-এর সার্কিট দেওয়া হলো। বাড়ির মেইন থেকে প্লাগ হয়ে অন / অফ সুইচ্ এর মাধ্যমে তড়িৎপ্রবাহ এসে পৌঁছোয় ফিউজ (F-601, 250 mA) এ। তারপর সেখান থেকে রেজিস্টর 10Ω/5W (R-601) হয়ে ডায়োড BY 127 / IN 4007 এ এসে রেকটিফাই হয় (এসি হলে এই ডায়োডের মাধ্যমে ডিসিতে রূপান্তরিত হয় তাই মেইন সাপ্লাই ডি সি হলে, এই ডায়োডের কোনো ভূমিকা নেই)। এরপর ফিল্টার ক্যাপাসিটর 100 Mfd / 350 V (C-604) এ ফিল্টার হয়ে (এসি রিপলস্ থাকলে তা' এই ফিল্টারের মাধ্যমে দূর হয়) রেজিস্টর 180Ω / 40W (R-602) এর মাধ্যমে আবার ক্যাপাসিটর 100 Mfd /350 V (C-605) এ ফিল্টার হয়। এরপর পরবর্তী ক্ষেত্রে আবার রেজিস্টর 100Ω / 20W (R-603) এবং ফিল্টার ক্যাপাসিটর 100 Mfd / 350V (C-606) দিয়ে ফিল্টার করে, 200V ডি সি পাওয়া যায়। এটাই হলো A সাপ্লাই। এই A সাপ্লাইকে রিসিভারের চারটে অংশে দেওয়া হয়।

(1) হরাইজেণ্টাল সাব-সিস্টেম (IC-CA 920)
(2) হরাইজেণ্টাল আউটপুট সেকশন (LOTর 1নং ট্যাগ ও ড্রাইভার ট্রান্সফরমারের প্রাইমারি কয়েল)
(3) ভিডিও আউটপুট সেকশন (ট্র্যানজিস্টর BD 115 (Q-502) র কালেকটর)
(4) ব্রাইটনেস কন্ট্রোল-এর এক প্রান্তে।

এই সার্কিট বেলটেক (Beltek) অনুসারী। রেজিস্টেন্স পাওয়ার সাপ্লাই-এর মূল ব্যাপার এটাই। কোনো পরিবর্তন হলে তা, শুধুই কিছু টার্মিনাল পয়েন্টের এদিক-ওদিক হতে পারে।

চিত্র ৬.২ অকজিলিয়ারী পাওয়ার সাপ্লাই (বেলটেক)

লাইন আউটপুট ট্র্যান্সফরমার (LOT)

এটা একটা অটোট্র্যান্সফরমার, যা হরাইজেন্টাল আউটপুট অংশে থাকে। এই ট্র্যান্সফরমারের কার্যদক্ষতা অন্য ট্র্যান্সফরমারের চেয়ে অনেক বেশী। এখানে একটাই কয়েল থেকে প্রাইমারী এবং সেকেণ্ডারী বার করে নেওয়া হয়। একটা 'ফেরিট কোর' এর ওপর কয়েলকে জড়িয়ে তড়িতের ক্ষয়কে কমিয়ে আনা হয়। এই ট্র্যান্সফরমারের কোরের উপরই জড়ানো থাকে এক্সট্রা হাই টেনশন বা. ই এইচ্ টি (Extra High Tension or EHT) কয়েল। এই ট্র্যান্সফরমারের সাহায্যেই অক্‌জিলিয়ারী বা সহায়ক পাওয়ার সাপ্লাই (Auxiliary Power supply) হিসেবে বিভিন্ন ভোল্টেজ পাওয়া যায়। প্রতিটা টিভিতেই এই LOT থাকে।

পাওয়ার সাপ্লাই এর পরবর্তী অংশ দেয় এই অক্‌জিলিয়ারী পাওয়ার সাপ্লাই। এখান থেকে তিনটে সাপ্লাই পাওয়া যায়। হরাইজেন্টাল স্ক্যানিং এর সময় অটোট্র্যান্সফরমারের (TR-802) 5 ও 6 নং ট্যাপে একটা আবেশিত ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়। এই ভোল্টেজকে ডায়োড DR 300 (D-806) দিয়ে রেকটিফাই করে প্রায় +40V ডি সি পাওয়া যায়। এই 40V ডি সি কে ফিল্টার ক্যাপাসিটর 2000 Mfd/50V (C-807) এর মাধ্যমে ফিল্টার করে মসৃন 40V ডি সি পাওয়া যায়।

এই ডি সি ভোল্টকে রেজিস্টর 120Ω / 5W (R-807), জেনার ডায়োড 12V (D-804) দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করে ক্যাপাসিটর 100 Mfd / 25V (C-802) দিয়ে ফিল্টার করে 12V (D সাপ্লাই) তৈরী করা হয়।

আবার, এই 40V ডি সি কেই রেজিস্টর 120Ω / 5W, জেনার ডায়োড 16V (D-801) ও রেজিস্টর 100 Ω (R-805), ট্রানজিস্টর 2N 5296 (Q-801) এর বেস এর সাথে যুক্ত করা হয়। ক্যাপাসিটর 100 Mfd / 25V (C-806), জেনার ডায়োড (D-801) এর ক্যাথোড ও ট্রানজিস্টর (Q-801) এর কালেকটরের সাথে যুক্ত হয়ে নিয়ন্ত্রিত 16V (C সাপ্লাই) পাওয়া যায়। ['বেলটেক' সার্কিট অনুযায়ী]

ফাইনাল অ্যানোডের হাই ভোল্টেজ এর পরীক্ষা

EHT থেকে ফাইনাল অ্যানোডে যে 18 KV উচ্চ ভোল্টের EHT ভোল্টেজ যায় সেটা পরীক্ষা করা বেশ মুশকিলের কাজ। সাধারণ মাল্টিমিটারে এত উচ্চ ভোল্ট মাপার কোনো ব্যবস্থা নেই। কিন্তু অনেক সময়ই এই ভোল্টটা ঠিক আসছে কী না অথবা আদৌ আসছে কী না সেটা জানা খুব জরুরী হয়ে পড়ে। খুব সাবধানতা অবলম্বন করে এই পরীক্ষা করতে হয়। এই EHT ভোল্টেজ একটা বিশেষ ধরনের প্রডের সাহায্যে, সাধারণ মাল্টিমিটারেও মাপা যেতে পারে। এই প্রডকে বলে EHT প্রড। এই প্রডের মধ্যেই থাকে একটা উচ্চমানের ভোল্টেজ রেজিস্টর। সম্পূর্ণ রেজিস্টরটা ঢোকানো থাকে একটা ইনস্যুলেটেড টিউবের মধ্যে। এই টিউবের মুখে থাকে কানেক্‌টিং পয়েন্ট এবং সহজভাবে ব্যবহার করার জন্য ইনস্যুলেটেড্ হাতল।

EHT কে আরো একটা উপায়েও পরীক্ষা করা যায়। একটা ভালো ইনস্যুলেটেড্ স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়ে সেটাকে ফাইনাল অ্যানোডের টার্মিনালে অথবা EHT তার (Cable) এর প্রান্তে একটু ফাঁক রেখে (প্রায় $\frac{1}{2}''$) ধরলে, সেই ফাঁকে তৈরী হয় একটা নীল ও বেগুনী রঙের মিশ্রিত আর্ক বা রশ্মি (Arc)। এই আর্কটা রেকটিফায়ার ডায়োড (TV 20)র দু'প্রান্তেই পাওয়া যায়। এই পরীক্ষা খুব অল্প সময়ের জন্য করতে হয় কারণ এর ফলে লাইন আউটপুট ট্রানজিস্টরে (BU 205) একটা চাপ সৃষ্টি হয়, যার ফলে এই ট্রানজিস্টরটা কেটে যেতে পারে। এই আর্কটা থেকে বোঝা যায় যে EHT র থেকে হাই ভোল্টেজ বে'র হচ্ছে। এই পরীক্ষা খুব সাবধানে করা উচিৎ। সুবিধা থাকলে স্ক্রু-ড্রাইভারটাকে আর্থিং (Earthing) করে নিলে ভালো হয়।

রেজিষ্টেন্স পাওয়ার সাপ্লাই-এর কিছু সাধারন ফল্ট

(1) 10Ω/5W (R-601) রেজিষ্টর, যা BY 127 ডায়োড (পরিবর্তে IN 4007)-এর সাথে যুক্ত, এটা যদি ওপেন হয়ে যায়, তা' হলে সেট সম্পূর্ণ মৃত বা ডেড (Dead) হয়ে যাবে।

(2) BY 127 ডায়োডের সাথে সমান্তরালভাবে লাগানো ক্যাপাসিটর 3·3Kpf/550V (C-603) যদি শর্ট হয়ে যায়, তাহলে বার বার 250mA ফিউজ (F-601) টা গলে যাবে এবং সেট ডেড হয়ে যাবে।

(3) 100 + 100Mfd, 350V (C-604 ; C-605) এই যুগ্ম ক্যাপাসিটর, যা 180Ω/40W রেজিষ্টর (R-602)-এর মধ্যে অবস্থিত, যদি সেটা শর্ট হয়ে যায় তাহলে ফিউজটা গলে (Blown) যাবে এবং সেট ডেড হয়ে যাবে।

(4) ক্যাপাসিটর 180nf/400V (C-809) যদি শর্ট হয়ে যায় তাহলে রেজিষ্টর 100Ω/5W (R-815) যেটা LOT-র 1 নং ট্যাগ-এর সাথে যুক্ত, যাকে বলা হয় EHT-র লোড রেজিষ্টর, সেটা আগুনে লাল (Red Hot) হয়ে যাবে। সাথে সাথে 300mA ফিউজ (F-801)টাও গলে যেতে পারে। এক্ষেত্রে সেট ডেড হয়ে যাবে।

(5) রেজিষ্টর 4·7K/20W (R-417) যেটা A সাপ্লাই থেকে এসেছে এবং 12V জেনার ডায়োড (D-401) হয়ে CA 920 আই সি'র 1নং পিন-এ গেছে, সেটা যদি ওপেন হয়ে যায়, তাহলে কোনো অসিলেসন হবে না এবং সেট ডেড হয়ে যাবে।

(6) লাইন ড্রাইভার ট্রান্সফরমার বা এল্ ডি টি (Line driver Transformer ; TR-801)-র প্রাইমারির সাথে যুক্ত রেজিষ্টর 3·3K/5W (R-805) যদি ওপেন হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে ট্রানজিষ্টর BD 115 (Q-802)-এ কোনো ভোল্টেজ যাবে না এবং সেট ডেড হয়ে যাবে।

(7) LOT-র 5নং ট্যাগ-এর সাথে যুক্ত ডায়োড IN4007 (D-806) যদি ওপেন হয়ে যায় তাহলে কোনো অকজিলিয়ারী সাপ্লাই (40V AC) যাবে না, সেক্ষেত্রে সেট ডেড হয়ে যাবে।

(২) এস সি আর পাওয়ার সাপ্লাই (SCR Power Supply)

এস সি আর সম্বন্ধে আগেই 'বেসিক ইলেকট্রনিক্স' পর্যায়ে পরিচয় পর্ব শেষ হয়েছে। তবু মনে করিয়ে দিই, অনেকটা ট্রানজিষ্টরের মতোই দেখতে এই এস সি আর'এর তিনটে লেগ, অ্যানোড (a) ক্যাথোড (k) এবং গেট (g) এস সি আর নামের মধ্যে দিয়েই বোঝা যাচ্ছে এটা একটা নিয়ন্ত্রিত রেকটিফায়ার এবং গেট'এর সাহায্যে একে নিয়ন্ত্রিত করা হয়।

এস সি আর থেকে আউটপুট ভোল্টেজ হিসেবে সবসময় পাওয়া যায় +110V ডিসি। এমন কি যদি ইনপুট ভোল্টেজ 130V এসি থেকে 230V এসি'র মধ্যে থাকে, তাহলেও আউটপুট হিসেবে ঐ স্থির 110V ডিসি'ই পাওয়া যায়। এস সি আর হিসেবে BT 115 বা TY 6004-ই বহুল ব্যবহৃত হয়।

অনেকগুলো এস সি আর ব্যবহৃত সার্কিট আছে। বিভিন্ন রিসিভারে বিভিন্ন সার্কিট ব্যবহার করা হয়। একটা এস সি আর সার্কিটে, এস সি আর ছাড়াও থাকে তিনটে বা চারটে বা পাঁচটা ট্রানজিষ্টর। তিনটে ব্যবহৃত হয় বায়াসিং এবং স্টেবিলাইজেশন (Stabilisation)-এর কাজে। বাকি ট্রানজিষ্টরকে দিয়ে তৈরী হয় ক্রো-বার সার্কিট (Crow-bar circuit)। স্বভাবতঃই যদি তিনটে ট্রানজিষ্টর দিয়েই এস সি আর সাপ্লাই সার্কিট তৈরী হয়, সেক্ষেত্রে ক্রো-বার সার্কিট থাকে না।

এই ক্রো-বার সার্কিট আসলে উচ্চ ভোল্টেজ কাট-আউট সার্কিট। অনেক সময় এস সি আর নষ্ট হয়ে গেলে সে শুধুই রেকটিফায়ারের কাজই করে। সে ক্ষেত্রে 220 ভোল্ট এসি সাপ্লাইকে রেকটিফাই (Rectify) করে, এস সি আর এর আউটপুটে পাওয়া যায় 230V ডিসি। যেহেতু এস সি আর ব্যবহৃত টেলিভিশন রিসিভারের সমস্ত অংশই 110V ডিসি অনুযায়ী ডিজাইন করা, তাই আকস্মিক এই দ্বিগুণ ভোল্টেজ অনেক পার্টস-এর ক্ষতি করে। তাই এই আকস্মিক ভোল্টেজ বৃদ্ধির হাত থেকে বাঁচতে ক্রো-বার সার্কিট লাগাতে হয়। ক্রো-বার সার্কিট আসলে একটা নিরাপত্তামূলক

চিত্র ৬.৩ এস সি আর পাওয়ার সাপ্লাই (আপট্রন উর্বশী 202)

সার্কিট হিসেবে কাজ করে এবং এস সি আর শর্ট হয়ে গেলে ডিসি সাপ্লাইকে ট্রিপ (Trip) করিয়ে আউটপুট ভোল্টেজকে শূন্যতে নামিয়ে আনে।

চিত্র ৬.৩এ চারটে ট্র্যানজিস্টর ব্যবহৃত একটা এস সি আর সার্কিট দেখানো হলো। এসি মেইনস্ থেকে প্লাগ হয়ে অন/অফ সুইচ-এর মাধ্যমে তড়িৎপ্রবাহ এসে পৌঁছোয় ফিউজ (F1, 3.5A)এ। তারপর সেখান থেকে রেজিস্টর 10Ω/15W (R1) এবং চোক কয়েল (L1)এর মাধ্যমে এস সি আর-এর অ্যানোডে পেঁাছোয় এসি মেইন সাপ্লাই। ক্যাথোডে পাওয়া যায় 120V ডিসি। এই ডিসি'র মধ্যে এসি রিপলস্ থাকে, তাই ফিলটার ক্যাপাসিটর 200Mf/200V, 400Mf/200V এবং 200Mf/200V (যথাক্রমে C1, C2 ও C3)র মাধ্যমে ফিল্টার করে এবং মধ্যবর্তী দু'টো রেজিস্টর 75Ω/20W (R27 ও R28)এর সাহায্যে ফিউজ (F2)র পর পাওয়া যায় 110V ডিসি সাপ্লাই।

অন্যদিকে ফিউজ F1-এর পরই আর একটা মেইন সাপ্লাই লাইন ডায়োড IN4007 (D1) এবং রেজিস্টরত্রয়ী 4.7K(R2, R3 ও R4)র মাধ্যমে ভোল্টেজকে নামিয়ে আনা হয় 25Vএ। পরবর্তী ক্ষেত্রে আরো একটা রেজিস্টর 2.7K(R5) ও 12V জেনার ডায়োড (ZD1) ব্যবহার করে একটা +12V সাপ্লাই পাওয়া যায়। এই 12V সাপ্লাই দেওয়া হয় ট্র্যানজিস্টর BC 158B (TR1) এবং আরো দু'টো ট্র্যানজিস্টর BC 147B(TR2 ও TR3)তে।

রেজিস্টর 100K(R6 ও R7) এবং 10K(R8) মিলে তৈরী করে পোটেনশিয়াল ডিভাইডার সার্কিট (Potential divider circuit)। এখানে যে ভোল্টেজ পাওয়া যায় তা' এসি। এই ভোল্টেজ দেওয়া হয় সুইচিং ডায়োড IN4148 (D3)র ক্যাথোডে।

একটা প্রি-সেট 1K(R-21) ট্র্যানজিস্টর BC 147B (TR3)র বেস এর সাথে যুক্ত থাকে। এটাকে ঘুরিয়ে আউটপুট ডিসি ভোল্টেজকে নিয়ন্ত্রন করা যায়।

এস সি আর পাওয়ার সাপ্লাই-এর কিছু সাধারণ ফল্ট

(1) যদি ফিউজ F1 (2.5A) বার বার পুড়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে হয় এস সি আর-টা অথবা ডায়োড IN4007 (D1)টা খারাপ হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে দু'টোকে পরীক্ষা করতে হবে। তবে এস সি আরকে বদলাবার আগে ক্যাপাসিটর 200Mf/200V(C1), 400Mf/200V(C2) ও 200Mf/200V(C3)কেও পরীক্ষা করে দেখতে হবে শর্ট আছে কী না।

(2) যদি কোনো ডিসি আউটপুট না পাওয়া যায় তাহলে প্রথমেই দেখতে হবে ডায়োডের অ্যানোডে এসি মেইনস্ সাপ্লাই আসছে কী না। পরবর্তী ক্ষেত্রে 12V জেনার ডায়োডে (ZD1)র +12V সাপ্লাই দেখতে হবে। এরপর সুইচিং ডয়োড IN4148-এর ক্যাথোডে 5 থেকে 8·5V এসি সাপ্লাই দেখতে হবে। এটাও ঠিক থাকলে ট্র্যানজিস্টর BC 158B (TR1), BC 147B(TR2) ও BC 147B (TR3) ও ক্রো বার সার্কিটের ট্র্যানজিস্টর BC 147B(TR4)এর বেস, এমিটার ও কালেকটর ভোল্টেজ, সার্কিটে উল্লেখিত ভোল্টেজ অনুযায়ী পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এরপর ফিউজ (F2)কে পরীক্ষা করলে নিশ্চয়ই ফল্টকে বার করা যাবে। কারণ ফল্ট এর মধ্যেই কোথাও থাকবে।

(৩) ট্র্যান্সফরমার পাওয়ার সাপ্লাই (Transformer Power Supply)

এই পাওয়ার সাপ্লাই খুবই সহজ পদ্ধতিতে বিভিন্ন অংশে পাওয়ার সাপ্লাই দেয়। জায়গা একটু বেশী লাগে এটা যেমন সত্যি, তেমন এটাও সত্যি যে এই পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহারের ফলে রিসিভার সেটের ওজনও বেড়ে যায়

তবুও এর ব্যবহার হয় কারণ এর সহজ সার্কিট। নিচে টেক্সলা টেলিভিশনের পাওয়ার সাপ্লাইকে বিস্তার করা হলো। এই ২০″ টেলিভিশনে ব্যবহার করা হয় ট্রান্সফরমার পাওয়ার সাপ্লাই।
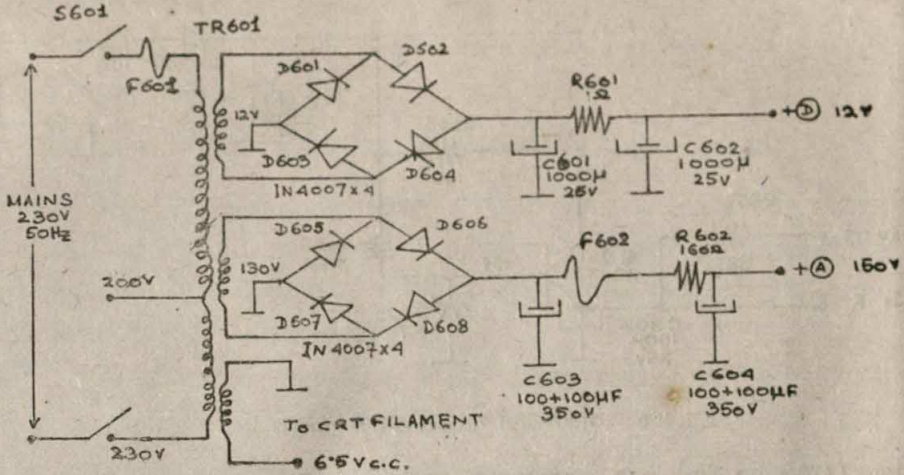
চিত্র ৬.৪ ট্রান্সফরমার পাওয়ার সাপ্লাই (টেক্সলা)

শুধুমাত্র এসি তেই এই পাওয়ার সার্কিট কার্যকরী হয়। এসি মেইনস্‌কে ইনপুট হিসেবে সুইচ্ এবং ফিউজ (F 601) এর মাধ্যমে দেওয়া হয় ট্রান্সফরমার (TR 601) এর প্রাইমারী কয়েল-এ। এই ট্রান্সফরমার (TR 601) হলো পাওয়ার ট্রান্সফরমার অর্থাৎ এর একটাই প্রাইমারী কয়েল থাকলেও একাধিক সেকেণ্ডারী কয়েল থাকে। এখানে সেকেণ্ডারীতে তিনটে কয়েল থাকে এবং তিনটে থেকে পাওয়া যায় তিনটে ভিন্ন ভোল্টের সাপ্লাই। 150 V এসি, 12 V এসি এবং 6·5 V এসি। প্রথম দুটো সাপ্লাইকে ব্রীজ রেকটিফায়ার দিয়ে ডিসিতে রূপান্তরিত করে A সাপ্লাই ও D সাপ্লাই হিসেবে বিভিন্ন অংশে পাঠানো হয়। 6·5 V এসি সরাসরি চলে যায় পিকচার টিউব (CRT) এর ফিলামেণ্টে।

150 V এসিকে চারটে ডায়োড IN 4007 (D 605, D 606, D 607, D 608) মাধ্যমে রেকটিফাই করে ক্যাপাসিটর 100+100 Mfd / 350V (C 603) ফিল্টার করে ফিউজ (F 602) তে আনা হয়। পরবর্তী ক্ষেত্রে রেজিস্টর 160 Ω (R 602) ও ক্যাপাসিটর 100+100 Mfd / 350 V (C 604) দিয়ে আবার ফিল্টার করে পাওয়া যায় 150 V মসৃন ডিসি। এটাই A সাপ্লাই।

আবার, 12 V এসি কেও চারটে IN 4007 ডায়োডের (D 601, D 602, D 603, D 604) মাধ্যমে রেকটিফাই করে ক্যাপাসিটর 1000 Mfd / 25 V (C 601), রেজিস্টর 1 Ω (R 601) এবং আবার একটা ক্যাপাসিটর 1000 Mfd / 25 V (C 602) র সাহায্যে ফিল্টার করে 12 V মসৃন ডিসি পাওয় যায়। এটা হলো D সাপ্লাই।

এখন এই A সাপ্লাই, সার্কিটের তিনটে অংশে দেওয়া হয়—ভিডিও আউটপুট, হরাইজেণ্টাল আউটপুট

এবং ব্রাইটনেস কন্ট্রোলের এক প্রান্তে। D সাপ্লাই দেওয়া হয় দু'টো অংশে—সাউণ্ড আই এফ ও আউটপুট এবং হরাইজেন্টাল সাব সিস্টেমে।
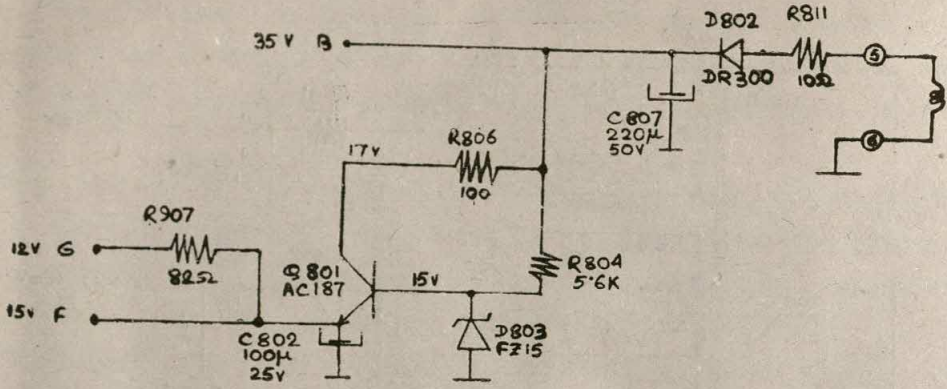
চিত্র ৬.৫ অক্‌জিলিয়ারী পাওয়ার সাপ্লাই (টেক্সলা)

এছাড়াও LOT-র 5নং ট্যাগ থেকে অক্‌জিলিয়ারী পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে পাওয়া যায় 35V ডিসি (+B সাপ্লাই) 15V ডিসি (+F সাপ্লাই) ও 12V (+G সাপ্লাই)। +B সাপ্লাই ভার্টিকাল অসিলেটর ও আউটপুট সেকশন ও ভিডিও আউটপুট সেকশনে দেওয়া হয়। F সাপ্লাই দেওয়া হয় টিউনার, হরাইজেন্টাল সাব-সিস্টেম ও ভিডিও ড্রাইভার সেকশনে ও G সাপ্লাই দেওয়া হয় ভিডিও আই এফ সেকশনে।

ট্র্যান্সফরমার পাওয়ার সাপ্লাই এর কিছু ফল্ট

(1) যদি পাওয়ার ট্র্যান্সফরমার (TR 801) এর প্রাইমারী পাক কেটে যায় তাহলে সেকেণ্ডারীতে কোনো আবেশিত তড়িৎ যাবে না, সেট মৃত হয়ে যাবে।

(2) সেকেণ্ডারী পাকের 150V ব্রীজ কানেকশন (D605, D606, D607, D608)এর কোনো একটা বা একাধিক ডায়োড কেটে গেলে 150V DC ভোল্টেজ পাওয়া যাবে না। সেট মৃত হয়ে যাবে।

(3) ফিউজ (F-602), যেটার একপ্রান্ত ফিল্টার ক্যাপাসিটর 100 + 100 Mfd/350V (C-603) ও অপর প্রান্ত রেজিস্টর 160Ω(R-602)র সাথে যুক্ত। এই ফিউজটা কেটে গেলে আউটপুট হিসেবে 150V DC পাওয়া যাবে না। ফিল্টার ক্যাপাসিটর (C-603) যদি শর্ট হয় তাহলে ফিউজটা বার বার পুড়ে যাবে।

(4) ফিল্টার ক্যাপাসিটর (C-603) যদি ওপেন হয়ে যায় তাহলে এসি রিপলস্ (Ripples) মিশে যাবে, সেক্ষেত্রে স্ক্রীনে 50 সাইকলস্ রিপলস্-এর ফলে সাদা বার ছবির ওপর দিয়ে, নিচে থেকে ওপরে বা ওপর থেকে নিচে ভার্টিকালি রোল করবে।

(5) সেকেণ্ডারী পাকে 12V ব্রীজ কানেকশন (D601, D602, D603, D604)-এর কোনো একটা বা একাধিক ডায়োড কেটে যায় তাহলে 12V DC ভোল্টেজ পাওয়া যাবে না. সেক্ষেত্রে সেটে কোনো শব্দ থাকবে না।

(6) ফিল্টার ক্যাপাসিটর 1000 Mfd/25V (C-601) যেটা রেজিষ্টর 1Ω (R-601)এর সাথে যুক্ত, সেটা শর্ট হলে 12V DC পাওয়া যাবে না। ট্রান্সফরমার বা ডায়োডগুলো গরম হয়ে যেতে পারে। যদি ওপেন হয় তাহলে শব্দের সাথে হামিং (Huming) মিশে যাবে।

(7) ট্রান্সফরমার থেকে 6·3V AC যদি না পাওয়া যায় তাহলে ফিলামেন্ট গরম হবে না যার ফলে স্ক্রীনে কোনো আলো থাকবে না কিন্তু শব্দ থাকবে।

(৪) সুইচ মোড পাওয়ার সাপ্লাই (Switch Mode Power Supply or SMPS)

আধুনিক টেলিভিশন সেটগুলোতে এখন ব্যবহৃত হচ্ছে এই সুইচ্ মোড্ পাওয়ার সাপ্লাই, সংক্ষেপে যা'কে বলে এস এম পি এস। রঙিন টেলিভিশনে বেশী ব্যবহৃত হলেও কিছু ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট টেলিভিশনেও এই পাওয়ার সাপ্লাই সার্কিট ব্যবহার করা হয়। এই সার্কিট বেশ ছোট, হালকা এবং শক্তির ক্ষয় অন্যান্য পাওয়ার সাপ্লাই-এর চেয়ে কম হওয়ার জন্য এখন আধুনিক টেলিভিশনে খুব বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে।

এই পাওয়ার সাপ্লাই-এ কিছু ট্রানজিষ্টরকে সিরিজে লাগানো হয়, যাদের কাজ দ্রুত গতিতে খোলা এবং বন্ধ হওয়া। ইনপুট হিসেবে প্রথমে এসিকে অনিয়ন্ত্রিত ডিসিতে পরিণত করা হয়। এই ডিসিকে প্রায় টুকরো টুকরো করে ঐ ট্রানজিষ্টর সুইচিং এলিমেণ্টগুলো, যা অত্যন্ত দ্রুত হারে ঘটে। এর ফলে যে ডিসি পালস্ (20 KHz) তৈরী হয়, এই পালসকে একটা ট্রান্সফরমার আর রেকটিফায়ার ডায়োডের মাধ্যমে পরিশ্রুত করে পালসেটিং ডিসি থেকে মসৃন (Smooth) ডিসিতে রূপান্তরিত করা হয়। এই খোলা ও বন্ধ'র সময়, যাকে অন্-অফ্ সময় (on-off period) বলা হয়, সেটা পরিবর্তন করে আউটপুট ভোল্টেজকে নিয়ন্ত্রণ করে কণ্ট্রোল সার্কিট।

এস এম পি এস এ নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো পাওয়া যায়।

(1) সুইচিং ট্রানজিষ্টরগুলো যেহেতু শুধুমাত্র অন্-অফ এর কাজই করে তাই এখানে শক্তির ক্ষয় খুবই কম হয়।

(2) পাওয়ার ট্রান্সফরমার, ইনডাকটর এবং ফিলটার ক্যাপাসিটরগুলো ছোট এবং হালকা হওয়ার জন্য এর আয়তন এবং ওজন অনেক কম হয়।

(3) এই পাওয়ার সাপ্লাই অনেক নীচু এসি ইনপুট ভোল্টেজেও কাজ করতে পারে।

(4) এর ইনপুট ক্যাপাসিটরগুলো অনেক বেশী এনার্জি ধরে রাখে বলে যদি একটুক্ষণের জন্য এসি ইনপুট ভোল্টেজকে তুলেও নেওয়া হয় বা বন্ধ হয়ে যায় তাহলেও পাওয়ার সাপ্লাই ঠিক থাকে।

৭

বেলটেক ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট (২০″) রিসিভার সেট

বেলটেক সার্কিটই ভারতের সমস্ত ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট টেলিভিশন রিসিভার সেটের প্রধান সার্কিট বা মাদার সার্কিট (Mother circuit) হিসেবে পরিগণিত হয়। এই সার্কিটকেই পরবর্তীকালে পরিবর্তিত করে, পরিশীলিত করে বিভিন্ন সার্কিট ডিজাইন করা হয়েছে।

একথা সত্যি যে টেলিভিশন টেকনোলজির ক্ষেত্রে হাইব্রিড (ভালভ্, আই সি এবং ট্র্যানজিস্টরের সংমিশ্রণ) সার্কিট থেকে বহু পথ পেরিয়ে সলিড স্টেট (সম্পূর্ণ আই সি ও ট্র্যানজিস্টর নির্ভর) সার্কিটে আসার পর এখন অনেক নতুন নতুন সার্কিট ডিজাইন করা হচ্ছে। কিন্তু, টেলিভিশন সার্ভিসিং এর প্রশ্নে 'বেলটেক'এর সার্কিটকে নিখুঁতভাবে শিখতে পারলে অন্য সার্কিটগুলোয় কাজ করতে বিশেষ অসুবিধা হয় না।

'বেলটেক' সার্কিটের বিভিন্ন অংশে যে আই সি গুলো ব্যবহৃত হয় নিচে তার একটা তালিকা দেওয়া হলো, সঙ্গে সঙ্গে এই আই সি গুলো কী কী কাজ করে—সেটাও দেওয়া হলো।

CA 3068—ভিডিও আই এফ এ্যাম্প্লিফায়ার, ভিডিও ডিটেকটর এবং অটোমেটিক গেইন কন্ট্রোল (এ জি সি)

TBA 120S—সাউণ্ড আই এফ অ্যাম্প্লিফায়ার, এফ এম ডিটেকটর।

TBA 810—অডিও প্রি-অ্যাম্প্লিফায়ার, অডিও আউটপুট

TDA 1044—ভার্টিকাল অসিলেটর ও আউটপুট।

CA 920 —হরাইজেন্টাল সাব-সিস্টেম, সিঙ্ক সেপারেটর, অটোমেটিক ফ্রিকোয়েন্সি কন্ট্রোল (এ এফ সি), হরাইজেন্টাল অসিলেটর।

ভিডিও আই এফ সাব-সিস্টেম

এই ভিডিও আই এফ সাব সিস্টেমে আই সি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে 19 পিনের মোনোলিথিক ইনটিগ্রেটেড সার্কিট CA 3068। এই আই সি'র মধ্যে আছে,

(1) ক্যাসকোড অ্যাম্প্লিফায়ার,

(2) ভিডিও ও অডিও আই এফ সিগন্যালের জন্য আলাদা ইউনিট

(3) ভিডিও ডিটেকটর ও ইন্টার-ক্যারিয়ার সাউণ্ড ডিটেকটর

(4) আই এফ এজিসি জেনারেটর

আই এফ সিগন্যাল (ভিডিও ঃ 38·9 MHz.; অডিও ঃ 33·4 MHz) টিউনার থেকে বেরিয়ে এই আই সি'র ইনপুটে যাওয়ার আগে মাঝখানে থাকে অনেকগুলো ওয়েভ ট্র্যাপ (Wave trap) যাদের কাজ হলো সিগন্যালের মধ্যে মিশে থাকা অন্যান্য ফ্রিকোয়েন্সির সিগন্যালগুলোকে তাড়িয়ে দেওয়া। টিউনার ও আই সি'র 6নং পিনের মাঝখানে রেজিস্টর, ক্যাপাসিটর এবং কয়েলের মাধ্যমে এই 'ট্র্যাপ সার্কিট' বানানো হয়।

এই আই সি'র প্রধান কার্যকরী পিন নং হলো—2, 3, 4, 6, 7, 8, 15, 19. রেজিস্টর 33Ω (R-214)র মাধ্যমে +12V(D সাপ্লাই) দেওয়া হয় 15 নং পিনে, আই এফ সিগন্যাল দেওয়া হয় 6নং পিনে সে কথা তো আগেই বলা

হয়েছে। এছাড়াও লাইন আউটপুট ট্র্যান্সফরমার (LOT) থেকে রেজিষ্টর 27K(R-209)এর মাধ্যমে একটা কিয়িং পাল্‌স্ (Keying pulses) 3নং পিনে দেওয়া হয় এজিসি জেনারেটরের জন্য।

আউট পুট হিসেবে ইন্টার-ক্যারিয়ার সাউণ্ড আই এফ (5.5MHz) পাওয়া যায় 2নং পিনে এবং কম্পোজিট ভিডিও সিগন্যাল পাওয়া যায় 19নং পিনে।

এই অংশের বিভিন্ন ফল্ট

(1) CA 3068 আই সি'র 3নং পিনের সাথে LOTর 9নং ট্যাগে যে রেজিষ্টর 27K(R-816) যুক্ত আছে। সেটা 'ওপেন' হয়ে গেলে ছবি কখনো আবছা আবার কখনো উজ্জ্বল হতে থাকবে এবং ছবির স্থিরতা (Stability) থাকবে না, ছবি কাঁপবে।

(2) আই সি'র 2নং পিনে ইন্টার ক্যারিয়ার সাউণ্ড আই এফ পাওয়া যায়। এই পিনের ভোল্টেজ হলো 6V, তা' পাওয়া না গেলে ষ্টেশন সাউণ্ড থাকবে না কিন্তু অডিও সাউণ্ড ঠিক থাকবে। এক্ষেত্রে আই সি পাল্টে দিতে হবে।

(3) 47K(R-219) একটা আর এফ এজিসি প্রি-সেট। এটার ভূমিকা খুবই মুখ্য। আই সি'র 4নং পিনের সাথে যুক্ত এই প্রি-সেট ঠিকমতো অ্যাডজাষ্ট না করা থাকলে ছবি ও শব্দ নাও থাকতে পারে, ছবি আবছা অথবা স্নোযুক্ত, অথবা ভাসমান ছবি [ঠিক যেন ছবিটা ভেসে যাচ্ছে, এই ফল্টকে বলে ফ্লোটিং (Floating)] আসবে, এক্ষেত্রে এই প্রি-সেটটাকে ঘুরিয়ে ঠিকমতো অ্যাডজাষ্ট করলেই এই ফল্টগুলো চলে যাবে।

(4) এজিসি ফেজ রিভার্সাল (Phase reversal)এর কাজে ব্যবহৃত ট্রানজিষ্টর BC 158B(Q-201)এর বেস ও আই সি'র 7নং পিনের সাথে যুক্ত রেজিষ্টর 4.7K(R-212) যদি 'ওপেন' হয়ে যায় তাহলে কোনো ছবি ও শব্দ পাওয়া যাবে না।

(5) 4·7K(R-220) হলো একটা প্রি-সেট কন্ট্রোল, এটা হলো আর এফ এজিসি কন্ট্রোল—যা যুক্ত আই সি'র 8নং পিনের সাথে। এটাও ঠিকভাবে এ্যাডজাষ্ট না করা থাকলে শব্দ ও ছবি নাও থাকতে পারে, ছবি আবছা ও স্নোযুক্ত হতে পারে অথবা ছবি কাঁপতে পারে। এক্ষেত্রে এটাকে এ্যাডজাষ্ট করতে হবে।

(6) রেজিষ্টর 33Ω (R-214), যেটা এজিসি ট্রানজিষ্টর BC 158B (Q-201)এর এমিটার থেকে আই সি'র 15নং পিনের সাথে যুক্ত। এটা 'ওপেন' হয়ে গেলে আই সি'তে 12V সাপ্লাই যাবে না, যার ফলে রাষ্টার থাকলেও কোনো ছবি ও শব্দ থাকবে না।

(7) আই সি'র 19নং পিনের মাধ্যমে কম্পোজিট ভিডিও সিগন্যাল, আউটপুট হিসেবে বেরোয়। এই পিনে যদি 9V না পাওয়া যায় তাহলে কোনো ছবি পাওয়া যাবে না কিন্তু শব্দ থাকবে। এক্ষেত্রে বুঝতে হবে আই সি'টা দুর্বল হয়ে গেছে বা খারাপ হয়ে গেছে। অতএব আই সি বদলে দিতে হবে।

(8) এজিসি ট্রানজিষ্টর BC 158B(Q-201) যদি শর্ট বা ওপেন হয়ে যায় তা'হলে স্নোযুক্ত রাষ্টার বা শুধু রাষ্টার থাকবে। কোনো শব্দ ও ছবি থাকবে না। এক্ষেত্রে ট্রানজিষ্টরটা বদলে দিতে হবে।

সাউণ্ড আই এফ সেকশন

এই অংশের জন্য ভারতে সবচেয়ে বেশী যে আই সি ব্যবহৃত হয়, সেটা হলো TBA 120S। বস্তুত

গোটা আই এফ সেকশনের সমস্ত কম্পোনেন্টগুলোই এই TBA 120S চিপ-এর মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই একটা আই সি'র মধ্যেই আছে আই এফ অ্যাম্‌প্লিফায়ার, লিমিটার, এফ এম সাউণ্ড ডিটেকটর এবং অডিও প্রাক-অ্যাম্‌প্লিফায়ার।

সাধারণতঃ বিভিন্ন সার্কিটের জন্য এই আই সি'র কার্যকরী ভোল্টেজ +12 V থেকে + 40 V এর মধ্যে থাকে। বেলটেকএ +12 V (D সাপ্লাই) সাপ্লাই দেওয়া হয় আই সি'র 11 নং পিনে। সাউণ্ড আই এফ (5·5 MHz) কে টিউনড্ সার্কিট (Tuned Circuit) এর মাধ্যমে আই সি'র 13 ও 14 নং পিনে দেওয়া হয়। 7 ও 9 নং পিনের সাথে যুক্ত থাকে একটা ডিটেকটর সার্কিট, যাকে বলা হয় কোয়াড্রাটার ডিটেকটর* (Quadrature detector)। আই সি'র 8 নং পিন থেকে অডিও আউটপুট পাওয়া যায়, যা ভল্যুম কণ্ট্রোল (Volume Control) এর মাধ্যমে সাউণ্ড আউটপুট অংশে চলে যায়।

TBA 120S এর পিন সংখ্যা 14, যার মধ্যে পিন নং 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14 কার্যকরী ও প্রধান পিন।

এই অংশের বিভিন্ন ফল্ট

(1) আই সি'র 1 ও 13 নং পিনের সাথে যুক্ত ক্যাপাসিটর 220 pf (C-302) যদি ওপেন বা শর্ট হয়ে যায় তাহলে শব্দ অপরিচ্ছন্ন আসবে বা বিকৃত শব্দ হবে।

(2) আই সি'র 7 ও 9 নং পিনের সাথে যুক্ত ডিটেকটর সার্কিটের ডিসক্রিমিনেটর (Discriminator) কয়েল (L-302) ও সমান্তরালে থাকা ক্যাপাসিটর 100 pf (C-307) এর মধ্যে যদি কয়েলটা মিস্‌টিউনড্ (Mistuned) এবং/অথবা ক্যাপাসিটরটা ওপেন বা শর্ট হয়ে যায়, তাহলে শব্দ অপরিচ্ছন্ন আসবে ও শব্দের মধ্যে হিস্ হিস্ (Hissing) বা হামিং (Huming) শব্দ আসবে। এক্ষেত্রে কয়েলটা অ্যাড্‌জাষ্ট করে দেখতে হবে। না হলে ক্যাপাসিটরটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

(3) ক্যাপাসিটর **5 Mfd (C-306)** যেটা আই সি'র 8 নং পিন ও ভল্যুম কণ্ট্রোলের মধ্যে থাকে সেটা যদি ওপেন বা শর্ট হয়ে যায় তাহলে কোনো ষ্টেশনের শব্দ পাওয়া যাবে না।

(4) আই সি'র 11 নং পিনের সাথে যুক্ত রেজিষ্টর 47Ω (R-301) এর মাধ্যমেই আই-সি'তে সাপ্লাই যায়। এই রেজিষ্টরটা ওপেন হয়ে গেলে আই সি তে কোনো সাপ্লাই যাবে না এবং স্বাভাবিকভাবেই সাপ্লাই না গেলে আই সি সক্রিয় হবে না এবং সেটে কোনো শব্দ থাকবে না।

(5) ট্র্যাপ কয়েল (L-301) এবং সমান্তরালে রাখা ক্যাপাসিটর 220 pf (C-301) নিয়ে তৈরী টিউনড্ সার্কিট। এই সার্কিট থেকেই 5·5 MHz সাউণ্ড আই এফ সিগন্যাল আই সি'র 13 ও 14 নং পিনে যায়। এই সার্কিটের কোনো একটা অথবা দু'টোই যদি ওপেন বা শর্ট হয়ে যায় তাহলে কোনো ষ্টেশনের শব্দ পাওয়া যাবে না।

(6) ক্যাপাসিটর **22 pf** (**C-301**) যেটা CA 3068 আই সি'র 2 নং পিনের এবং 5.5 MHz ট্র্যাপ (TR-301) এর এক প্রান্তর সাথে যুক্ত, সেটা ওপেন হয়ে গেলে 5·5 MHz, আই সি TDA 120S-এ ঢুকতে পারবে না। সেক্ষেত্রে কোনো ষ্টেশনের শব্দ পাওয়া যাবে না।

---

* কোয়াড্রাট্যর ডিটেকটর একসাথে লিমিটার (Limiter), একটা ডিসক্রিমিনেটর (Discriminator) এবং একটা অডিও ভোল্টেজ অ্যাম্‌প্লিফায়ারের কাজ করে।

সাউণ্ড আউটপুট অংশ

সাউণ্ড আউটপুট অংশে CA810 আই সি ব্যবহৃত হয়েছে। CA810এর মধ্যে উচ্চ বিশ্বস্ত (fidelity) অডিও এ্যাম্প্লিফায়ার ছাড়াও নিয়ন্ত্রিত পাওয়ার সাপ্লাই ও তড়িৎ-এর স্থির ও মসৃন প্রবাহের জন্য স্টেবিলাইজার (Stabilizer) সার্কিটও থাকে। সমস্ত অডিও ব্যাণ্ড-এর ক্ষেত্রেই এই আই সি ব্যবহৃত সার্কিট ফ্রিকোয়েন্সিকে ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারে। ট্রেবল (Treble) ও বাস (Bass)কে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও এই আই সির ব্যবহার খুবই ফলপ্রসু। এই আই সি থেকেই ফাইনাল অডিও আউটপুট পাওয়া যায়। একটা 8Ω ইম্পিডেন্স লোড যুক্ত স্পিকারের জন্য এই আই সি থেকে 4 ওয়াটেরও বেশী আউটপুট পাওয়ার পাওয়া সম্ভব। এই সার্কিটের ইনপুট ইম্পিডেন্সও অনেক বেশী (প্রায় 100KΩ)।

ভল্যুম কন্ট্রোলের মাধ্যমে আই সি'র 10নং পিনে এসে পৌঁছোয় অডিও ইনপুট সিগন্যাল। ভল্যুম কন্ট্রোল 20K(R-303)এর সাহায্যে সিগন্যালের সাথে মিশ্রিত উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সিকে এড়িয়ে যাওয়া যায় এবং নির্দিষ্ট টোনকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। +16V (C সাপ্লাই) দেওয়া হয় আই সি'র 1 ও 6 নং পিনে। আই সি'র 8নং পিনে পাওয়া যায় অডিও আউটপুট, যা একটা ক্যাপাসিটর 1000 Mfd / 25V (C-313)র মাধ্যমে স্পিকারে দেওয়া হয়। সম্পূর্ণ আউটপুট স্টেজের স্থায়ীত্বের জন্য 16নং পিন থেকে ক্যাপাসিটর 330 pf(C-314)র মাধ্যমে 7নং পিনে দেওয়া হয় ফিড্ব্যাক (Feedback)।

CA 810-এর পিন সংখ্যা—16। এর মধ্যে প্রধান কার্যকরী পিন হলো 1, 6, 7, 8, 9, 10 ও 16।

এই অংশের বিভিন্ন ফল্ট

(1) রেজিষ্টর 100Ω(R-306), যেটা আই সি'র 1 ও 6 নং পিনের সাথে যুক্ত, সেটা ওপেন হয়ে গেলে +16V (C সাপ্লাই) যাবে না। সে ক্ষেত্রে কোনো শব্দ পাওয়া যাবে না।

(2) আই সি'র 6 নং ও 16 নং পিনের মাঝখানে থাকে ক্যাপাসিটর 100Mfd/25V(C-315)। এই ক্যাপাসিরটা ওপেন বা শর্ট হয়ে গেলে স্পিকারে মোটর বোটএর মতো ভট্ ভট্ শব্দ হবে এবং শব্দ কাঁপবে।

(3) আই সি'র 7 নং পিনকে একটা ক্যাপাসিটর 2.2Kpf(C-309)এর মাধ্যমে পিসিবি'র নেগেটিভে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ক্যাপাসিটরটা শর্ট হয়ে গেলে আই সি'র সমস্ত পিন ভোল্টেজ নেমে যাবে এবং কোনো শব্দ থাকবে না।

(4) আই সি'র 8 নং পিনের সাথে যুক্ত ক্যাপাসিটর 470Mfd/25V(C-310) যদি ওপেন হয়ে যায় তাহলে শব্দের সাথে হামিং (Huming) থাকবে।

(5) আই সি'র 9 নং পিন আর পিসিবি'র নেগেটিভের মধ্যবর্তী অংশে লাগানো থাকে ক্যাপাসিটর 100 Mfd/25V(C-310)। এই ক্যাপাসিটরটা শর্ট হয়ে গেলে কোনো শব্দ থাকবে না, আই সি'র সমস্ত পিন ভোল্টেজ নেমে যাবে এবং ওপেন হয়ে গেলে শব্দ কমে যাবে বা মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যাবে।

(6) ভল্যুম কনট্রোলের মাঝের পিন এবং আই সি'র 10 নং পিনের সাথে যুক্ত ক্যাপাসিটর 1 Mfd(C-308) যদি ওপেন হয়ে যায় তাহলে কোনো শব্দ থাকবে না এবং শর্ট হয়ে গেলে বিকৃত (Distorted) শব্দ পাওয়া যাবে।

(7) আই সি'র 16 নং পিনে পাওয়া যায় অডিও আউটপুট। এই আউটপুট ভোল্টেজকে একটা ক্যাপাসিটর 1000 Mfd/25V(C-313)র মাধ্যমে নিয়ে যাওয়া হয় স্পিকারে। সার্কিটে এই ক্যাপাসিটরের ভূমিকা খুবই মুখ্য। এটা

যদি শর্ট হয়ে যায় তাহলে স্পিকারের কয়েল কেটে যেতে পারে। স্পিকারের কয়েল কাটলে তাই এই ক্যাপাসিটরটাকে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হয়। যদি এই ক্যাপাসিটরটা ওপেন হয়ে যায় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই স্পিকারে কোনো শব্দ পাওয়া যাবে না।

(৪) আই সি'র 16 নং পিন থেকে বেরিয়ে একটা রেজিস্টর 1Ω(R-305) এবং একটা ক্যাপাসিটর 0.1 Mfd(C-3120)-এর মাধ্যমে যে চেসিস কানেকশন করা হয়েছে, সেই ক্যাপাসিটরটা শর্ট হয়ে গেলে আই সি'র পিন ভোল্টেজগুলো কমে যাবে এবং শব্দও থাকবে না। যদি ক্যাপাসিটরটা ওপেন হয়ে যায়, তাহলে শব্দ অনেক কমে যাবে আর শব্দের সাথে হামিংও আসবে।

এছাড়াও অনেক সময় দেখা যায়, আই সি'র পিন ভোল্টেজ মোটামুটি ঠিক থাকলেও শব্দের গেইন (Gain) যথেষ্ট নয়। আসলে আই সি'টা দুর্বল হয়ে যাওয়ার দরুণ যথেষ্ট লোড নেওয়ার ক্ষমতা হারালেই এই ফল্ট হয়। পিন ভোল্টেজের বিশেষ হেরফের না ঘটলেও শব্দ কমে আসে। এক্ষেত্রে একটা ভালো আই সি লাগালেই এই ফল্টটা চলে যাবে।

হরাইজেণ্টাল সাব-সিষ্টেম

হরাইজেণ্টাল সাব-সিস্টেমে, আই সি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে CA 920। যার প্রধান কাজগুলো নিম্নরূপ,

(1) কম্পোজিট ভিডিও সিগন্যাল এর সঙ্গে মিশে থাকা সিঙ্ক পালস্‌গুলোকে ছেঁকে, আলাদা করে ফেলা।

(2) 15,625 সাইকলস্/সেকেণ্ড হরাইজেণ্টাল স্ক্যানিং পালস্ তৈরী করা।

(2) সিঙ্ক পালস্ অনুযায়ী অটোমেটিক হরাইজেণ্টাল অসিলেটর ফ্রিকোয়েন্সির ওপর স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রন রক্ষা করা।

(4) হরাইজেণ্টাল আউটপুট এবং ডিফ্লেকশন কয়েলকে চালনা করার জন্য অসিলেটর আউটপুটকে নিয়ন্ত্রিত ও বাস্তবায়িত করা।

এছাড়াও ডিটেকটর, দুই স্তরের ডিসক্রিমিনেটর, ফেজ্ শিফটার (Phase shifter) ইত্যাদি সার্কিটও এই আই সি'র মধ্যে থাকে। স্বাভাবিক কারণেই টেলিভিশন রিসিভার সেটে CA 920-র ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

CA 3068-এর 19 নং পিন থেকে আসা কম্পোজিট ভিডিও সিগন্যাল*, ট্রানজিষ্টর BC 148A (Q-401)এর মাধ্যমে ফেজ্ রিভার্সাল (Phase reversal) হয়ে CA 920-র 8 নং পিনে পেঁছোয়। ট্রানজিষ্টর BC 148A Q-401)কে কার্যকরী করতে দরকার হয় +12V (Dসাপ্লাই)। CA 920, 200V সাপ্লাই থেকে জেনার ডায়োড 12V(D-401)এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত +12V সাপ্লাই দ্বারা কার্যকরী হয়,—যা আই সি'র 1 নং পিনে দেওয়া হয়।

সিঙ্ক সেপারেটর—ছেঁকে বা'র করা সিঙ্ক পালস্ পাওয়া যায় আই সি'র 7 নং পিনে। এই সিঙ্ক সিগন্যালকে তারপর রেজিষ্টর 2·7K(R-406) এবং ক্যাপাসিটর 10nf/30V(C-407)এর মাধ্যমে ভার্টিকাল সেকশনের ইনপুট হিসেবে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও এই সিঙ্ক পালস্‌কে রেজিষ্টর 47K(R-408), 4.7K(R-409) এবং ক্যাপাসিটর 220pf/500V (C-409)এর সাহায্যে তৈরী ডিফারেনশিয়েটর সার্কিটের মাধ্যমে আই সি'র 6 নং পিনের সাথে যুক্ত করা হয়।

হরাইজেণ্টাল অসিলেটর—হরাইজেণ্টাল অসিলেটর ফ্রিকোয়েন্সি নির্ভর করে আই সি'র 14 নং পিনের সাথে যুক্ত ক্যাপাসিটর 10nf/160V(C-412), 15 নং পিনের সাথে যুক্ত রেজিষ্টর 2.7K(R-413) এবং 15 নং পিনে কতটা

---

* যেহেতু এই ভিডিও সিগন্যালের মধ্যেই থাকে সিঙ্ক পালসগুলো তাই একে কম্পোজিট ভিডিও সিগন্যাল বলা হয়।

(7) সহায়ক পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে +40V, +16V এবং +12V তৈরী করা, যার সাহায্যে টিভি রিসিভারের বিভিন্ন অংশ কার্যকরী হবে।

এই অংশ প্রধানতঃ তিনটে মূল স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই স্তম্ভগুলো হলো দু'টো ট্রানজিস্টর BD115 (Q-802) ; BU205 (Q-803) এবং একটা লাইন আউটপুট ট্রান্সফরমার (LOT ; TR802)। ট্রানজিস্টর BD115কে হরাইজেন্টাল ড্রাইভার এবং ট্রানজিস্টর BU205কে সুইচিং সহ পাওয়ার ট্রানজিস্টর বলা হয়।

আই সি CA920-র 2নং পিন থেকে 15,625 সাইকলস / সেকেণ্ড হরাইজেন্টাল অসিলেটর আউটপুট, ক্যাপাসিটর 2·5 Mfd/16V (C-803)র মাধ্যমে হরাইজেন্টাল ড্রাইভার ট্রানজিস্টর BD115 এর বেস-এ দেওয়া হয়। এই ট্রানজিস্টরের কালেকটরে প্রায় 130V দেওয়া হয়। ড্রাইভার ট্রান্সফরমার (TR801), কয়েল (L-803) এবং রেজিস্টর 3·3Ω/1W (R-814)এর মাধ্যমে সম্প্রসারিত পাল্‌স, হরাইজেন্টাল আউটপুট ট্রানজিস্টর BU205কে চালনা করে। এই ট্রানজিস্টরের কালেকটর বায়াস করা হয় একটা ফিউজ 300mA(F-801) এবং রেজিস্টর 56Ω/5W(R-815)এর মাধ্যমে 200V সাপ্লাইএর সাহায্যে।

লাইন ডিফ্লেকশন কারেন্ট তৈরী

যখন ট্রানজিস্টর BU205 সম্পৃক্ত (Saturation) অবস্থায় থাকে তখন ট্রান্সফরমার (TR-802)এর প্রাইমারী পাকে এবং হরাইজেন্টাল ডিফ্লেকশন কয়েলে 200V সাপ্লাই তড়িৎ প্রবাহিত হয়। 'ট্রেস'এর জন্য ইয়োক কারেন্ট, ক্যাপাসিটর 180 nfd(C-810)কে চার্জ করে যতক্ষণ না পর্যন্ত ঐ তড়িৎপ্রবাহ শূন্যাতে নেমে আসে। এরপর এই ক্যাপাসিটর যখন ডিসচার্জ করে তখন ইয়োক কারেন্ট নেগেটিভ দিকে বাড়তে থাকে। ক্যাপাসিটর (C-810)এর এই ডিসচার্জিং সময়টাই 'রিট্রেস' সময়।

হরাইজেন্টাল আউটপুট সেকশনে ট্রানজিস্টর BU205এর কালেকটর-বেস জাংশন, ডাম্পার ডায়োডের মতো ব্যবহার করে। হরাইজেন্টাল আউটপুট সেকশনে এই ডাম্পার ডায়োডের ভূমিকা যথেষ্ট। এর কাজ প্রয়োজনীয় স্ক্যানিং তড়িৎপ্রবাহকে হরাইজেন্টাল ডিফ্লেকশন কয়েল (Horizontal deflection coil)এ পৌঁছে দেওয়া। যেহেতু হরাইজেন্টাল আউটপুট সার্কিট মূলতঃ আবেশক (Inductive) সার্কিট, তাই এটা উচ্চ ভোল্টেজ ফ্লাইব্যাক পালস (Flyback pulse) তৈরী করে। এর ফলে আউটপুট সার্কিটে অসিলেশন হয় আর এই অবাঞ্ছিত অসিলেশনের জন্য রাষ্টারের বাঁ পাশে তৈরী হয় কিছু সাদা বার। এই অসিলেশনকে সরিয়ে ফেলার (Dump) কাজে ব্যবহার করা হয় এই ডাম্পার ডায়োড। এই ডায়োডের মাধ্যমে একটা নিচু সাণ্ট রেজিস্টেন্সের সাহায্যে এই অসিলেশনকে সরিয়ে ফেলা হয়।

18KV উচ্চ ভোল্টেজ তৈরী

হরাইজেন্টাল সাইকল্‌-এর ট্রেস সময়ে, ট্রানজিস্টর (Q-803)র কালেকটর কারেণ্ট, ট্রান্সফরমার (TR-802) এর 1 ও 3 নং ট্যাগের কয়েলের চারপাশে একটা চৌম্বকক্ষেত্র তৈরী করে। যখন স-টুথ পালস্‌ তার পিক্‌ (Peak) মানে পৌঁছোয় তখন ট্রানজিস্টর (Q-803)র বেস ভোল্টেজ হঠাৎ শূন্যায় নেমে আসে এবং এই ট্রানজিস্টরকে অফ করে দেয়। কালেকটর কারেণ্টও দ্রুত শূন্যায় নেমে আসে। এর ফলে একটা ব্যাক emf, TR802-এর প্রাইমারী পাকে 1 ও 3 নং ট্যাগে আবেশিত হয়। এই ট্রান্সফরমারের সেকেণ্ডারী কয়েল রেকটিফায়ার ডায়োড TV20 (D-809)এর অ্যানোডের

সঙ্গে যুক্ত। এই অ্যানোডে 18KV AC পাওয়া যায়। এই ডায়োড 18KV ACকে DCতে পরিবর্তিত করে CRT-র ফাইনাল অ্যানোডে পাঠিয়ে দেয়।

বুষ্ট ভোল্টেজ তৈরী

রিট্রেস সময়ে যখন ট্রান্সফরমার (TR-802)এর 1 ও 3 নং ট্যাগে উচ্চ ব্যাক emf তৈরী হয় তখন 3নং ট্যাগে 1100V পাওয়া যায়। এই 1·1KV, ডায়োড (D-502) ও ক্যাপাসিটর (C-505) দ্বারা রেকটিফায়েড এবং ফিলটার হয়। এই বুষ্ট ভোল্টেজ CRT-র ফোকাসিং এবং একসেলেরেটিং গ্রিডএ ব্যবহার করা হয়।

এজিসি ও এ এফসি সার্কিটের জন্য ফ্লাই ব্যাক পালস্ তৈরী

18KV তৈরীর সময় লাইন আউটপুট ট্রান্সফরমার (TR-802)এর 7 ও 8 এবং 8 ও 9 নং ট্যাগে কিছু ফ্লাই ব্যাক পালস্ আবেশিত হয়। এই আবেশিত পালস্ অসিলেটর ফ্রিকোয়েন্সি হিসেবে এ এফ সি সার্কিটে কাজ করে। এই পালস্‌কে রেজিস্টর 47K(R-812)-র মাধ্যমে CA 920-র 5নং পিনে দেওয়া হয়। এ জি সি সিস্টেম-এর জন্য ফ্লাই ব্যাক পালস্, রেজিস্টর 27K (R-816)-এর মাধ্যমে (TR-802)-এর 9 নং ট্যাগ থেকে নিয়ে CA3068-এর 3 নং পিনে দেওয়া হয়।

ব্ল্যাঙ্কিং পালস তৈরী

ট্রান্সফরমার (TR-802)-এর 8নং ট্যাগ থেকে রেজিস্টর 56K(R-813)-এর মাধ্যমে ভিডিও আউটপুট সেকশনের ব্ল্যাঙ্কিং ট্রানজিস্টর (Q-503)-এর বেসে দেওয়া হয়।

এই অংশের ফল্ট

(1) ট্র্যান্সফরমার (TR-801) আংশিক শর্ট হলে ছবি ডান দিকে সরে যাবে অথবা স্ক্রীনের মাঝখানে ভার্টিকাল বার দেখা যাবে আর ওপেন হয়ে গেলে BU205 (Q-803)-এর বেস-এ ড্রাইভ ভোল্টেজ (35V) যাবে না, সেট মৃত হয়ে যাবে।

(2) রেজিষ্টর 22K (R-814) যেটা BU205 (Q-803) এর বেস-এর সঙ্গে যুক্ত এটা ওপেন হয়ে গেলে ড্রাইভ ভোল্টেজ যাবে না। সেট মৃত হয়ে যাবে।

(3) ট্র্যানজিষ্টর BU205 (Q-803) যেটা LOT-র 3নং ট্যাগের সঙ্গে যুক্ত সেটা শর্ট হয়ে গেলে LOT-র 1, 2, 3 ট্যাগের ভোল্টেজ (150V থেকে 175V) কমে যাবে যার ফলে সেট মৃত হয়ে যাবে।

(4) ক্যাপাসিটর 0·005 Mfd অথবা 3·3 Kpf (C-808) যেটা LOT-র 3নং ট্যাগ থেকে BU205-এর এমিটারে লাগানো আছে সেটা শর্ট হয়ে গেলে সেট মৃত হয়ে যাবে, ওপেন হয়ে গেলে ছবি বাঁ ও ডান দিক থেকে প্রস্থে ছোট হ'য়ে যাবে এবং বুষ্ট ভোল্টেজ কমে যাবে।

(5) ক্যাপাসিটর 0·15Mf (C-810) যেটা LOT-র 2নং ট্যাগ থেকে হরাইজেন্টাল ইয়োক AT-1040/14 (DY-801) এর সাথে যুক্ত এটা শর্ট হয়ে গেলে LOT-র পিন ভোল্টেজ অনেক কমে যাবে বা শূন্য হয়ে যাবে। ওপেন হয়ে গেলে ভার্টিকাল লাইন হয়ে যাবে।

(6) লিনিয়ারিটি কয়েল AT-4042/02 (L-802) যেটা হরাইজেন্টাল ইয়োকের সাথে যুক্ত এটা শর্ট হলে ছবির উজ্জ্বলতা (Brightness) কমে যাবে এবং দু'ধার থেকে ছবি ছোট হয়ে যাবে। ভার্টিকাল লাইনও হতে পারে।

(7) ডায়োড DR 300 অথবা IN 4007 (D-806) যেটা LOT-র 5নং টাগ এবং ক্যাপাসিটর 2000Mfd/ 50V (C-807)-এর সাথে যুক্ত সেটা ওপেন হয়ে গেলে সেট মৃত হয়ে যাবে। (যেহেতু কোনো Aux. Power supply হবে না) আর শর্ট হয়ে গেলে LOT-র টাগ ভোল্টেজ কমে যাবে ও সেট মৃত হয়ে যাবে।

(8) LOT-র 8 ও 9নং ট্যাগ থেকে (Testing Point TP-809 ও TP-810) কোন ভোল্টেজ না বেরোলে, আই সি CA920, CA3068 ও ট্রানজিস্টর BC 147 (Q- 503) তে ভোল্টেজ যাবে না।

(9) ডায়োড TV 20 (D-809)র একপ্রান্ত LOT-র 13নং টাগ ও ক্যাথোডটা পিকচার টিউবের ফাইনাল অ্যানোডের সাথে যুক্ত। এই ডায়োডটা ওপেন হয়ে গেলে কোনো আলো আসবে না। শর্ট হলে ব্লুমিং (Blooming) হবে।

(10) হরাইজেন্টাল ড্রাইভার ট্র্যানজিষ্টর BD-115 (Q-802) যদি শর্ট বা ওপেন হয়ে যায় তাহলে সেট সম্পূর্ণ মৃত হয়ে যাবে।

সহায়ক পাওয়ার সাপ্লাই (Auxiliary Power Supply)

হরাইজেন্টাল স্ক্যানিং-এর সময় ট্রান্সফরমার TR 802-এর 5,3 ও 6নং টাগে একটা ভোল্টেজ আবেশিত হয়। LOT'র 5নং টাগ থেকে 50V AC কে ডায়োড DR 300 বা IN 400ˀ (D-806) দিয়ে রেকটিফাই করে ফিল্টার ক্যাপাসিটর 2000 Mfd/50V (C-807) এর মাধ্যমে +40V DC পাওয়া যায়। এই +40V থেকেই B সাপ্লাই (40V), C সাপ্লাই (16V) ও D সাপ্লাই (12V) তৈরী করা হয়।

B সাপ্লাইকে সরাসরি নিয়ে গিয়ে রেজিস্টর 120Ω/5W (R-710) এর মাধ্যমে ভার্টিকাল সেকশনে দেওয়া হয়।

রেজিস্টর 120Ω (R-806), 16V জেনার ডায়োড (D-801), ভারসাওয়াট (Versawatt) ট্রানজিস্টর 2N5296 (Q-801), ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর 100Mfd/25V (C-806) ও রেজিস্টর 100Ω (R-804) দিয়ে তৈরী করা হয়েছে রেগুলেটর সার্কিট। এই সার্কিটের মাধ্যমে 40Vকে 16V C সাপ্লাই-এ পরিবর্তিত করে সাউণ্ড আউটপুট অংশে আই সি CA 810 এর 1নং পিনে দেওয়া হয়েছে।

আবার রেজিস্টর 200Ω/5W (R-807), 12V জেনার ডায়োড (D-804) ও ক্যাপাসিটর 100Mfd/25V (C-802) দিয়ে তৈরী করা হয়েছে আরেকটা রেগুলেটর সার্কিট। যার সাহায্যে ঐ 40V-কে কমিয়ে 12V D সাপ্লাই তৈরী করে আইসি CA 3068-এর 15নং পিনে, সাউণ্ড আই এফ অংশের আই সি TBA 120S-এর 11নং পিনে, টিউনারে, তিনটে ট্রানজিস্টর BC 148A (Q-401), BC 147B (Q-503) এবং BF 195C (Q-501) এর কালেকটরে দেওয়া হয়েছে।

এই অংশের বিভিন্ন ফল্ট

(1) যদি C সাপ্লাই (16V) না পাওয়া যায় তাহলে দেখতে হবে ট্রানজিস্টর 2N5296 (Q-801) এবং 16V জেনার ডায়োডের (D-801) কোনো একটা অথবা দু'টোই ওপেন বা শর্ট হয়ে গেছে কী না।

(2) যদি D সাপ্লাই (12V) না পাওয়া যায় তাহলে 12V জেনার ডায়োড (D-804) ও ক্যাপাসিটর 100Mfd/ 25V (C-802) শর্ট আছে কী না দেখতে হবে।

ভিডিও আউটপুট অংশ

এই অংশের ওপর নির্ভর করে রিসিভার সেটের স্ক্রীনে ছবি কেমন হবে। প্রয়োজনীয় এই অংশের তিনটে প্রধান কাজ হলো,

(1) কম্পোজিট ভিডিও সিগন্যাল থেকে সাউণ্ড ফ্রিকোয়েন্সিগুলোকে তাড়িয়ে, সঠিক মাত্রায় সম্প্রসারিত করে ন্যূনতম 60V পিক-টু-পিক সিগন্যাল পিকচার টিউবে পাঠানো।

(2) হরাইজেন্টাল ও ভার্টিকাল রিট্রেস-সময়ে ব্ল্যাঙ্কিং পালস্ পাঠানো।

(3) LOT'র 3নং ট্যাগ থেকে পাওয়া 1·1KV বুস্ট ভোল্টেজ'কে পোটেনশিয়াল ডিভাইডার নেটওয়ার্ক-এর মাধ্যমে পিকচার টিউবের 3 ও 4 নং পিনে পাঠানো।

এই অংশে ব্যবহৃত হয় তিনটে ট্রানজিস্টর—ভিডিও ড্রাইভার ট্রানজিস্টর BF 195C (Q-501) ; ভিডিও আউটপুট ট্রানজিস্টর BD 115 (Q-502) এবং ব্ল্যাঙ্কিং ট্রানজিস্টর BC 147B (Q-503)।

ভিডিও আউটপুট

আই সি CA 3068-এর 19নং পিন থেকে পাওয়া কম্পোজিট ভিডিও সিগন্যালকে এন-পি-এন ট্রানজিস্টর BF 195C (Q-501)-র বেস-এ দেওয়া হয় এবং এমিটার ফলোয়ার গঠনতন্ত্র (configuration) অনুযায়ী, এমিটারে পাওয়া যায় সম্প্রসারিত আউটপুট। এরপর এই আউটপুটকে ট্রানজিস্টর BD 115-এর বেস-এ কনট্রাস্ট কন্ট্রোল 1K (R-503)-এর মাধ্যমে দেওয়া হয়। এই ভিডিও অ্যাম্প্লিফায়ার ট্রানজিস্টরের আউটপুট, পিকচার টিউবের সাথে যুক্ত থাকে তাই ছবির 'কনট্রাস্ট' সম্পূর্ণ নির্ভর করে কতটা ভিডিও সিগন্যালকে ভিডিও অ্যাম্প্লিফায়ারে সম্প্রসারিত করতে দেওয়া হচ্ছে—তার ওপর। 'কনট্রাস্ট কন্ট্রোল'-এর মাধ্যমে সেই ভিডিও সিগন্যালকেই নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

যদিও BD 115 ট্রানজিস্টরের বিস্তৃত ব্যাণ্ডউইথ্ সহ উচ্চ গেইন থাকে তবুও সম্পূর্ণ ভিডিও ব্যাণ্ডকে সম্প্রসারিত করার জন্য তার কিছু অসুবিধা হয়, বিশেষ করে উচ্চ ভিডিও ব্যাণ্ডগুলোর ক্ষেত্রে 'গেইন' অনেক কমে যায়।

ট্রানজিস্টর BD 115-এর কালেকটরে 90V ভিডিও সিগন্যাল পাওয়া যায়, যা পাঠিয়ে দেওয়া হয় পিকচার টিউবের ক্যাথোডে।

ভিডিও আউটপুট অ্যাম্প্লিফায়ার আর পিকচার টিউবের মাঝখানে, ডায়োড OA 79 (D-501), ক্যাপাসিটর 220nfd/160V (C-504) এবং তিনটে রেজিস্টর 100K (R-510) ; 1K (R-513) ; 470K (R-514) দিয়ে তৈরী করা হয় বীম কারেণ্ট লিমিটিং নেটওয়ার্ক। বীম কারেণ্টের নিয়ন্ত্রণের ফলে লাইন আউটপুট ট্রানজিস্টর BU 205 (Q-803) রক্ষা পায়।

কম্পোজিট ভিডিও সিগন্যালের সাথে কিছু সাউণ্ড সিগন্যালও মিশে থাকে। এই সিগন্যালকে তাড়াবার জন্য রেজিস্টর 470Ω (R-501) দিয়ে 5·5 MHz ট্র্যাপ তৈরী করা হয়। এটা না থাকলে অথবা কেটে গেলে স্ক্রীনে সাউণ্ড বার আসবে।

রিট্রেস-সময়ে ব্ল্যাংকিং

ভিডিও আউটপুট ট্রানজিস্টর BD 115 (Q-502) হরাইজেন্টাল ও ভার্টিকাল রিট্রেসের সময় ট্রানজিস্টর BC 147 B-র দ্বারা অফ্ থাকে।

তড়িৎ দেওয়া হচ্ছে—তার ওপর। 15 নং পিনের তড়িৎপ্রবাহ নিয়ন্ত্রন করে একটা পরিবর্তনশীল রেজিস্টর 10K(R-420) –যাকে বলা হয় 'হরাইজেন্টাল হোল্ড' (Horizontal hold)।

আই সি'র 4 নং পিনে পাওয়া যায় হরাইজেন্টাল অসিলেটর সিগন্যাল, যা'কে আবার পাঠিয়ে দেওয়া হয় আই সি'র 3 নং পিনে। সেখানে আই সি'র মধ্যেই থাকে পালস্ শেপিং স্টেজ (Pulse shaping stage), যা একসাথে নিয়ন্ত্রিত ফেজ শিফটার হিসেবেও কাজ করে। এই পালস্-এর আকৃতি নির্ভর করে 3 নং পিনের ভোল্টেজের ওপর। এইবার আই সি'র মধ্যেই সিঙ্ক পালস্ সম্প্রসারিত হয়ে আই সি'র 2নং পিনে আউটপুট হিসেবে পাওয়া যায়, যা রেজিস্টর 560Ω(R-414)এর মাধ্যমে পাঠিয়ে দেওয়া হয় 'হরাইজেন্টাল আউটপুট' অংশে।

এছাড়াও LOT থেকে পাওয়া হরাইজেন্টাল ফ্লাই-ব্যাক পালস্‌কে আই সি'র 5 নং পিনে দেওয়া হয়। যদি 7নং পিনে পাওয়া সিঙ্ক পালস্, 5নং পিনের ফ্লাই-ব্যাক পালস্-এর সাথে মিশে যায় তাই আই সি'র মধ্যেই থাকে একটা কোইনসিডেন্স ডিটেকটর (Coincidence detector) যার কাজ দরকার মতো ভোল্টেজকে নিয়ন্ত্রণ করা।

এই আই সি'র পিন সংখ্যা 16 এবং প্রতিটা পিনই কার্যকরী।

এই অংশের বিভিন্ন ফল্ট

(1) রেজিস্টর 4.7K(R-417)এবং 10Ω(R-416) এর মাঝখানে ক্যাপাসিটর 10nf/30V (C-414)এর সমান্তরালে থাকে 12V জেনার ডায়োড (D-401), যার সাহায্যে আই সি'র 1 নং পিনে দেওয়া হয় A সাপ্লাই থেকে কমিয়ে আনা +12V সাপ্লাই। এই জেনার ডায়োড ওপেন হয়ে গেলে সেট সম্পূর্ণ মৃত হয়ে যাবে।

(2) রেজিষ্টর 560Ω(R-414), যেটা আই সি'র 2 নং পিন এর সাথে যুক্ত, সেটা কেটে গেলে স্ক্রীনে কোনো রাস্টার থাকবে না অর্থাৎ সেট মৃত হয়ে যাবে। ট্রানজিস্টর BU205(Q-803)এর ড্রাইভ ভোল্টেজ, যা এই ট্রানজিস্টরের বেস-এ পাওয়া যায়, সেটা শূন্য হয়ে যাবে কিন্তু কালেকটর ভোল্টেজ ঠিক থাকবে, এর ফলেই সেট ডেড বা মৃত হয়ে যাবে।

(3) আই সি'র পিন 3 ও 4 এর সাথে যুক্ত ক্যাপাসিটর 2.2Kpf বা 0.022Mf (C-413) যদি ওপেন হয়ে যায় তাহলে ছবি প্যারাসাইট হয়ে যাবে।

(4) আই সি'র 3 ও 4নং পিন থেকে বেরিয়ে 1 নং পিনের সাথে যুক্ত রেজিষ্টর 2.2M (R-412)টা যদি ওপেন হয়ে যায় তাহলে ছবি ডানদিকে কিছুটা সরে যাবে।

(5) আই সি'র 5নং পিন এবং LOTর 8নং ট্যাগের মাঝখানে থাকে রেজিষ্টর 47K(R-812), এটা ওপেন হয়ে গেলে ছবি $\frac{3}{4}$ অংশ বাঁদিকে সরে যাবে এবং হরাইজেন্টাল হোল্ড কন্ট্রোলকে ঘোরালেও বিশেষ পরিবর্তন হবে না।

(6) আই সি'র 6 নং পিনের সাথে যুক্ত রেজিষ্টর 4.7K(R-409) যদি ওপেন হয়ে যায় তাহলে ছবি বাঁদিকে সরে যাবে।

(7) ক্যাপাসিটর 220pf(R-409), যেটা আই সি'র 6 ও 7 নং পিনের সাথে রেজিস্টর 4·7K(R-408)এর মাধ্যমে যুক্ত, সেটা যদি ওপেন হয়ে যায় তাহলে ছবিটা ডানদিক থেকে বাঁদিকে ক্রমাগত সরে যেতে থাকবে। হরাইজেন্টাল হোল্ড কনট্রোলের মাধ্যমেও এই সরে যাওয়া থামানো যাবে না। একে বলে হরাইজেন্টাল রোলিং (Horizontal Rolling)।

(8) ক্যাপাসিটর 10Kpf(C-407), যেটা রেজিস্টর 2.7K(R-406)এর মাধ্যমে আই সি'র 7নং পিনের সাথে যুক্ত, সেটা যদি শর্ট হয়ে যায়, তাহলে আই সি'র সমস্ত পিন ভোল্টেজ নেমে যাবে। যার ফলে সেট মৃত হয়ে যেতেও পারে। যদি ঐ ক্যাপাসিটরটা ওপেন হয়ে যায় তাহলে ওপর থেকে নিচে ভার্টিকাল রোলিং (Vertical Rolling) হবে।

(9) ক্যাপাসিটর 1 nf/30V(C-405), যেটা আই সি'র 8 নং পিনের সাথে যুক্ত, সেটা শর্ট হয়ে গেলে ছবির ওপর সাদা, চওড়া হরাইজেন্টাল বার (Bar) দেখা যাবে। এই বারকে বলে সাউণ্ড বার (Sound bar)।

(10) রেজিষ্টর 1·5M (R-410), যেটা রেজিস্টর 4.7K(R-417) ও 10K(R-404)এর মাধ্যমে আই সি'র 8 নং পিনের সাথে যুক্ত, সেটা ওপেন হয়ে গেলে সিঙ্ক এর অসুবিধা হবে অর্থাৎ ছবিকে একটা দিকে যেন টেনে ধরা হবে।

(11) ক্যাপাসিটর 100Kpf(C-404), রেজিস্টর 10K(R-404) ও সমান্তরালে থাকা ক্যাপাসিটর 1 nf/30V (C-405) দিয়ে আই সি'র 8 নং পিনের সাথে যুক্ত। এটা শর্ট বা ওপেন হয়ে গেলে সিঙ্ক এর অসুবিধা হবে।

(12) আই সি'র 8 নং পিনের সাথে যুক্ত ফেজ রিভার্সাল ট্রানজিস্টর BC 148A(Q-401) শর্ট বা ওপেন হয়ে গেলে সিঙ্ক-এর অসুবিধা হবে এবং হরাইজেন্টাল ও ভার্টিকাল রোলিং হবে।

(13) রেজিষ্টর 120K(R-401), যেটা বাফার ট্রানজিস্টর BC 148A (Q-401)এর বেস-এর সাথে যুক্ত আছে এই রেজিস্টরের মান যদি বেড়ে যায় তাহলে কালো কোনাকুনি লাইন ছবির ওপর ভার্টিকালি রোল করবে।

(14) আইসি'র 11-নং পিনের সাথে যুক্ত থাকে রেজিষ্টর 680 Ω (R-407)। এই রেজিস্টরটা ওপেন হয়ে গেলে ছবি খুব রিগলিং (Wrigging) [ছবি মোচড়ানো] হবে এবং ছবির ওপরের অংশ কাঁপবে।

(15) ক্যাপাসিটর 10 Mfd/16V (C-408), যেটা আই সি'র 11 ও 12 নং পিনের সাথে যুক্ত, এটা যদি শর্ট হয়ে যায় তাহলে ছবি বাঁ দিক বা ডান দিকে সরে যাবে এবং রিগলিং হবে।

(16) আই সি'র 12 নং পিনের সঙ্গে যুক্ত থাকে ক্যাপাসিটর 33 kpf (C-410)। এই ক্যাপাসিটরটা শর্ট হয়ে গেলে আই সি'র কোন পিন ভোল্টেজই মিলবে না। হরাইজেন্টাল রোলিংও হতে পারে। এমনকি সেটা মৃতও হয়ে যেতে পারে।

(17) রেজিষ্টর 33 K (R-411), সেটা আই সি'র 12 ও 15 নং পিনের মাঝখানে থাকে সেটা ওপেন হয়ে গেলে হরাইজেন্টাল হোল্ড কন্ট্রোল কাজ করবে না, স্ক্রীনে সাদা-কালো হরাইজেন্টাল বার বা কোনাকুনি লাইন আসতে পারে।

(18) ক্যাপাসিটর 10 Kpf (C-411) যেটা আই সি'র 13 নং পিনের সঙ্গে যুক্ত, সেটা শর্ট হয়ে গেলে ছবি কুঁজো (Bend) হয়ে যাবে।

(19) রেজিষ্টর 2·7 K (R-413) যেটা আই সি'র 15 নং পিন থেকে নেগেটিভের মাঝখানে লাগানো, সেটা ওপেন হয়ে গেলে সেট মৃত হয়ে যাবে।

(20) রেজিষ্টর 15 K (R-415) আই সি'র 15 নং পিন-এর সাথে যুক্ত হয়ে হরাইজেন্টাল হোল্ড কন্ট্রোলে গেছে। এই রেজিস্টরটা ওপেন হয়ে গেলে, হরাইজেন্টাল কন্ট্রোল কাজ করবে না। তার ফলে ছবি হরাইজেন্টালি রোল করবে অথবা কোনাকুনি জেব্রা লাইন আসবে।

ভার্টিকাল সেকশন

এই ভার্টিকাল সেকশনে আই সি হিসেবে ব্যবহার করা হয় মোনোলিথিক লিনিয়ার ইনটিগ্রেটেড সার্কিট TDA 1044। এই আই সি'র মধ্যেই থাকে এই সেকশনের সমস্ত কার্যকরী কম্পোনেন্টগুলো। এই আই সি'র মধ্যেই তৈরী হয় স-ট্‌থ ফ্রিকোয়েন্সি ডিসটরশন সার্কিট, ড্রাইভার ও আউটপুট অ্যাম্‌প্লিফায়ার সার্কিট এবং একটা ফ্লাই ব্যাক সার্কিট।

TDA 1044 কে কার্যকরী করার জন্য +40 V(B সাপ্লাই), আই-সি'র পিন নং 1, 5, 7 এবং 12 তে দেওয়া হয়। 8 নং পিনে ভার্টিকাল সিঙ্ক পালস্‌ দেওয়া হয়। ভার্টিকাল ডিফ্লেকশন কয়েলকে চালাবার জন্য ভার্টিকাল স্ক্যানিং কারেন্ট পাওয়া যায় আই সি'র 4 নং পিনে। 50 সাইকলস / সেকেণ্ড ভার্টিকাল ব্ল্যাঙ্কিং পালস পাওয়া যায় 6 নং পিনে। এই পালস্‌, রেজিস্টর 18 K দিয়ে ভার্টিকাল রিট্রেস সার্কিটে দেওয়া হয়। 11 নং পিনের সাথে যুক্ত থাকে 100 K পোটেনশিয়োমিটার (Potentiometer)। এটাকে বলে ভার্টিকাল হোল্ড কন্ট্রোল। 1 নং পিনের সঙ্গে যুক্ত থাকে ভার্টিকাল লিনিয়ারিটি (Linearity) কন্ট্রোল যার কাজ ফ্রেমের রৈখিকতা নিয়ন্ত্রণ করা। 12 নং পিনের সাথে যুক্ত থাকে হাইট কন্ট্রোল যার কাজ ছবির উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ করা।

এই আই সি'র মোট পিন সংখ্যা 12 এবং এর সমস্ত পিনই কার্যকরী।

এই অংশের বিভিন্ন ফল্ট

(1) **ভার্টিকাল হাইট প্রি সেট** 47 K (R-715) যেটা রেজিস্টর 27 K (R-214) দিয়ে আই সি'র 1 নং পিনের সঙ্গে যুক্ত সেটাকে পরিবর্তিত করলে ছবির উচ্চতা কমবে-বাড়বে। এই প্রিসেটটা ওপেন হয়ে গেলে স্ক্রীনে হরাইজেন্টাল লাইন আসবে অথবা ছবি ভার্টিকালি লাফাবে।

(2) **রেজিষ্টর** 18 K (R-704) যেটা আই সি'র 2 নং পিন থেকে চেসিসে (নেগেটিভ) লাগানো আছে সেই রেজিস্টরটার মান বেড়ে গেলে ছবি ওপর ও নিচ থেকে ছোট হয়ে যাবে এবং স্ক্রীনের ওপর দিকে সরু সুতোর মতো হরাইজেন্টাল লাইন আসবে।

(3) আই সি'র 2 নং পিন এবং ভার্টিকাল ইয়োক কয়েল (DY-701) এর সাথে যুক্ত থাকে **ক্যাপাসিটর** 25 Mfd / 25V (C-705)। এই ক্যাপাসিটরটা শর্ট হয়ে গেলে ছবি নিচের থেকে ভাঁজ হয়ে ছোট হয়ে যাবে, (Bottom fold over) এবং নিচের দিকে একটা সাদা বার (Bar) আসবে।

(4) আই সি'র 3 ও 4 নং পিনের সাথে যুক্ত থাকে **রেজিষ্টর** 220k Ω (R-705)। এই রেজিস্টরটা ওপেন হয়ে গেলে ছবি, ওপর-নিচ থেকে ছোট হয়ে একটা মোটা ফিতের মধ্যে চলে আসবে অথবা অর্ধেক স্ক্রীন জুড়ে হরাইজেন্টাল সরু লাইন আসবে।

(5) আই সি'র 3 নং পিন থেকে চেসিস (নেগেটিভ) করা থাকে ক্যাপাসিটর 470 pf (C-704)। এই ক্যাপাসিটরটা শর্ট হয়ে গেলে হরাইজেন্টাল লাইন আসবে।

(6) আই সি'র 4নং পিন এবং ভার্টিকাল ইয়োক কয়েল (DY-701) এর সাথে যুক্ত **ক্যাপাসিটর** 1000 Mfd বা 470 Mfd (C-706) যদি শর্ট হয়ে যায় তাহলে ছবি ওপর-নিচে ছোট হয়ে যাবে অথবা ছবির ওপরে একটা সাদা হরাইজেন্টাল বার দেখা যাবে আর ওপেন হয়ে গেলে হরাইজেন্টাল বার আসবে।

(7) আই সি'র 5 ও 6 নং পিনের সাথে যুক্ত থাকে **ক্যাপাসিটর** 100 Mfd (C-708)। এই

ক্যাপাসিটরটা শর্ট হয়ে গেলে স্ক্রীনে হরাইজেন্টাল লাইন আসবে আর ওপেন হয়ে গেলে ছবি নিচের দিকে ছোট হয়ে আসবে।

(৪) আই সি'র 5 ও 7 নং পিনের সাথে যুক্ত থাকে ডায়োড IN 4007(D-702)। TDA 1044 ব্যবহৃত ভার্টিকাল সেকশনে এই ডায়োডের ভূমিকা খুবই মুখ্য। এই ডায়োডটা যদি ওপেন হয়ে যায় তাহলে আই সি'র 5নং পিনে কোনো সাপ্লাই ভোল্টেজ যাবে না। এর ফলে স্ক্রীনে হরাইজেন্টাল লাইন আসবে। যদি শর্ট হয়ে যায় তাহলে আই সি'টা কেটে যাবে। তাই এই আই সি'টা যদি কখনো কেটে যায় তাহলে আই সি'টা বদলে দেওয়ার আগে অবশ্যই এই ডায়োডটা পরীক্ষা করে নিতে হবে।

(9) ক্যাপাসিটর 100Mfd বা 1000 Mfd (C-709), যেটা আই সি'র 7 নং পিনের সাথে যুক্ত, সেটা শর্ট হয়ে গেলে স্ক্রীনে হরাইজেন্টাল লাইন হয়ে যাবে আর ওপেন হয়ে গেলে ওপর-নিচে ছোট হয়ে যাবে।

(10) ক্যাপাসিটর 2.2 Kpf(C-702), যেটা আই সি'র 8 নং পিন থেকে চেসিস (নেগেটিভ) করা আছে, সেই ক্যাপাসিটরটা ওপেন হয়ে গেলে ভার্টিকাল রোলিং হবে, শর্ট হয়ে গেলে 8 নং পিনে সঠিক ভোল্টেজ পাওয়া যাবে না এবং স্ক্রীনে হরাইজেন্টাল লাইনও হয়ে যেতে পারে।

(11) ক্যাপাসিটর 0·15Mfd (C-703), যেটা আই সি'র 10 নং পিন থেকে চেসিসে গেছে, সেটা শর্ট বা ওপেন হয়ে গেলে হরাইজেন্টাল লাইন হয়ে যাবে।

(12) 22K ভার্টিকাল হোল্ড কন্ট্রোল প্রি-সেট (R-703) এবং আই সি'র 11 নং পিনের সাথে যুক্ত রেজিষ্টর 120K(R-702)টা যদি ওপেন হয়ে যায় তাহলে হরাইজেন্টাল লাইন হবে এবং রেজিষ্টর এর মান যদি বেড়ে যায় তাহলে ভার্টিকাল হোল্ড হবে।

(13) আই সি'র 7 নং থেকে রেজিষ্টর 680Ω (R-712) হয়ে আই সি'র 12 নং পিনের মাঝখানে থাকে ভার্টিকাল লিনিয়ারিটি কন্ট্রোল প্রি-সেট 1K(R-711)। এই প্রি-সেটটা ওপেন হয়ে গেলে স্ক্রীনে হরাইজেন্টাল লাইন হবে এবং শর্ট হয়ে গেলে ছবি ভার্টিকালি লাফাবে।

হরাইজেন্টাল আউটপুট সেকশন

এই অংশকে লাইন আউটপুট সেকশন বা হাই ভোল্টেজ পাওয়ার সাপ্লাই সেকশনও বলা হয়। এখান থেকেই সহায়ক (Auxiliary) পাওয়ার সাপ্লাই তৈরী হয়ে বিভিন্ন সেকশনে ছড়িয়ে পড়ে।

এই সেকশনের প্রধান কাজ হলো,

(1) 18KV উচ্চ ভোল্টেজ তৈরী করে পিকচার টিউবের ফাইনাল অ্যানোডে পাঠানো।

(2) পিকচার টিউবের ফোকাসিং গ্রিড এ 1100V 'বুষ্ট ভোল্টেজ' তৈরী করে পাঠানো।

(3) হরাইজেন্টাল ডিফ্লেকশন কয়েল-এ 'স-টুথ' সিগন্যাল পাঠানো, যার সাহায্যে ইলেকট্রন বীমে হরাইজেন্টাল ডিফ্লেকশন হবে।

(4) হরাইজেন্টাল অসিলেটর, ফেজ এবং ইনকামিং সিঙ্ক পালসগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য (Synchronise) আনার জন্য ফ্লাই-ব্যাক পালস্ তৈরী করা।

(5) এ জি সি জেনারেটরকে চালু করার জন্য ফ্লাই-ব্যাক পালস্ দেওয়া।

(6) হরাইজেন্টাল রিট্রেস সময়ে ব্ল্যাঙ্কিং পালস্ তৈরী করা।

হরাইজেণ্টাল ব্ল্যাঙ্কিং পালস্ (60V) ও ভার্টিকাল ব্ল্যাঙ্কিং পালস্‌কে ট্র্যানজিস্টর BC 147B-র বেস-এ দেওয়া হয় তার ফলে রেজিস্টর 220Ω (R-508)-এ ভোল্টেজের বৃদ্ধি ঘটে। এই বৃদ্ধি ট্র্যানজিস্টর BD 115-এর এমিটার বায়াসেও ছড়িয়ে পড়ে। এটাই ট্র্যানজিস্টর BD 115-কে অফ্ করে দেয় যার ফলে স্ক্রীনে ব্ল্যাঙ্কিং হয়।

CRT বায়াসিং

বুস্ট ভোল্টেজকে ডায়োড IN 4007 (D-502) ও ক্যাপাসিটর ·022Mf (C-505) দিয়ে যথাক্রমে রেকটিফাই ও ফিল্টার করে হাই ভোল্টেজ DC পাওয়া যায়। এই ভোল্টেজকে রেজিস্টর 1M (R-516), রেজিস্টর 1M (R-517) এবং ক্যাপাসিটর ·1Mf(C-508) দিয়ে কমিয়ে ফেলা হয়।

পিকচার টিউবের কণ্ট্রোল গ্রিডে 150V থেকে 200V সাপ্লাই থাকে।

এই অংশের বিভিন্ন ফল্ট

(1) ট্র্যানজিস্টর BF 195C (Q-501) শর্ট বা ওপেন হয়ে গেলে কোন ছবি পাওয়া যাবে না অথবা শুধু রাষ্টারের ওপর স্নো থাকবে।

(2) কনট্রাষ্ট কণ্ট্রোল 1K-র তিনটে লেগ। প্রথম লেগটা রেজিস্টর 68Ω (R-502) দিয়ে BF 195C (Q-501)-এর এমিটারের সাথে যুক্ত, দ্বিতীয় লেগটা একটা তার দিয়ে ট্র্যানজিস্টর BD 115 (Q-502)-এর বেসের সাথে যুক্ত ও তৃতীয় লেগটা রেজিস্টর 220Ω (R- 505) দিয়ে BF 195C কালেকটর-এর সাথে যুক্ত। এই কণ্ট্রোলটা শর্ট হয়ে গেলে রাষ্টারের ওপর রিট্রেস লাইন দেখা যাবে।

(3) ট্র্যানজিস্টর BD 115 (Q-502) শর্ট হয়ে গেলে ছবি থাকবে না, শুধু রাষ্টারের ওপর রিট্রেস লাইন দেখা যাবে।

(4) ক্যাপাসিটর 220 nfd (C-504), সমান্তরালে থাকা ডায়োড OA 79 (D-501), রেজিস্টর 100K (R-510)—এগুলো পিকচার টিউবের 7নংপিন ও ট্র্যানজিস্টর BD 115-এর কালেকটরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তৈরী করেছে DC রেস্টোরার সার্কিট। এই সার্কিটের এক বা একাধিক পার্টস কাজ না করলে কোনো ছবি পাওয়া যাবে না।

(5) ট্র্যানজিস্টর BC 147B (Q-503) শর্ট হয়ে গেলে রাষ্টারের ওপর ট্রেস ও রিট্রেস লাইন দেখা যাবে।

(6) রেজিস্টর 1·5K (R-521) যেটা ব্রাইটনেস্ কণ্ট্রোল-এর মাঝের পিনের সঙ্গে যুক্ত এই রেজিস্টরটা ওপেন হয়ে গেলে স্ক্রীনে কোনো আলো থাকবে না।

(7) রেজিস্টর 470K (R-523) যেটা ব্রাইটনেস কণ্ট্রোল-এর এক প্রান্ত ও A সাপ্লাই (200V)-এর সাথে যুক্ত এটা ওপেন হয়ে গেলে ব্রাইটনেস কণ্ট্রোল কাজ করবে না। ফলে ছবি খুব বেশী কালো বা সাদা হয়ে যাবে।

(8) LOT-র 3নং ট্যাগ থেকে রেজিস্টর 27K (R-515), ডায়োড IN 4007 (D-502) ও রেজিস্টর 1M (R-516) হয়ে যে পথটা পিকচার টিউবের 3নং পিনে গেছে এই পথে কোনো এক বা একাধিক পার্টস ওপেন হয়ে গেলে পিকচার টিউবের আলো থাকবে না বা আলো কমে যাবে।

৮

আপট্রন উর্বশী ২০২

এইবার আমরা আলোচনা করবো আপট্রন উর্বশী 202 সার্কিট নিয়ে। এই সার্কিটে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো ব্যাপার হলো এস সি আর পাওয়ার সাপ্লাই। 'পাওয়ার সাপ্লাই' অংশে এ সম্পর্কে বিশদভাবে লেখা হয়েছে। আরো একটা বিশেষ লক্ষণীয় হলো ট্রানজিস্টরের ব্যবহার। ভিডিও আই এফ এবং সাউণ্ড আই এফ সেকশনেই শুধু আই সি CA 3068 এবং আই সি TBA 120S ছাড়া এই সার্কিটের বাকী সমস্ত কাজই করানো হয়েছে ট্রানজিস্টর দিয়ে।

ভিডিও আই এফ সাব-সিষ্টেম

আপট্রন উর্বশী 202 এর ভিডিও সাব সিষ্টেমেও ব্যবহার করা হয় আই সি CA 3068, ভিডিও আই এফ সাব-সিষ্টেম তাই সম্পূর্ণ বেলটেক অনুসারী হয়। যেহেতু 'বেলটেক' এর আলোচনার সময় এই আই সি এবং তার অনুষঙ্গ নিয়ে গঠিত সাব-সিষ্টেম নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে তাই এখানে আর তা বিশেষভাবে আলোচিত হলো না। শুধু কিছু সাধারণ ফল্ট নিয়েই আলোচনা করা হলো।

ভিডিও আই এফ সাব-সিষ্টেম এর কিছু সাধারণ ফল্ট

(1) আই সি CA 3068 ও টিউনারের আই এফ অংশের সাথে যুক্ত রেজিষ্টর 10 Ω যদি ওপেন হয়ে যায় তা'হলে কোন ছবি ও শব্দ থাকবে না।

(2) আই সি'র 6 নং পিনের সাথে যুক্ত ক্যাপাসিটর 27 Kpf যদি ওপেন হয়ে যায় তা'হলে কোনো ছবি ও শব্দ থাকবে না।

(3) আই সি'র 3 নং পিনের সাথে যুক্ত ডায়োড IN 4148 যদি ওপেন বা শর্ট হয়ে যায় তা'হলে ছবির কোনো স্থায়িত্ব (Stability) থাকবে না।

(4) আই সি'র 15 ও 8 নং পিনের সাথে যুক্ত থাকে এজিসি কন্ট্রোল প্রিসেট 22K. এই প্রি-সেটটা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত না থাকলেও কোনো ছবি ও শব্দ পাওয়া যাবে না।

(5) আই সি'র 4 ও 15 নং পিনের সাথে যুক্ত থাকে ক্যাপাসিটর 10 Mf/16V. এই ক্যাপাসিটরটা যদি শর্ট হয়ে যায় ত'াহলে কোনো ছবি ও শব্দ থাকবে না।

(6) আই সি'র 7 নং পিনের সাথে যুক্ত ক্যাপাসিটর 0'01 Mfd যদি শর্ট হয়ে যায় তা'হলে কোন ছবি ও শব্দ থাকবে না।

(7) আই সি'র 7 নং পিনের সাথে যুক্ত থাকে ক্যাপাসিটর 10 Mfd/16V. এই ক্যাপাসিটরটা ওপেন বা শর্ট হয়ে গেলে কোনো ছবি ও শব্দ থাকবে না অথবা এজিসি কন্ট্রোল ঠিকমতো কাজ করবে না।

(8) ট্র্যানজিষ্টর BC 147B যদি ওপেন বা শর্ট হয়ে যায় তাহলে কোনো ছবি ও শব্দ থাকবে না।

(9) আই সি'র 19 নং পিন থেকে বেরোয় কম্পোজিট ভিডিও সিগন্যাল। এই সিগন্যালের জন্য 19 নং পিনে পাওয়া যায় 3V. যদি এই ভোল্টেজ না পাওয়া যায় তাহলে স্ক্রীনে কোনো ছবি ও শব্দ থাকবে না।

(10) টিউনারের এজিসি পয়েন্টে যদি 1 থেকে 2·5V এর কম বা বেশী ভোল্টেজ পাওয়া যায় তাহলে এজিসি ট্রানজিষ্টর BC 147B কে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এই এজিসি ভোল্টেজ কম বা বেশী হয়ে গেলে স্ক্রীনে কোনো ছবি বা শব্দ থাকবে না।

সাউণ্ড আই এফ ও অডিও আউটপুট সেকশন

সাউণ্ড আই এফ অংশে আই সি হিসেবে TBA 120S ও অডিও অ্যাম্‌প্লিফায়ার অংশে তিনটে ট্রানজিষ্টর BC 158 B; AC 187 এবং AC 188 ব্যবহার করা হয়েছে।

সাউণ্ড আই এফ সেকশন

ইন্টার ক্যারিয়ার সাউণ্ড আই এফ (5·5 MHz) সিগন্যালকে ক্যাপাসিটর 4·7Pf দিয়ে আই সি'র 14 নং পিনে দেওয়া হয়েছে। কয়েল ও ক্যাপাসিটর 220 Pf ইনপুট টিউনড্ সার্কিটের মতো কাজ করে। কয়েল ও ক্যাপাসিটর 1000Pf এফ এম ডিটেকটরের টিউনড্ সার্কিটের মতো কাজ করে। এই সার্কিট আই সি-র 7 ও 9 নং পিনের সাথে যুক্ত থাকে। অডিও আউটপুট সিগন্যাল আই সি-র 3 নং পিন থেকে বেরিয়ে অডিও অ্যাম্‌প্লিফায়ার সেকশনে যায়। আই সি TBA 120S কে কার্যকরী করার জন্য 11 নং পিনে 12 V সাপ্লাই দেওয়া হয়।

অডিও অ্যাম্‌প্লিফায়ার সেকশন

অডিও অ্যাম্‌প্লিফায়ার সেকশন-এ ব্যবহৃত ট্রানজিষ্টর BC 148B অডিও ড্রাইভার হিসেবে কাজ করে। আই সি TBA 120S এর 8 নং পিন থেকে অডিও ফ্রিকোয়েন্সি বেরিয়ে ভল্যুম কন্ট্রোল 5 K, ক্যাপাসিটর 10 Mf, রেজিষ্টর 1K দিয়ে ট্রানজিষ্টর BC 148 B-র বেসে যুক্ত হয়েছে। সম্প্রসারিত অডিও সিগন্যাল ট্রানজিষ্টর BC 148B-র কালেকটর থেকে বে'র হয়ে এরপর সরাসরি ট্রানজিষ্টর AC 188 এর বেস-এ এবং রেজিষ্টর 27Ω দিয়ে ট্রানজিষ্টর AC 187 এর বেস-এ পড়েছে।

ট্রানজিষ্টর AC 187 ও AC 188 এর এমিটার থেকে পরবর্তী ক্ষেত্রে পুশ-পুল অ্যাম্‌প্লিফায়ার সার্কিটে সম্প্রসারিত সিগন্যাল দু'টো রেজিষ্টর 1 Ω এর মাঝখান থেকে স্পিকারে গিয়ে পৌঁছেছে।

অডিও অ্যাম্‌প্লিফায়ার সেকশনকে স্থির (Stabilised) 18 V DC সাপ্লাই দিয়ে চালনা করা হয়। এই সাপ্লাই ভোল্টেজকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দু'টো ট্রানজিষ্টর 2N2219 ও BC 158B কে ব্যবহার করা হয়েছে। এই সার্কিট এর কাজ হলো LOT-র 10 নং ট্যাগ থেকে আগত 25V কে নিয়ন্ত্রণ করে ট্রানজিষ্টর AC 187 এর কালেকটরে পাঠানো।

সাউণ্ড আই এফ ও আউটপুট সেকশনের কিছু সাধারণ ফল্ট

(1) আই সি 120S-এর 13 ও 14 নং পিনের সাথে যুক্ত থাকে কয়েল L-201 এই কয়েলটা যদি ওপেন বা শর্ট হয়ে যায় তা'হলে কোনো ষ্টেশন-এর শব্দ পাওয়া যাবে না অথবা বিকৃত, ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দ পাওয়া যাবে।

(2) আই সি 120S-এর 14 ও 2 নং পিনের সাথে যুক্ত থাকে ক্যাপাসিটর 120 pf. এই ক্যাপাসিটরটা শর্ট বা ওপেন হয়ে গেলেও কোনো শব্দ পাওয়া যাবে না অথবা বিকৃত শব্দ পাওয়া যাবে।

(3) কয়েল L-201 এর সাথে যুক্ত থাকে ক্যাপাসিটর 0·022 Mfd এই ক্যাপাসিটরটা শর্ট বা ওপেন হয়ে গেলে কোনো শব্দ পাওয়া যাবে না অথবা বিকৃত শব্দ পাওয়া যাবে।

(4) আই সি'র 7 ও 9 নং পিনের সাথে, ক্যাপাসিটর 1000pf-এর সমান্তরালে যুক্ত থাকে কয়েল L-202 এই কয়েলটা ওপেন বা শর্ট হয়ে গেলে শব্দ অনেক কমে যাবে অথবা বিকৃত শব্দ পাওয়া যাবে।

(5) আই সি'র 3 ও 8 নং পিনের সাথে যুক্ত থাকে ক্যাপাসিটর 10Mfd, এই ক্যাপাসিটরটা ওপেন বা শর্ট হয়ে গেলে শব্দ বিকৃত অথবা চোকড্ (Chocked) হয়ে যাবে।

(6) আই সি'র 3 ও 11 নং পিনের সাথে যুক্ত থাকা রেজিষ্টর 3·9Kটা যদি ওপেন হয়ে যায় তাহলে শব্দ অনেক কমে যাবে।

(7) ট্র্যানজিষ্টর AC 187 যদি ওপেন অথবা শর্ট হয়ে যায় তা'হলে কোনো শব্দই পাওয়া যাবে না এবং/অথবা রেজিষ্টর 10Ωটা পুড়ে যাবে।

(8) ট্র্যানজিষ্টর AC 188 যদি ওপেন বা আংশিকভাবে শর্ট হয়ে যায় তা'হলেও কোনো শব্দ থাকবে না অথবা শব্দ ধীরে ধীরে কমে আসতে থাকবে।

(9) স্পিকারের একপ্রান্ত এবং ট্র্যানজিষ্টর AC 187 ও AC 188-এর কালেকটরের মধ্যবর্তী অংশে যুক্ত থাকে ক্যাপাসিটর 100Mfd, এই ক্যাপাসিটরটা যদি ওপেন বা শর্ট হয়ে যায় তাহলে কোনো শব্দ থাকবে না অথবা শব্দ চোকড্ হয়ে যাবে।

(10) অডিও ড্রাইভার ট্র্যানজিষ্টর BC-148B যদি ওপেন বা শর্ট হয়ে যায় তাহলে কোনো শব্দ থাকবে না।

সিঙ্ক সেপারেটর ও হরাইজেণ্টাল এ এফ সি

সিঙ্ক সেপারেটর সেকশনে ট্র্যানজিষ্টর BC 158Bকে সিঙ্ক ক্লিপার এবং ট্র্যানজিষ্টর BC 147কে ফেজ্ সপ্লিটার (Phase spliter) এবং পুশ-পুল সিঙ্ক ডিসক্রিমিনেটর হিসেবে সার্কিটে কাজ করানো হয়।

ট্র্যানজিষ্টর BC158B একটা পি-এন-পি ট্র্যানজিষ্টর। এই ট্র্যানজিষ্টরকে কার্যকরী করার জন্য ভিডিও ইনপুট সিগন্যাল ও নেগেটিভ সিঙ্ক পালস, রেজিষ্টর 2·2K ; 1K ও ক্যাপাসিটর 2·2Mfd এর মাধ্যমে BC 158B এর বেস-এ দেওয়া হয়। আউটপুট হিসেবে কালেকটরে পাওয়া যায় ক্লিপড্ সিঙ্ক পালস। ভার্টিকাল সেকশনের জন্য ভার্টিকাল সিঙ্ক পালস্ও BC 158B এর কালেকটর থেকেই পাওয়া যায়। এই সিঙ্ক পালস্ রেজিষ্টর 22K, যেটা ট্র্যানজিষ্টর BC 158B এর কালেকটরের সাথে যুক্ত, এই রেজিষ্টরের মাধ্যমে ভার্টিকাল অসিলেটর সেকশনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ফেজ সপ্লিটার

ট্র্যানজিষ্টর BC 147B ফেজ সপ্লিটার এর কাজ করে। এই ট্র্যানজিষ্টর থেকে দু'টো আলাদা ফ্রিকোয়েন্সি পাওয়া যায়। একটা ইনপুট সিগন্যালের অনুরূপ, অন্যটাকে 180° ফেজ শিফ্‌ট করা হয়। এই দুই বিপরীত মেরুর সিগন্যালকে ট্র্যানজিষ্টর BC 147B এর এমিটার ও কালেকটর থেকে আউটপুট হিসেবে নেওয়া হয়। রেজিষ্টর 560Ω কালেকটরের লোড হিসেবে কাজ করে ও ক্যাপাসিটর 0·01Mfd বাইপাস ক্যাপাসিটরের কাজ করে। রেজিষ্টর 560Ω ও ক্যাপাসিটর 0·01Mfd, ফেজ আউটপুট করে সিঙ্ক ডিসক্রিমিনেটর সার্কিটে ভারসাম্য (Balance)

আনে। এই ভারসাম্য আনার জন্য ব্যবহার করা হয় দু'টো ডায়োড IN 4148। ট্রানজিস্টর BC 147B-এর বেস-এ পজেটিভ সিঙ্ক পালস্ দেওয়া হয় এবং কালেকটরে পাওয়া যায় নেগেটিভ সিঙ্ক পালস্। এই পালস্‌কে ক্যাপাসিটর 0·01 Mfd এর মাধ্যমে ডায়োড IN 4148 এর ক্যাথোডে যুক্ত করা হয়। এমিটারে পাওয়া যায় পজেটিভ সিঙ্ক পালস্, যাকে ক্যাপাসিটর 0·1Mfd দিয়ে ডায়োড IN 4148এর অ্যানোডে দেওয়া হয়।

ব্যালান্সড সিঙ্ক ডিসক্রিমিনেটর

দু'টো ডায়োড IN 4148 ব্যালান্সড্ সিঙ্ক ডিসক্রিমিনেটর সার্কিটে কাজ করে। একটা হরাইজেন্টাল অসিলেটর ফ্রিকোয়েন্সির নমুনা (Sample) নিয়ে ক্যাপাসিটর 0·01 Mfd ও রেজিস্টর 1·5K দিয়ে ডায়োড দু'টোর অ্যানোড-ক্যাথোড জাংশনে যুক্ত করা হয়েছে। এই পালস্‌কে নেওয়া হয় LOT'র 13 নং ট্যাগ থেকে। এখন, প্রত্যেকটা পজেটিভ পালস্ ঐ ক্যাপাসিটর ও রেজিস্টর দিয়ে ক্যাপাসিটর 0·047 Mfdকে চার্জড্ করে। কিন্তু প্রথম ফ্লাই ব্যাক এর সময় ক্যাপাসিটর 0·047 Mfd অনেক দেরীতে ডিসচার্জড্ হয়। যার ফলে এই ক্যাপাসিটর এর প্রান্তে স-টুথ ভোল্টেজ তৈরী হয় ও ডায়োড IN 4148-এর ক্যাথোড ও অপর ডায়োড এর অ্যানোডে গিয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ, সিঙ্ক ইনপুট ভোল্টেজ, দু'টো ডায়োডকেই চালিত করে। এই ব্যালান্সড্ আউটপুট ভোল্টেজ, যেটা দু'টো রেজিস্টর 33Kএর জাংশনে নিয়ন্ত্রিত ডিসি ভোল্টেজ তৈরী করে, হরাইজেন্টাল অসিলেটর সার্কিটের জন্য। যখন হরাইজেন্টাল অসিলেটর-এর ফ্রিকোয়েন্সি 15,625 Hz থাকে তখন সাধারণ অবস্থায় এই নিয়ন্ত্রিত ডিসি ভোল্টেজের মান শূন্য থাকে।

সিঙ্ক সেপারেটর ও এ এফ সির সাধারণ ফল্ট

(1) রেজিস্টর 22Ω যেটা BC 158B-এর এমিটারের সঙ্গে যুক্ত সেটা ওপেন হয়ে গেলে হরাইজেন্টাল ও ভার্টিকাল —দুই ধরনের রোলিং হবে।

(2) রেজিস্টর 2·2K, রেজিস্টর 1K ও ক্যাপাসিটর 2·2 Mfd যেগুলো ট্রানজিস্টর BC 158Bর বেস-এর সাথে যুক্ত, এগুলো ওপেন হয়ে গেলে ছবিতে হরাইজেন্টাল ও ভার্টিকাল—দু' ধরনের রোলিং হবে।

(3) রেজিস্টর 2·7K, যেটা ট্রানজিস্টর BC 158B'র কালেকটরের সাথে যুক্ত, এই রেজিস্টরটা ওপেন হয়ে গেলে ট্রানজিস্টর BC 158B'র কালেকটর ভোল্টেজ বেড়ে যাবে এবং ছবি ভার্টিকালি রোল করবে।

(4) ফেজ সপ্লিটার ট্রানজিস্টর BC 147B যদি ওপেন হয়ে যায় তা'হলে ছবি হরাইজেন্টালি রোল করবে।

(5) ক্যাপাসিটর 0·1Mfd ও রেজিস্টর 1·5K, যেটা দু'টো ডায়োড IN4148-এর যথাক্রমে অ্যানোড ও ক্যাথোডের সঙ্গে যুক্ত, এই ক্যাপাসিটরটা ওপেন হয়ে গেলে LOT'র 13 নং ট্যাগ থেকে কোনো হরাইজেন্টাল ফ্লাই ব্যাক পালস্ আসবে না, যার ফলে ছবি হরাইজেন্টালি রোল করবে।

ভিডিও আউটপুট সেকশন

এই অংশে তিনটে ট্র্যানজিস্টর BC 158B, 2N3501 এবং BC 147B ব্যবহার করা হয়।

ভিডিও ড্রাইভার

এখানে PNP ট্রানজিস্টর BC 158Bকে ভিডিও ড্রাইভার হিসেবে কাজ করানো হয়েছে। আই সি CA3068

এর 19 নং পিন থেকে কম্পোজিট ভিডিও সিগন্যাল রেজিস্টর 220Ω দিয়ে কনট্রাস্ট কনট্রোল 1K-এর একপ্রান্তে এসে পড়েছে। কনট্রাস্ট কনট্রোলের মাঝখানের পিন থেকে সিগন্যাল, ট্রানজিস্টর BC 158B'র বেস-এ গেছে। তারপর ট্রানজিস্টর BC 158B-র এমিটার থেকে বেরিয়ে ট্রানজস্টর 2N 3501-র বেস-এ গেছে ও রেজিস্টর 390Ω দিয়ে সেই সিগন্যাল আবার BC 147Bর কালেকটর-এ গেছে।

ট্রানজিস্টর BC 158B কে বলা হয় এমিটার ফলোয়ার (Emitter follower) ট্রানজিস্টর। এর ইমপিডেন্স অত্যন্ত বেশী। এর ফলে এই ট্রানজিস্টর ব্যবহৃত সার্কিটটা নীচু ইমপিডেন্স লোড এবং উচ্চ ইমপিডেন্স উৎস'র মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য আনে।

ভিডিও আউটপুট

ভিডিও আউটপুট ট্রানজিস্টর হিসেবে ব্যবহৃত হয় 2N3501। +110V এস সি আর পাওয়ার সাপ্লাই থেকে রেজিস্টর 18K এবং সমান্তরালে কয়েল ও রেজিস্টর 3·9K/5W-র মাধ্যমে এই ট্রানজিস্টর 2N3501-র কালেকটরে দেওয়া হয়। এই কালেকটর সরাসরি 'বীম লিমিটিং সার্কিট' [ক্যাপাসিটর 0·047 Mfd/250V, সমান্তরালে ডায়োড IN 4005 ও রেজিস্টর 1·5K দিয়ে গঠিত] দিয়ে পিকচার টিউবের ক্যাথোডের সাথে যুক্ত হয়।

ছবির কনট্রাস্ট নির্ভর করে কত পরিমাণে ভিডিও সিগন্যাল, ভিডিও অ্যাম্প্লিফায়ারে সম্প্রসারিত হচ্ছে তার ওপর এবং এই সম্প্রসারণ কন্ট্রাস্ট কন্ট্রোলকে বাড়িয়ে-কমিয়ে নিয়ন্ত্রিত করা যায়।

রিট্রেস সময়ে ক্যাথোডের টিউবের ব্ল্যাঙ্কিং

ভিডিও আউটপুট ট্রানজিস্টর 2B 3501 -কে হরাইজেন্টাল ও ভার্টিকাল রিট্রেস-সময়ে বন্ধ করে রাখা হয় সুইচিং ট্রানজিস্টর BC147B-এর সাহায্যে। ভার্টিকাল ব্ল্যাঙ্কিং পালস্ ক্যাপাসিটর 2·2Mfd ও হরাইজেন্টাল ব্ল্যাঙ্কিং পালস্ রেজিস্টর 10K ও রেজিস্টর 1K-এর মাঝখানে যুক্ত হয়ে সম্মিলিতভাবে ট্রানজিস্টর BC147B-এর বেস-এ দেওয়া হয়েছে এর ফলেই ব্ল্যাঙ্কিং সময়ে সুইচিং ট্রানজিস্টরকে বন্ধ করে রাখা হয়।

ট্রানজিস্টর BC 147B (T-301)

কালেকটর	—	3·1V
বেস	—	0·1V
এমিটার	—	0V

ট্রানজিস্টর 2N 3501 (T-303)

কালেকটর	—	50 থেকে 80V
বেস	—	2·8V থেকে 3·8V
এমিটার	—	2·4V থেকে 3·4V

ট্রানজিস্টর BC 158B (T-302)

কালেকটর	—	0V
বেস	—	1·8V থেকে 3·4V
এমিটার	—	2·8 থেকে 3·8V

পিকচার টিউব (CRT)-র ভোল্টেজ

পিন নং 1	—	5V AC
2	—	−4V থেকে +25V
3	—	260V
4	—	100V
7	—	50V থেকে 80V

ভিডিও আউট পুট সেকশনের কিছু সাধারণ ফল্ট

(1) ব্ল্যাঙ্কিং ট্র্যানজিষ্টর BC 147 B ওপেন বা শর্ট হয়ে গেলে স্ক্রীনে ট্রেস ও রিট্রেস লাইন দেখা যাবে।

(2) রেজিষ্টর 220 Ω যেটা 1K কনট্রাস্ট কন্ট্রোলের সঙ্গে যুক্ত থাকে, সেটা ওপেন হয়ে গেলে স্ক্রীনে কোন ছবি থাকবে না কিন্তু রাস্টার ঠিক থাকবে।

(3) ভিডিও ড্রাইভার ট্রানজিস্টর BC 158B ওপেন হয়ে গেলে ছবি থাকবে না কিন্তু রাস্টার থাকবে, শর্ট হয়ে গেলে রাস্টারে গ্লো থাকবে।

(4) রেজিষ্টর 22 Ω, যেটার একপ্রান্তে 15 ভোল্ট সাপ্লাই ও অন্য প্রান্তে রেজিষ্টর 2·7K দিয়ে ভিডিও ড্রাইভার ট্রানজিস্টরের এমিটার ও ভিডিও আউটপুট ট্রানজিস্টরের (2N 3501) বেসের সাথে যুক্ত থাকে সেটা ওপেন হয়ে গেলে রাস্টার থাকবে না অথবা রিট্রেস লাইন দেখা যাবে।

(5) রেজিষ্টর 3·9K/5W যেটা ভিডিও আউট পুট ট্রানজিস্টরের কালেকটরের সঙ্গে যুক্ত ও অপর প্রান্ত 110 ভোল্টের সাথে যুক্ত সেটা ওপেন হয়ে গেলে রিট্রেস লাইন দেখা যাবে।

(6) রেজিষ্টর 390 K যেটার এক প্রান্তে নেগেটিভ ভোল্টেজ আসছে এবং অপর প্রান্ত পিকচার টিউবের 7 নং পিনের সাথে যুক্ত থাকে সেটা ওপেন হয়ে গেলে নেগেটিভ ছবি দেখা যাবে।

ভার্টিকাল অসিলেটর ও আউটপুট

পাঁচটা ট্রানজিস্টরকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এই ভার্টিকাল অসিলেটর ও আউটপুট সেকশন। সুইচিং (ভার্টিকাল অসিলেটর) ট্রানজিস্টর BC 158 B, কালেকটর ফলোয়ার ট্রানজিস্টর BC 147 B, ভার্টিকাল ড্রাইভার ট্রানজিস্টর BC 147 B এবং ভার্টিকাল আউটপুটে ব্যবহার করা হয় দু'টো ট্রানজিস্টর AC 187 এবং AC 188 এই সেকশনের প্রধান কাজ হলো,

(1) 50 সাইকল্‌স্ স্ক্যানিং ফ্রিকোয়েন্সি তৈরী করা।

(2) ভার্টিকাল সুইপ সেকশনের জন্য 50 সাইকল্‌স্ ফ্রিকোয়েন্সিকে সম্প্রসারিত করা।

(3) টিভি সেটের ভার্টিকাল সুইপকে, টিভি ষ্টেশনের থেকে পাঠানো ভার্টিকাল সুইপের অনুসারী করা।

(4) ভার্টিকাল রিট্রেসের সময় পিকচার টিউবে ব্ল্যাঙ্কিং পালস্ পাঠানো, যাতে সেই সময় স্ক্রীনে কোনো আলো না থাকে।

LOT র 10 নং ট্যাগ থেকে 25 V ডি সি কে এই সেকশনে দেওয়া হয়, যাতে এই সেকশন কার্যকরী হয়। কালেকটর ফলোয়ার ট্রানজিস্টর BC 147 Bর বেস-এ ভার্টিকাল সিঙ্ক পালস্ (পজেটিভ মেরুধর্মী), সিঙ্ক সেপারেটর সেকশন থেকে এসে পড়ে। এই ট্রানজিস্টরকে কার্যকরী করার জন্য একটা নেগেটিভ -6V সাপ্লাইও দেওয়া হয়। এই ট্রানজিস্টরের কালেকটর থেকে সম্প্রসারিত সিগন্যাল গিয়ে পৌঁছোয় BC 158 B র কালেকটরে। এই ট্রানজিস্টরের কাজ হচ্ছে ভার্টিকাল সুইপ সেকশনকে ধরে রাখা। এই BC 158 Bর বেস থেকে সিগন্যাল বেরিয়ে ক্যাপাসিটর 0·22 Mfd, রেজিষ্টর 680 Ω, 6·8 K, হাইট কন্ট্রোল 4·7 K, ও ক্যাপাসিটর 33 Mfd দিয়ে ড্রাইভার ট্রানজিস্টর BC 147 B র বেস-এ পৌঁছেছে।

ড্রাইভার ট্রানজিস্টর BC 147 B র কালেকটর থেকে সিগন্যাল সম্প্রসারিত হয়ে পরবর্তী ক্ষেত্রে আউটপুট ট্রানজিস্টর AC 188 র বেস এ পৌঁছোয়। ঐ একই সিগন্যাল রেজিষ্টর 120 Ω এর মাধ্যমে AC 187 এর বেস-এ দেওয়া হয়। ট্রানজিস্টর AC 187 এর বেস থেকে রেজিষ্টর 1 K, ও 470 Ω দিয়ে ডায়োড IN 4005 এর ক্যাথোডে সম্প্রসারিত 50 সাইকলস্ সিগন্যাল এসে পড়ে এবং অ্যানোড থেকে সেই সিগন্যাল পৌঁছোয় ভার্টিকাল ইয়োকের এক প্রান্তে।

AC 187 এর বেস এর সাথে যুক্ত দু'টো রেজিষ্টর 1 K ও 470 Ω এর মাঝখান থেকে ফিলটার ক্যাপাসিটর 100 Mfd / 25 V দিয়ে ভার্টিক্যাল ব্ল্যাঙ্কিং পালস্ ভার্টিকাল ব্ল্যাঙ্কিং ট্রানজিষ্টর BC 147 Bর বেস এ পৌঁছোয়।

ভার্টিকাল অসিলেটর আউটপুট সেকশনের কিছু সাধারণ ফল্ট

(1) ভার্টিকাল অসিলেটর ট্রানজিষ্টর BC 158 B যদি শর্ট বা ওপেন হয়ে যায় তাহলে স্ক্রীনে হরাইজেন্টাল লাইন হয়ে যাবে।

(2) ক্যাপাসিটর 0·33 Mfd যেটা বটম্ কন্ট্রোল 100 K র সাথে যুক্ত সেটা ওপেন বা শর্ট হয়ে গেলে স্ক্রীনে হরাইজেন্টাল লাইন হয়ে যাবে অথবা বটম্ ফোল্ড হয়ে যাবে।

(3) ভার্টিকাল প্রি-অ্যাম্প্লিফায়ার ট্রানজিষ্টর BC 147 B যদি ওপেন বা শর্ট হয়ে যায় তাহলে স্ক্রীনে হরাইজেন্টাল লাইন হয়ে যাবে।

(4) -6 V সাপ্লাইকে রেজিষ্টর 6·8K Ω দিয়ে ট্রানজিষ্টর BC 147 B র বেস-এ দেওয়া হয়। এই রেজিষ্টরটা ওপেন হয়ে গেলে স্ক্রীনে হরাইজেন্টাল লাইন হয়ে যাবে।

(5) ভার্টিকাল ড্রাইভার ট্রানজিষ্টর BC 147 B র সাথে যুক্ত থাকে হাইট কন্ট্রোল 47K, এই কন্ট্রোলটা ওপেন বা সুনিয়ন্ত্রিত (Adjust) না থাকলে স্ক্রীনে হরাইজেন্টাল লাইন হয়ে যাবে অথবা ছবির উচ্চতা ছোট হয়ে যাবে।

(6) ড্রাইভার ট্রানজিষ্টর BC 147 B'র বেস-এর সাথে যুক্ত থাকে ডায়োড IN 4148, এটা ওপেন হয়ে গেলে ধীরে ধীরে ভার্টিকাল রোলিং হবে এবং শর্ট হলে হরাইজেন্টাল লাইন হবে।

(7) ভার্টিকাল ইয়োকের সাথে যুক্ত ক্যাপাসিটর 1000 Mfd / 25V, যার অন্যপ্রান্ত রেজিষ্টর 0·5 Ω দিয়ে চেসিস করা আছে। এই ক্যাপাসিটরটা ওপেন হয়ে গেলে হরাইজেন্টাল লাইন হবে এবং শর্ট হয়ে গেলে বটম্ ফোল্ড অথবা ছবির উচ্চতা ছোট হয়ে যাবে। এই 0·5Ω রেজিষ্টরটার মান যদি বেড়ে বা কমে যায় ত'াহলে নিচে থেকে ছবি ছোট হয়ে যাবে।

(8) ভার্টিকাল আউটপুট ট্রানজিষ্টর AC 188 ও AC 187 যদি ওপেন হয়ে যায় তা'হলে হরাইজেন্টাল লাইন হয়ে যাবে, শর্ট হয়ে গেলে ছবি ওপর-নিচ থেকে ছোট হয়ে যাবে অথবা শুধু নিচে ছোট হয়ে যাবে এবং ড্রাইভার ট্রানজিষ্টর BC 147 Bও শর্ট হয়ে যাবে।

(9) ভার্টিকাল ইয়োকের সাথে যুক্ত থাকে রেজিষ্টর 4·7 K Ω এবং ক্যাপাসিটর 0·01 Mfd। এটার কোনো একটা বা দু'টোই শর্ট হয়ে গেলে ছবির কোণায় কালো প্যাচ্ (Patch) দেখা যাবে।

(10) স্লো ভার্টিকাল রোলিং হলে ভার্টিকাল প্রি-অ্যাম্প্লিফায়ার ট্রানজিষ্টর BC 147 B'র বেস এর সাথে যুক্ত ক্যাপাসিটর 4·7 Kpf টাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

(11) ট্রানজিষ্টর AC 188 ও AC 187 এর সাথে যুক্ত ক্যাপাসিটর 2·2 Mfd / 63 V যেটা ব্ল্যাঙ্কিং ট্রানজিষ্টর BC 147 B র বেস এ পড়েছে, সেটা যদি ওপেন বা শর্ট হয়ে যায় তাহলে স্ক্রীনে ভার্টিকাল ব্ল্যাঙ্কিং লাইন পাওয়া যায়।

হরাইজেন্টাল অসিলেটর ও লাইন আউটপুট সেকশন

হরাইজেন্টাল অসিলেটর সেকশন চারটে ট্রানজিষ্টর দিয়ে গঠিত। এই ট্রানজিষ্টরগুলো হলো বাফার বা

ফেজ রিভার্সাল ট্রানজিস্টর BC 147 B ; দু'টো হরাইজেণ্টাল অসিলেটর ট্রানজিস্টর BC 158 B ; হরাইজেণ্টাল ড্রাইভার ট্রানজিস্টর BD 115।

এই সেকশনকে কার্যকরী করার জন্য পাওয়ার সাপ্লাই (SCR Power Supply) থেকে +11OV কে রেজিস্টর 220 Ω ও 180 K দিয়ে দু'টো BC 158 B ট্রানজিস্টরের এমিটারে দেওয়া হয়।

হরাইজেণ্টাল সিঙ্ক পালস্ এসে ট্রানজিস্টর BC147 B'র বেস-এ পড়ে। BC147 B'র কালেকটর থেকে সম্প্রসারিত সিগন্যাল তারপর পৌঁছোয় BC 158 B'র বেস এ। BC 158 B'র কালেকটর থেকে হরাইজেণ্টাল ড্রাইভ পালস (15, 625 Hz) বেরিয়ে এরপর ড্রাইভার ট্রানজিস্টর BD 115 এর বেস এ পৌঁছোয়।

অপর ট্রানজিস্টর BC 158 B'র বেস এর সাথে যুক্ত থাকে হরাইজেণ্টাল হোল্ড কণ্ট্রোল 10 K। ট্রানজিস্টর BD 115 এর কালেকটর থেকে সম্প্রসারিত হরাইজেণ্টাল ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যাল বেরিয়ে হরাইজেণ্টাল ড্রাইভার ট্রান্সফরমারের প্রাইমারীতে গিয়ে পড়ে। এই ট্রান্সফরমারের সেকেণ্ডারীতে আবেশিত সিগন্যাল তারপর হরাইজেণ্টাল আউটপুট ট্রানজিস্টর (সুইচিং ট্রানজিস্টর) BU 205 এর বেস এ পৌঁছোয়।

হরাইজেণ্টাল আউটপুট সেকশনে 13 ট্যাগের LOT (2040/U) ব্যবহার করা হয়েছে। 5 নং ট্যাগে দেওয়া হয়েছে +110 V SCR পাওয়ার সাপ্লাই। 4 নং ট্যাগ থেকে বুস্ট ভোল্টেজ পাওয়া যায়। 3নং ট্যাগ থেকে 0·22 Mfd / 400V ক্যাপাসিটরের মাধ্যমে হরাইজেণ্টাল ইয়োকের একপ্রান্তে দেওয়া হয়েছে, 2 নং ট্যাগের সাথে যুক্ত থাকে ডায়োড TV 20'র অ্যানোড, 8 নং ট্যাগ থেকে 6·3V AC বেরিয়ে পিকচার টিউবের হিটার এ যায়। 9 নং ট্যাগ থেকে ডায়োড EC 4007 এর মাধ্যমে ব্রাইটনেস কণ্ট্রোলকে নেগেটিভ সাপ্লাই দেওয়া হয়। 10 নং ট্যাগ থেকে 25 V সাপ্লাই বেরিয়ে সাউণ্ড সেকশনে যায়। 11 নং ট্যাগ থেকে পাওয়া যায় 15 V সাপ্লাই, যা'কে দেওয়া হয় সাউণ্ড আই এফ ও ভিডিও আই এফ সেকশনে। 13 নং ট্যাগ থেকে পাওয়া যায় -6 V যাকে ভার্টিকাল সেকশন এবং এ এফ সি ও সিঙ্ক সেপারেটর সেকশনে পাঠানো হয়।

হরাইজেণ্টাল অসিলেটর ও লাইন আউটপুটের কিছু সাধারণ ফল্ট

(1) রেজিষ্টর 220Ω যেটা রেজিস্টর 180 KΩ এর মাধ্যমে দু'টো BC 158B'র এমিটার এর সঙ্গে যুক্ত, সেই রেজিস্টরটা ওপেন হয়ে গেলে রিসিভার সেট সম্পূর্ণ মৃত হয়ে যাবে।

(2) ক্যাপাসিটর **0·01 Mfd/500V**, যেটা ঐ রেজিস্টর 220Ω এর সাথে যুক্ত থাকে, এই ক্যাপাসিটরটা শর্ট হয়ে গেলেও সেট মৃত হয়ে যাবে।

(3) ড্রাইডার ট্রান্সফরমার এর প্রাইমারী কয়েল এবং রেজিস্টর 2·7K/3W এর মাঝখানে থাকে ক্যাপাসিটর **0.1 Mfd/250V.** এই ক্যাপাসিটরটা শর্ট হয়ে গেলে সেট মৃত হয়ে যাবে।

(4) হরাইজেণ্টাল অসিলেটর ট্রানজিস্টর হিসাবে কাজ করে দু'টো BC 158B. এই ট্রানজিস্টর এর একটা বা দু'টোই যদি ওপেন বা শর্ট হয়ে যায় তাহ'লে কোনো হরাইজেণ্টাল অসিলেশন হবে না, যার ফলে সেট মৃত হয়ে যাবে।

(5) 110V কে রেজিষ্টর **120 KΩ** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়, ট্রানজিস্টর BC 158B'র বেস-এ। এই রেজিস্টরটা যদি ওপেন হয়ে যায় তাহলে কোনো হরাইজেণ্টাল অসিলেশন হবে না এবং সেট মৃত হয়ে যাবে।

(6) ক্যাপাসিটর 2·2 **KPf**, যেটা ট্রানজিস্টর BC 158B'র বেস এর সাথে, হরাইজেণ্টাল হোল্ড কণ্ট্রোল 10K এর মাধ্যমে পৌঁছেছে এবং ক্যাপাসিটরের অন্য প্রান্ত চেসিস করা হয়েছে। এই ক্যাপাসিটরটা যদি ওপেন বা শর্ট

হয়ে যায় তা'হলে সেট মৃত হয়ে যাবে অথবা ছবি হরাইজেন্টালি সরে যাবে, যার ফলে স্ক্রীনের একদিকে কালো হরাইজেণ্টাল চওড়া বার দেখা যাবে।

(7) ট্রানজিস্টর 147B যদি ওপেন বা শর্ট হয়ে যায় তাহলে সেট মৃত হয়ে যাবে।

(8) BC 147Bর এমিটার এবং হরাইজেণ্টাল ড্রাইভার ট্র্যানজিস্টর BD 115 এর কালেকটরের মধ্যে থাকে দু'টো রেজিষ্টর 270K. এই রেজিস্টর দু'টো বা একটা ওপেন হয়ে গেলে 15,625 Hz ফ্রিকোয়েন্সি সঠিক মাত্রায় যাবে না এবং এর ফলে স্ক্রীনে স্ফুলিঙ্গ (Spark) আসবে।

(9) ট্রানজিস্টর BD 115 এর বেস এর সাথে যুক্ত রেজিষ্টর 680Ω, যেটার অন্য প্রান্ত চেসিস করা আছে, এই রেজিস্টরটা ওপেন হয়ে গেলে, BD 115 এর বেস-এ ড্রাইভ ভোল্টেজ কমে যাবে, তার ফলে ছবিতে আলো কমে আসবে, ছবি আবছা হয়ে যাবে এবং ছবি বাঁদিক ও ডানদিক থেকে ছোট হয়ে যাবে।

(10) হরাইজেন্টাল হোল্ড কন্ট্রোল 10Kর সাথে সিরিজে যুক্ত থাকে রেজিষ্টর 18K ও 22K. এবং তারপর সেটা পে'ীছোয় BD 115 এর কালেকটরে। এই দু'টো বা একটা রেজিস্টর ওপেন হয়ে গেলে সেট মৃত হয়ে যাবে কারণ 15,625Hz ফ্রিকোয়েন্সি তৈরী হবে না।

হরাইজেন্টাল লাইন আউটপুট

(1) লাইন আউটপুট ট্রান্সফরমার (LOT) এর 5নং ট্যাগের সাথে যুক্ত থাকে রেজিষ্টর 50V/10W, যার একপ্রান্তে দেওয়া হয় 110V সাপ্লাই। এই রেজিস্টরটা ওপেন হয়ে গেলে সেট মৃত হয়ে যাবে।

(2) এই 50V/10W রেজিস্টরের সাথেই যুক্ত থাকে ক্যাপাসিটর 0·01 Mfd/ 250V। এই ক্যাপাসিটরটা শর্ট হয়ে গেলে সেট মৃত হয়ে যাবে।

(3) LOT'র 4 নং ট্যাগের সাথে যুক্ত থাকে ডায়োড BA157। ডায়োডটা ওপেন হয়ে গেলে পিকচার টিউবের 3 ও 4 নং পিনে কোনো ভোল্টেজ যাবে না, যার ফলে সেট এ কোনো আলো থাকবে না।

(4) LOT'র 3 নং ট্যাগের সাথে যুক্ত থাকে ক্যাপাসিটর 0·22 Mfd / 400 V, এই ক্যাপাসিটরটা শর্ট বা ওপেন হয়ে গেলে স্ক্রীনে ভার্টিকাল লাইন হয়ে যাবে।

(5) LOT'র 3 নং ট্যাগের সাথেই ট্রানজিস্টর BU 205 এর কালেকটরের সাথে যুক্ত থাকে ক্যাপাসিটর 3·9 Kpf / 2000 V। এই ক্যাপাসিটরটা শর্ট হয়ে গেলে সেট মৃত হয়ে যাবে এবং ওপেন হয়ে গেলে ছবি দৈর্ঘ্যে ছোট হয়ে যাবে।

(6) LOT'র 9 নং ট্যাগের সাথে যুক্ত থাকে ডায়োড EC 4007 অথবা IN 4007, ডায়োডটা ওপেন বা শর্ট হয়ে গেলে স্ক্রীনে কোনো আলো থাকবে না এবং ব্রাইটনেস কণ্ট্রোলকে বাড়িয়ে কমিয়েও কোনো আলো আনা যাবে না।

(7) LOT'র 10 নং ট্যাগের সাথে যুক্ত ডায়োড BA 148, 11 নং ট্যাগের সাথে যুক্ত ডায়োড BA 148 এবং 13 নং ট্যাগের সাথে যুক্ত থাকে ডায়োড IN 4148 যদি ওপেন বা শর্ট হয়ে যায় তাহলে যথাক্রমে +25V, +15 V ও 6 V পাওয়া যাবে না।

(8) পিকচার টিউবের 2 নং পিন এবং ব্রাইটনেস কণ্ট্রোল 250 K র সাথে যুক্ত ক্যাপাসিটর 0·1 Mfd / 500 V যদি শর্ট বা ওপেন হয়ে যায় ত'াহলে চারটে আবছা কালো ভার্টিকাল লাইন ছবির ওপর আসবে।

গোল্ডষ্টার পোর্টেবল টেলিভিশন

গোল্ডষ্টার পোর্টেবল সার্কিটে তিনটে ইনটিগ্রেটেড সার্কিট ব্যবহার করা হয়। এই তিনটে আই সি হলো UPC 1366 (IC-201), GL 3201 অথবা CA 3065 (IC-401) এবং HA 11423 অথবা GL-3401 (IC-601)। এই তিনটে আই সি'র কাজ হলো,

UPC 1366—আই এফ অ্যাম্প্লিফায়ার, ভিডিও ডিটেকটর, এজিসি

GL 3201 / CA 3065—এফ এম ডিটেকটর, সাউণ্ড আই এফ অ্যাম্প্লিফায়ার

HA 11423 / GL 3401—হরাইজেণ্টাল অসিলেটর, ভার্টিকাল অসিলেটর, সিঙ্ক সেপারেটর ও এ এফ সি।

এ্যান্টেনা থেকে আর এফ ফ্রিকোয়েন্সি এসে টিউনারে প্রবেশ করে। টিউনারের মাধ্যমে আই এফ ফ্রিকোয়েন্সি ক্যাপাসিটর 4pf (C-201), কয়েল (L-201) রেজিষ্টর 18 Ω (R-203) ও ক্যাপাসিটর 0·001pf (C-207)দিয়ে ভিডিও আই এফ আই সি UPC 1366 এর 9নং পিনে প্রবেশ করে। আই সি'র মধ্যেই আই এফ ফ্রিকোয়েন্সি সম্প্রসারিত হয়ে, ভিডিও ডিটেকটরে ডিটেক্ট করে 3নং পিন দিয়ে কম্পোজিট ভিডিও সিগন্যাল ও ইণ্টার ক্যারিয়ার শব্দ ফ্রিকোয়েন্সি (5·5 MHz) বেরিয়ে আসে। এরপর এই কম্পোজিট ভিডিও সিগন্যাল তিনটে আলাদা বিভাগে যায়। সেকশন তিনটে হলো,

(1) সাউণ্ড সেকশন

(2) ভিডিও আই এফ ও অ্যাম্প্লিফায়ার সেকশন

(3) সিঙ্ক সেপারেটর সেকশন,

সাউণ্ড সেকশন

আই সি UPC 1366 এর 3 নং পিন থেকে সিগন্যাল, ক্যাপাসিটর 47pf (C-401) দিয়ে আই সি GL3201/ CA 3065-এর 1 ও 2 নং পিনে পৌঁছোয়। আই সি-র 8 নং পিন থেকে আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি বেরিয়ে ভল্যুম কণ্ট্রোল 10K (R-417)-এর এক প্রান্তে যায়। ভল্যুম কণ্ট্রোলের মাঝের পিন থেকে অডিও ফ্রিকোয়েন্সি ক্যাপাসিটর 4·7 Mfd / 16 V (C-407) ও রেজিষ্টর 1 K (R-416)-এর মাধ্যমে পৌঁছোয় ট্রানজিষ্টর BC 147 B (TR-401)-র বেসে। এরপর এই ফ্রিকোয়েন্সিকে ট্রানজিষ্টর CL100 (TR-402) ও CK100 (TR-403)-র বেস-এ দেওয়া হয়। এই দুটো ট্রানজিষ্টরকে সাউণ্ড আউটপুট ট্রানজিষ্টর বলা হয়। সাউণ্ড ফ্রিকোয়েন্সি পুশ-পুল অ্যামপ্লিফাই হয়ে ক্যাপাসিটর 100 Mfd (C-414) দিয়ে স্পিকারে গিয়ে পড়ে।

সাউণ্ড সেকশনের কিছু সাধারণ ফল্ট

(1) রেজিষ্টর 150 Ω (R-405) যেটা আই সি GL 3201 / CA 3065 এর 5 নং পিনের সাথে যুক্ত, এই রেজিষ্টরটা ওপেন হয়ে গেলে D সাপ্লাই যাবে না, যার ফলে কোনো শব্দ থাকবে না।

(2) ক্যাপাসিটর 0·0047 Mfd (C-402) যেটা আই সি'র 1 নং পিনের সাথে যুক্ত, সেটা শর্ট হয়ে গেলে কোনো শব্দ থাকবে না।

(3) ক্যাপাসিটর 4·7 Mfd / 16 V (C-406) যেটা আই সি'র 8 নং পিন ও ভল্যুম কণ্ট্রোলের এক প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত, এটা ওপেন হয়ে গেলে কোনো ষ্টেশনের শব্দ পাওয়া যাবে না।

(4) কয়েল (L-401) যেটা আই সি'র 9 নং পিনের সঙ্গে যুক্ত, সেটা ওপেন হয়ে গেলে শব্দে বিকৃতি আসবে।

(5) আই সি'র পিন ভোল্টেজগুলো সঠিক না থাকলেও কোনো স্টেশন সাউণ্ড পাওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে আই সি কে পরিবর্তন করে দিতে হবে।

(6) ক্যাপাসিটর 4·7 Mfd / 16 V (C-407) যেটা ভল্যুম কণ্ট্রোলের একপ্রান্ত ও ড্রাইভার ট্র্যানজিষ্টর BC 147B (TR-401) এর বেস-এর সাথে যুক্ত, এই ক্যাপাসিটরটা ওপেন হয়ে গেলে কোনো শব্দ থাকবে না এবং শর্ট হয়ে গেলে বিকৃত শব্দ পাওয়া যাবে।

(7) রেজিষ্টর 39K (R-407), যেটা ট্র্যানজিষ্টর (TR-401) এর বেস এবং সাউণ্ড আউটপুট ট্র্যানজিষ্টর CL 100 (TR-402) ও CK 100 (TR-403) এর এমিটারের সঙ্গে যুক্ত, এই রেজিষ্টরটা ওপেন হয়ে গেলে শব্দ কমে যাবে।

(8) দু'টো রেজিষ্টর 1Ω (R-413, 414) যেটা আউটপুট ট্র্যানজিষ্টর CL 100 ও CK 100-র এমিটারের সঙ্গে যুক্ত, এই রেজিষ্টরের যে কোনো একটা যদি ওপেন হয়ে যায় তাহলে কোনো শব্দ থাকবে না অথবা যে কোনো একটা ট্র্যানজিষ্টর কেটে যাবে।

(9) ক্যাপাসিটর 100 Mfd / 10 V (C-414), যেটা আউটপুট ট্র্যানজিষ্টরের এমিটার আর স্পিকারের একপ্রান্তের সঙ্গে যুক্ত, এই ক্যাপাসিটরটা ওপেন হয়ে গেলে কোনো শব্দ থাকবে না।

(10) রেজিষ্টর 22 Ω / $\frac{1}{2}$ W (R-404), যেটা ট্র্যানজিষ্টর TR-402 ও A সাপ্লাই (12 V) এর সাথে যুক্ত, এটা ওপেন হয়ে গেলে কোনো শব্দ থাকবে না।

ভিডিও আই এফ ও অ্যাম্প্লিফায়ার সেকশন (ভিডিও ডিটেকটর, এ জি সি)

আই সি UPC 1366-এর 3 নং পিন থেকে আউটপুট হিসেবে পাওয়া ভিডিও সিগন্যালকে কয়েল (L-206) দিয়ে ট্র্যানজিষ্টর BC 158 (Tr 301)-এর বেস-এ দেওয়া হয়। এই ট্র্যানজিষ্টরের এমিটার দিয়ে সিগন্যাল সম্প্রসারিত হয়ে তারপর রেজিষ্টর 100Ω(R-302) ও সেরামিক ফিল্টার (CF-501)এর মাধ্যমে পরবর্তী ট্র্যানজিষ্টর 2N3501 (TR 302)এর বেস-এ পৌঁছোয়। এরপর, এই ট্র্যানজিষ্টরে সিগন্যাল চূড়ান্তভাবে সম্প্রসারিত হয়ে, কালেকটরের থেকে আউটপুট হিসেবে বে'র হয়ে ক্যাপাসিটর 0·47Mfd (C-301)-এর মাধ্যমে পিকচার টিউবের ক্যাথোডে পৌঁছোয়।

পিকচার টিউব বায়াসিং

পিকচার টিউবের ফিলামেন্ট সাপ্লাই পাওয়া যায় LOT'র 8 নং ট্যাগ থেকে। এই 8 নং ট্যাগ থেকে পাওয়া C সাপ্লাই (11V)কে ফিলামেন্ট সাপ্লাই হিসেবে কাজে লাগানো হয়। 4নং পিনকে চেসিস (নেগেটিভ) করা হয়। রেজিষ্টর 4·7K(R-316)-এর মাধ্যমে 100V সাপ্লাই স্ক্রীন গ্রিডে দেওয়া হয়।

পিকচার টিউবের পিন ভোল্টেজ নিম্নরূপ

2 নং পিন= 28V

3 নং পিন= 10V

4 নং পিন= O (গ্রাউণ্ড)

5 নং পিন = -0·4V থেকে -1·2V [এই ভোল্টেজ ব্রাইটনেস কন্ট্রোলকে বাড়িয়ে-কমিয়ে পরিবর্তিত করা যায়]

6 নং পিন = 100V

7 নং পিন = 0

ভিডিও আই এফ ও অ্যাম্প্লিফায়ার সেকশন-এর কিছু সাধারণ ফল্ট

(1) রেজিষ্টর 6·8K(R-210) যেটা আই সি UPC 1366-এর 2নং পিনের সাথে যুক্ত, এই রেজিস্টরটা ওপেন হয়ে গেলে কোনো ছবি ও শব্দ থাকবে না কিন্তু আলো থাকবে।

(2) রেজিষ্টর 4·7K (R-208) হলো, RF, A.G.C. কন্ট্রোল যা' আই সি'র 5 নং পিন এর সাথে যুক্ত থাকে, এটা ওপেন বা ঠিক নিয়ন্ত্রিত না থাকলে কোনো শব্দ বা ছবি থাকবে না অথবা ছবিতে 'স্নো' আসবে।

(3) কয়েল (L-206) যেটা আই সি'র 3 নং পিনের সাথে যুক্ত—এটা ওপেন হয়ে গেলে কম্পোজিট ভিডিও সিগন্যাল পাওয়া যাবে না, যার ফলে স্ক্রীনে কোনো ছবি ও শব্দ থাকবে না।

(4) রেজিষ্টর 220Ω(R-216) যেটা আই সি'র 6 নং পিন এবং টিউনার এজিসি'র সাথে যুক্ত—এটা ওপেন হয়ে গেলে কোন এ জি সি ভোল্টেজ টিউনারে যাবে না, তার ফলে কোনো ছবি ও শব্দ থাকবে না।

(5) ভিডিও ড্রাইভার ট্র্যানজিষ্টর BC 158B (TR-301) শর্ট বা ওপেন হয়ে গেলে কোনো ছবি থাকবে না।

(6) রেজিষ্টর 100Ω (R-302) যেটা ট্র্যানজিস্টর TR301-এর এমিটার থেকে ট্র্যানজিস্টর 2N3501 (TR-302)-এর বেস-এ যুক্ত থাকে—এটা ওপেন হয়ে গেলে কোনো ছবি থাকবে না কিন্তু আলো থাকবে।

(7) ভিডিও আউটপুট ট্র্যানজিষ্টর 2N3501 (TR-302) শর্ট বা ওপেন হয়ে গেলে ছবি পাওয়া যাবে না কিন্তু আলোর ওপর রিট্রেস লাইন দেখা যাবে।

(8) ক্যাপাসিটর 0·47 Mfd (C-301) ট্র্যানজিস্টর (TR-302)এর কালেকটার থেকে পিকচার টিউবের 2 নং পিনের সাথে যুক্ত থাকে—এটা শর্ট বা ওপেন হয়ে গেলে ছবি থাকবে না কিন্তু শব্দ ঠিক থাকবে।

(9) ক্যাপাসিটর 100Pf (C-305) যেটা কনট্রাস্ট কন্ট্রোলের এক প্রান্তের সাথে যুক্ত থাকে—এটা শর্ট হয়ে গেলে কনট্রাস্ট কন্ট্রোল কাজ করবে না এবং ছবি নাও থাকতে পারে।

(10) ডায়োড IN 4003 (CR-302) যেটা রেজিস্টর 2·2M ও পিকচার টিউবের 6 নং পিনের সাথে যুক্ত থাকে —এই ডায়োডটা শর্ট হয়ে গেলে পিকচার টিউবের 5 ও 6 নং পিনে ভোল্টেজ পাওয়া যাবে না—তার ফলে স্ক্রীনে কোনো আলো থাকবে না কিন্তু শব্দ ঠিক থাকবে।

(11) রেজিষ্টর 150Ω (R-215) যেটা ড্রাইভার ট্র্যানজিস্টর (TR-301)এর বেস-এর সাথে যুক্ত, এটা ওপেন হয়ে গেলে স্ক্রীনে ছবির ওপর ট্রেস লাইন দেখা যাবে।

সিঙ্ক সেপারেটর (হরাইজেণ্টাল ও ভার্টিকাল অসিলেটর, সিঙ্ক সেপারেটর ও এ এফ সি)

আই সি UPC 1366-র 3 নং পিন থেকে কম্পোজিট ভিডিও সিগন্যাল, রেজিস্টর 150Ω(R-215) দিয়ে আই সি HA 11423-র 10 নং পিনে পৌঁছোয়। এই আই সি HA 11423 থেকে ভার্টিকাল অসিলেটর, হরাইজেণ্টাল অসিলেটর এ এফ সি ও সিঙ্ক সেপারেটর —এই চারটে অংশের কাজ পাওয়া যায়।

আই সি HA 11423-র 2 নং পিন থেকে ভার্টিকাল ড্রাইভ ফ্রিকোয়েন্সি রেজিস্টর 1·5K(R-608) ; ভার্টিকাল

লীন কন্ট্রোল 1·8K(R-609) ও রেজিস্টর 680Ω (R610) দিয়ে আউটপুট ট্রানজিস্টর 2N5294 (TR-601)-এর এমিটার এ এবং রেজিস্টর 2·2Ω(R-613) দিয়ে ট্রানজিস্টর 2N5294(TR-607)-এর কালেকটরে দেওয়া হয়। আবার, আই সি,র 1 নং পিন থেকে ভার্টিকাল ড্রাইভ ফ্রিকোয়েন্সি রেজিস্টর 470Ω(R-614) হয়ে ট্রানজিস্টর 2N5294(TR-602)-এর বেস-এ পৌঁছোয়। আই সি'র 5 নং পিন থেকে ভার্টিকাল অসিলেটর ফ্রিকোয়েন্সি রেজিস্টর 300Ω(R-601) দিয়ে ট্রানজিস্টর 2N5294 (TR-601)-এর কালেকটর-এ পেঁছোয়।

TR-601 ও TR-602-এর এমিটার ও কালেকটর থেকে সম্প্রসারিত ফ্রিকোয়েন্সি ক্যাপাসিটর 470 Mfd(C-609) দিয়ে ভার্টিকাল ইয়োক কয়েলের এক প্রান্তে যায়। ভার্টিকাল ইয়োক কয়েলের সাথে যুক্ত ভার্টিকাল সাইজ কন্ট্রোল, প্রিসেট 330Ω (R-617) দিয়ে আই সি'র 4 নং পিনে যুক্ত থাকে।

আই সি'র 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 নং পিনগুলো সিঙ্ক সেপারেটর, এ এফ সি, হরাইজেণ্টাল অসিলেটর ও হরাইজেণ্টাল ড্রাইভারের কাজ করে।

আই সি'র 15 নং পিন থেকে হরাইজেণ্টাল ড্রাইভার ফ্রিকোয়েন্সি (15,625Hz), রেজিস্টর 220Ω(R-708) দিয়ে ট্রানজিস্টর BC 147B (TR-701)-এর বেস-এ গেছে। ট্রানজিস্টরের কালেকটর থেকে ফ্রিকোয়েন্সি হরাইজেণ্টাল ড্রাইভার ট্রান্সফরমার (T-701)-এর প্রাইমারী কয়েলে গিয়ে পড়ে। T-701-এর সেকেণ্ডারী কয়েল থেকে বেরোয় ড্রাইভ ভোল্টেজ, যা'কে নিয়ে যাওয়া হয় ট্রানজিস্টর BU407(TR-702)-এর বেস-এ। এই ট্রানজিস্টর, ড্রাইভ ভোল্টেজকে সম্প্রসারিত করে পাঠিয়ে দেয় LOT'র 2 নং ট্যাগে।

হরাইজেণ্টাল আউটপুট সেকশন

এই সেকশনে প্রধান পার্টস হিসেবে ব্যবহৃত হয় ট্রানজিস্টর BU407 (TR-702) ও ট্রান্সফরমার FBT (T-702)। LOT'র 1 নং ট্যাগ থেকে বেরোয় হরাইজেণ্টাল ফ্লাই-ব্যাক পালস্। এই পালস্‌কে রেজিস্টর 2·2K (R-707) ও ক্যাপাসিটর 33 Mfd (C-702) এর মাধ্যমে আই সি HA 11423র 11 নং পিনে দেওয়া হয়। LOT'র 2 নং ট্যাগের সাথে হরাইজেণ্টাল আউটপুট ট্রানজিস্টর BU407 (TR-702) এর কালেকটর যুক্ত থাকে ও হরাইজেণ্টাল লিনিয়ারিটি কয়েল (L-701) ও ক্যাপাসিটর 6·8 Mfd (C-716) দিয়ে হরাইজেণ্টাল ইয়োক কয়েলের এক প্রান্তের সাথে যুক্ত হয়। অপর প্রান্ত চেসিস (নেগেটিভ) করা থাকে।

LOT'র 3 নং ট্যাগে ডায়োড IN4007 (CR-701) এর মাধ্যমে 12V সাপ্লাই ইনপুট হয়েছে। 4 নং ট্যাগ চেসিস করা থাকে। 5 নং ট্যাগ থেকে অভ্যন্তরীণ ডায়োডের মাধ্যমে পিকচার টিউবের ফাইনাল অ্যানোডে 7KV ভোল্টেজ গিয়ে পড়ে। 6 নং ট্যাগ থেকে নেওয়া হয় 100V বুষ্ট ভোল্টেজ। একটা ডায়োড IN4007 অথবা BA 157 (CR-702) এবং তিনটে সমমানের ক্যাপাসিটর 0·047 Mfd (C-711 ; C-712 ; C-713) দিয়ে এই 100V বুষ্ট ভোল্টেজকে পিকচার টিউবের 6 নং পিনের মাধ্যমে স্ক্রীন গ্রিড-এ দেওয়া হয়।

LOT'র 7 নং ট্যাগ থেকে D সাপ্লাই (12V) ও 8 নং ট্যাগ থেকে B সাপ্লাই (10V) নেওয়া হয়।

সিঙ্ক সেপারেটর ও হরাইজেণ্টাল আউটপুট সেকশনের কিছু সাধারণ ফল্ট

(1) রেজিস্টর 470Ω (R604) যেটা ভার্টিকাল আউটপুট ট্রানজিস্টর (2N 5294) এর বেসে যুক্ত হয়েছে। এটা ওপেন হয়ে গেলে হরাইজেণ্টাল লাইন হবে অথবা ভার্টিকালি ছোট হয়ে যাবে।

(2) রেজিস্টর 1·5K (R-608), প্রিসেট 1·8K (R-609) ভার্টিকাল লীন ও রেজিস্টর 680Ω (R-610)

যেটা আইসির 2 নং পিন থেকে ভার্টিকাল আউটপুট ট্রানজিস্টর দুটোর (TR-601), (TR-602) এমিটারের সঙ্গে যুক্ত ও ক্যাপাসিটর 470Mfd/16V দিয়ে ভার্টিক্যাল ইয়োক কয়েলের সঙ্গে যুক্ত। এইগুলো ওপেন হয়ে গেলে হরাইজেন্টাল লাইন হবে।

(3) ক্যাপাসিটর 1mfd/10V (C-605) যেটা আইসির 3 নং পিনের সঙ্গে যুক্ত সেটা শর্ট হয়ে গেলে স্ক্রীনে হরাইজেন্টাল লাইন হয়ে যাবে।

(4) রেজিস্টর 24K (R-607) যেটা আইসির 4 নং পিন থেকে ভার্টিকাল সাইজ (Size) কন্ট্রোল 330Ω (R-617) এর সঙ্গে যুক্ত এটা ওপেন হয়ে গেলে স্ক্রীনে হরাইজেন্টাল লাইন হয়ে যাবে।

(5) ক্যাপসিটর 100Mfd/15V (C-601) যেটা আইসির 5 নং পিনের সঙ্গে যুক্ত সেটা শর্ট হয়ে গেলে হরাইজেন্টাল লাইন হয়ে যাবে।

(6) ক্যাপাসিটর 682Pf (C-602) যেটা আইসির 6 নং পিন এবং ভার্টিক্যাল হোল্ড কন্ট্রোলের সঙ্গে যুক্ত সেটা শর্ট হয়ে গেলে ছবি ভার্টিকাল রোল করবে অথবা হরাইজেন্টাল লাইন হয়ে যাবে।

(7) ক্যাপাসিটর 333Pf (C-603) যেটা আইসি'র 7 নং পিনের সঙ্গে যুক্ত এটা ওপেন বা শর্ট হয়ে গেলে ছবি স্লো ভার্টিকাল রোলিং হবে।

(8) রেজিস্টর 5·6K (R-606) যেটা আইসি'র 8 নং এবং 7 নং পিনের সঙ্গে যুক্ত এটা ওপেন হয়ে গেলে ছবি স্লো ভার্টিকাল রোলিং হবে।

(9) ক্যাপাসিটর 1KPf (C-220) যেটা আইসি'র 10 নং পিনের সঙ্গে যুক্ত এটা শর্ট বা ওপেন হয়ে গেলে হরাইজেন্টাল ও ভার্টিকাল—দু'ধরনের রোলিংই হবে।

(10) রেজিস্টর 2·2K (R-707) যেটা LOT'র 1 নং ট্যাগ ও আইসির 11 নং পিনের সঙ্গে যুক্ত। এটা ওপেন হয়ে গেলে ছবি হরাইজেন্টাল রোল করবে।

(11) রেজিস্টর 4·7K (R-706) হরাইজেন্টাল হোল্ড কনট্রোল, যেটা D সাপ্লাই ও আইসির 13 নং পিনের সঙ্গে যুক্ত এটা ওপেন হয়ে গেলে আইসিতে কোনো সাপ্লাই যাবে না। যার ফলে স্ক্রীনে হরাইজেন্টাল লাইন হবে বা সেট ডেড হয়ে যাবে।

(12) রেজিস্টর 220Ω (R-708) যেটা আইসি 15 নং পিন ও হরাইজেন্টাল ড্রাইভার ট্র্যানজিস্টর (BC 147B) এর বেসের সঙ্গে যুক্ত। এটা ওপেন হয়ে গেলে ড্রাইভ পালস যাবে না যার ফলে সেট ডেড হয়ে যাবে।

(13) রেজিস্টর 39Ω (R-710) যেটা ড্রাইভার ট্র্যান্সফরমারের প্রাইমারি ও D সাপ্লাইয়ের সঙ্গে যুক্ত, সেটা ওপেন হয়ে গেলে ড্রাইভার ট্র্যান্সফরমার ও ড্রাইভার ট্র্যানজিস্টর (TR-701) এর কালেকটরে 12 ভোল্ট সাপ্লাই যাবে না যার ফলে সেট ডেড হয়ে যাবে।

(14) ক্যাপাসিটার 0·01 Mfd (C-709) যেটা হরাইজেন্টাল আউটপুট ট্র্যানজিস্টর BU407 (TR-702) এর বেসের সাথে যুক্ত থাকে, সেটা শর্ট হয়ে গেলে সেট ডেড হয়ে যাবে।

(15) ক্যাপাসিটার 0.0047 Mfd (C-715) যেটা হরাইজেন্টাল আউটপুট ট্র্যানজিস্টর (TR-702) এর কালেকটরের সাথে যুক্ত থাকে, সেটা শর্ট হয়ে গেলে সেট ডেড হয়ে যাবে।

(16) ডায়োড BA 157 (CR-702) যেটা ই, এইচ, টি এর 6 নং ট্যাগ এর সাথে যুক্ত থাকে, সেটা শর্ট হলে স্ক্রীনের আলো দু'ধার থেকে ছোট হয়ে যাবে এবং একটা ভার্টিকাল লাইন মাঝে মাঝে 'স্পার্ক' করবে।

(17) কয়েল (L-701) যেটা ই, এইচ, টির 2 নং ট্যাগের থেকে হরাইজেন্টাল ইয়োক কয়েল এর এক প্রান্তে যুক্ত থাকে সেটা ওপেন হয়ে গেলে একটা ভার্টিকাল লাইন দেখা যাবে।

পাওয়ার সাপ্লাই

এসি মেইনস্ প্লাগ থেকে ফিউজ 500 mA (F-901) ও অন/অফ সুইচের মাধ্যমে স্টেপ-ডাউন ট্রান্সফরমার (T-901) এর প্রাইমারী কয়েলে 220V এসি দেওয়া হয়। ট্রান্সফরমারের সেকেণ্ডারী কয়েল থেকে 16V এসি কে 'ব্রীজ রেকটিফায়ার সার্কিট' এ চারটে ডায়োড IN5392 (CR-901 ; CR-902 ; CR-903 ; CR-904) এর মাধ্যমে রেকটিফাই করে আবার অন / অফ সুইচের অন্যপ্রান্তে নেওয়া হয়। এটা না করলে প্লাগ লাগানো থাকলে সব সময় প্রাইমারী কয়েলে এসি মেইনস যেতো।

এরপর 15V ডিসিকে ফিল্টার ক্যাপাসিটর 2200 mfd/25V (C-901) দিয়ে ফিল্টার করে ফিউজ 2 Amp (F-902) দিয়ে ট্রানজিস্টর 2N 5294 (TR-901) এর কালেক্টর ও রেজিস্টর 15Ω/5W (R-902) দিয়ে এমিটার এ যুক্ত করা হয়েছে। এই ট্রানজিস্টরের বেস থেকে জেনার ডায়োড (CR-905) দিয়ে নেগেটিভ করা হয়। এর ফলে ট্রানজিস্টরের এমিটার থেকে 12V নিয়ন্ত্রিত ও মসৃন ডিসি সাপ্লাই তৈরী হয়। এটাকে ইনপুট ভোল্টেজ হিসেবে LOT'র 3 নং ট্যাগে দেওয়া হয়। এই ট্রানজিস্টরের কালেকটর থেকে A সাপ্লাই (15V ডিসি) সাউণ্ড আউটপুট সেকশনের ট্রানজিস্টর CL100 (TR—402) এর কালেকটরে রেজিস্টর 22Ω/½W (R-404) এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।

পাওয়ার সাপ্লাই এর কিছু সাধারণ ফল্ট

(1) স্টেপ ডাউন পাওয়ার ট্যান্সফরমার (T-901) এর সেকেণ্ডারীতে 15VAC না থাকলে সেট মৃত হয়ে যাবে।

(2) ফিউজ 500 mA (F-901) কেটে গেলে সেট মৃত হয়ে যাবে কারণ তা'হলে ট্রান্সফরমারের প্রাইমারীতে কোনো মেইন ভোল্টেজ যাবে না।

(3) ট্র্যানজিষ্টর 2N 5234 (TR-901) এর কালেকটরে 15V DC না পাওয়া গেলে সেট মৃত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে 'ব্রীজ রেকটিফায়ার' এর চারটে ডায়োড IN 5392 (CR-901 থেকে 904) এবং ফিউজ 2 Amp (F-902) কে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

(4) ট্র্যানজিষ্টর (TR-901) এর এমিটারের ভোল্টেজ 14VDCর কম হলে ছবি দু'ধার থেকে কমে যাবে এবং স্ক্রীনে 50 সাইকলস্ রিপলস্ দেখা যাবে। এক্ষেত্রে ট্রানজিস্টরটা শর্ট হয়ে গেছে কীনা দেখতে হবে।

(5) ক্যাপাসিটর 470Mfd/16V (C-714), যেটা ট্রানজিস্টর (TR-901) এর এমিটার এবং LOT'র 3 নং ট্যাগের সাথে যুক্ত, এই ক্যাপাসিটরটা যদি শর্ট হয়ে যায় তা'হলে সেট ডেড হয়ে যাবে।

(6) ডায়োড IN 4001 (CR-701) শর্ট বা ওপেন হয়ে গেলে 12V DC সাপ্লাই LOT'তে যাবে না। সেট মৃত হয়ে যাবে।

(7) রেজিষ্টর (15Ω/5W (R-902) যেটা ট্রানজিস্টর (TR-901) এর কালেকটর ও এমিটারের সঙ্গে যুক্ত, সেটা যদি খুব গরম হয়ে যায় তাহলে ট্রানজিস্টর (TR-901) টা শর্ট আছে কীনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

(8) ক্যাপাসিটর 2200 Mfd/25V (C-901), যেটা ফিউজ (F-902) এর সাথে যুক্ত, এটা ওপেন হয়ে গেলে 50 সাইকলস্ রিপলস্, স্ক্রীনে দেখা যাবে। শর্ট হয়ে গেলে সেট মৃত হয়ে যাবে।

গোল্ডষ্টার পোর্টেবল সেটের ভোল্টেজ চার্ট

সাউণ্ড সেকশন	ভিডিও সেকশন	ভার্টিকাল সেকশন
BC 147B (TR-401)	BC 158B (TR-301)	2N 5294 (TR-601)
C=5·5V ; B=1V ; E=0	C=0 ; B=3V ; E=3·8V	C=15V ; B=10V ; E=9·8V
CL 100/BEL 187 (TR-402)	2N 3501/BF 187 (TR-302)	2N 5294 (TR-602)
C=14V ; B=6·8V ; E=6V	C=50V ; B=3·5V ; E=3·5V	C=9V ; B=0 ; E=0
CK 100/BEL 188 (TR-403)	**হরাইজেন্টাল ড্রাইভার**	**হরাইজেন্টাল আউটপুট**
C=0 ; B=5·5V ; E=6V	BC 147B (TR-701)	BU 407 (TR-702)
	C=9·5V ; B=0·4V ; E=0	C=15V ; B=0 ; E=0

PIN NO.	UPC 1366 (IC-201)	GL 1201/CA 3065 (IC-401)	HA 11423 (IC-601)
1	10 Volt	2 Volt	0·1 Volt
2	1 ,,	2 ,,	4 ,,
3	3 ,,	0 ,,	7 ,,
4	5 ,,	0 ,,	4 ,,
5	6·2 ,,	12 ,,	12 ,,
6	2 ,,	2 ,,	4 ,,
7	12 ,,	6·5 ,,	3·8 ,,
8	5·8 ,,	6 ,,	1·3 ,,
9	5·8 ,,	4 ,,	3 ,,
10	5·6 ,,	4 ,,	3 ,,
11	5·7 ,,	0 ,,	3·7 ,,
12	7·5 ,,	5·5 ,,	7·8 ,,
13	0 ,,	6 ,,	7·5 ,,
14	10 ,,	1 ,,	12 ,,

টেক্সলা (20″) রিসিভার সেট

টেক্সলা (20″) টিভির সার্কিট বেলটেক-এর সার্কিটের অনুরূপ। টেক্সলা সার্কিটের অকজিলিয়ারী পাওয়ার সাপ্লাই একটু আলাদা। LOT-এর 5 নং ট্যাগ থেকে 50 V AC কে ডায়োড DR-300 (D-802) ও ফিল্টার ক্যাপাসিটর 220Mfd / 50 V. দিয়ে রেক্টিফাই ও ফিল্টার করে +B 35 V D. C. সাপ্লাই তৈরী করা হয়। এই 35 V. থেকে রেজিষ্টর 100Ω (R-806) ও রেজিষ্টর 5·6 K (R-804)-এর সাথে রেগুলেটর ট্রানজিষ্টর AC-187 (R-801) যুক্ত হয়েছে। রেগুলেটর ট্রানজিষ্টর এর এমিটার থেকে রেগুলেটেড 15V F সাপ্লাই পাওয়া যায়। এই 'F' সাপ্লাই থেকে রেজিষ্টর 82Ω (R-807) দিয়ে কিছুটা ভোল্টেজ কমিয়ে 12V 'G' সাপ্লাই করা হয়েছে।

এই অংশের ফল্টঃ ট্রানজিষ্টর AC 187 (R-801) শর্ট বা ওপেন হয়ে গেলে আউটপুটে F সাপ্লাই ও G. সাপ্লাই পাওয়া যাবে না। তার ফলে স্ক্রীনে আলো ও ছবি থাকবে না।

ডায়োড DR-300 (R-802) ওপেন হয়ে গেলে আউটপুটে +B সাপ্লাই (35V) পাওয়া যাবে না। এর ফলে স্ক্রীনে হরাইজেন্টাল লাইন হয়ে যাবে।

ট্র্যানজিষ্টরের পরিবর্তমানের চার্ট

ট্র্যানজিষ্টর	সমতুল্য ট্র্যানজিষ্টর (Equivalent)
GS 2013	2N 5294
GS 2015	BU 407
GS 9012	BC 158, BC 117
GS 9023	BC 147B
GS 9027	2N 3501, BF 178, BF 337
HNT 1	BU 205
KSA 542	BC 158
KSD 200	BU 105, BU 205
KSD 227	BC 147B
KSD 228	2N 5294, 2N 5296
KSD 362	BU 407
KSD 415	BF 178, 2N 3501, 2SC 2229
2SC 1106	BU 120, 2N 5157
2SD 227	BC 147B
2SD 288	2N 5294, 2N 6123, BD 589
2SD 868	BU 208D, 2N 1892
2N 3055	2N 6253
KTA 562	BC 158
KTA 643	CL 100
KTA 950	CL 100
KTA 1015	BC 158
KTC 1815	BC 147B
KTC 1959	BC 147B
KTC 2120	CK 100
KTC 2229	2N 3501, BF 178
KTC 2233	BU 407
KTD 261	CK 100

ট্র্যানজিষ্টর	সমতুল্য ট্র্যানজিষ্টর (Equivalent)
KTD 880	2N 5294, 5N 5296
AC 127	AC 176, AC 187, AC 194, 2N 2430
AC 128	AC 188, AC 153, AC 193, 2N 7607
AD 149	AD 166, 2N 1533, 2N 1536, 2N 1540, 2N 1545, 2N 1548, 2N 3617, ASZ 16
BC 107	BC 171, BC 182, BC 207, BC 237, BC 382, BC 547, BC 58 , BC 147
BC 108	BC 172, BC 183, BC 208, BC 238, BC 383, BC 548, BC 583, BC 147
BC 109	BC 173, BC 184, BC 209, BC 230, BC 384, BC 549, BC 149
BC 147	BC 107, BC 171, BC 182, BC 207, BC 237, BC 382, BC 547, BC 542
BC 148	BC 108 অনুসারী
BC 149	BC 109 অনুসারী
BC 158	BC 178, BC 205, BC 2'3, BC 252, BC 307, BC 308, BC 513, BC 558
BC 187	BC 158 অনুসারী
BC 188	BC 158 অনুসারী
BC 194	BC 337, BC 737, BC 837
BC 195	BC 338, BC 738, BC 838
BD 160	BU 109, BU 128, BUY 77
BF 200	BF 180, BF 183, BF 314
BU 205	BU 204, BU 206, BU 207, BU 208, BU 209, BDX 31, BDX 32, BUY 71
2SC 1106	BU 109, BU 110, BU 210, BUY 22, BUY 77, 2N 6306, BU 120
BC 167	BC 107, BC 108, BC 109
BC 177	BC 204, BC 205, BC 206, BC 212, BC 213, BC 214, BC 251, BC 252, BC 253, BC 307, BC 308, BC 309, BC 512, BC 513, BC 514, BC 557, BC 558, BC 559, BC 158
BC 178	BC 177 অনুসারী
BD 115	BF 258, BF 337, 2N 5059
2N 3501	2N 3498, 2N 3499, 2N 3500, 2N 2990, 2N 4001, BSS 42, BSV 84, BSW 67, 2N 5320

SCR পরীক্ষক সার্কিট

একটা সহজ সার্কিট তৈরী করে এস. সি. আর ঠিক না খারাপ তা পরীক্ষা করা যায় (ছবি দ্রষ্টব্য)। একটা ট্রান্সফরমারের সাহায্যে মেইন্‌স্ এ. সি. তড়িৎপ্রবাহ 6·3 ভোল্টেজে নিয়ে আসা হয় ও D1 (IN 4007) ডায়োড এবং C1 ফিলটার ক্যাপাসিটর দিয়ে পরিশ্রুত (রেক্টিফাই) করা হয়। যখন সুইচ S2 ডিসির অবস্থানে থাকে তখন একটা নির্দিষ্ট ও পরিশ্রুত ডি. সি. প্রবাহ L1 ল্যাম্প হয়ে SCR-এর পৌঁছোয়। SCR-এর ক্যাথোড, প্রাপ্ত ডিসি প্রবাহের নেগেটিভ মেরুর সাথে যুক্ত করা হয়।
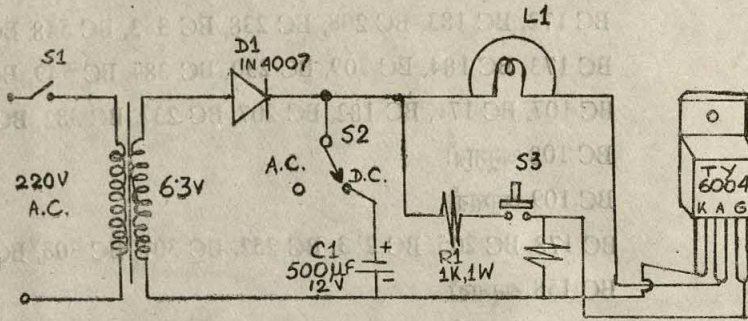
R1 এবং R2 রেজিস্টর দু'টো, ডিসি প্রবাহ-ছিন্নকারী (Potential veuider) হিসেবে কাজ করে। একটা বোতাম-টেপা সুইচ S3 এই R1 ও R2 রেজিস্টরের মধ্যে সিরিজে যুক্ত করা হয়। R2 রেজিস্টরের অপর প্রান্তে যে বিভব পাওয়া যায় তা' SCR-এর গেট-এ পাঠানো হয়।

যখন S2 সুইচটা ডিসি সাপ্লাই প্রান্তে যুক্ত থাকে তখন ল্যাম্পটা S3 বোতাম টেপা মাত্রই উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে থাকবে। এমনকি S3 বোতাম টেপা বন্ধ করে দিলেও ল্যাম্পটার ঔজ্জ্বল্য হ্রাস পাবে না।

যখন সুইচ S2 এসি সাপ্লাই প্রান্তে যুক্ত থাকে তখন ল্যাম্পটা আলোকিত হয় না। ল্যাম্পটা শুধুমাত্র তখনই আলোকিত হবে যখন S3 বোতাম টেপা হবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

Basic Television Principles and Servicing—Bernard Grob
Monochrome and Colour Television—R. R. Gulati
Integrated Electronics—Millman & Halkias
Television Servicing Manual Voll. II—M. D. Agarwala
Television for you Magazine